কে এই মহান তাপস?

গাউসে যামান, মোজাদ্দেদে যামান, শায়খ-উল–ক্বোররা

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রা:)

লেখক : **মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবের সোবহানী আল ক্বাদেরী**
সহযোগীতায় : **আলহাজ্ব শাহ্জাদা মাহ্বুব ইলাহ্ আল ক্বাদেরী**

প্রকাশক : **আলহাজ্ব শাহজাদা মাহবুব ইলাহ আল ক্বাদেরী**
সভাপতি, শাহপুর দরবার শরীফ, কুমিল্লা ।
প্রাক্তন পরিচালক, প্রশাসন, বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লা ।
মোবাইল: ০১৭১১-১৮৯৮৩১

প্রকাশকাল : **প্রথম প্রকাশ** : রমজান ১৪১৮ হিজরী,
মাঘ ১৪০৪ বাংলা, জানুয়ারী ১৯৯৮ ঈসায়ী ।
প্রথম সংস্করণ : জ্বিলকদ ১৪৪০ হিজরী,
শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা, জুলাই ২০১৯ ঈসায়ী ।
দ্বিতীয় সংস্করণ: রবিউস সানী ১৪৪৬ হিজরী,
কার্তিক ১৪৩১ বাংলা, অক্টোবর ২০২৪ ঈসায়ী ।

স্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ভাবধারা : 'সোবহান' আল্লাহ্ তায়ালার একটি গুনবাচক নাম, যার অর্থ 'মহাপবিত্র' । 'সোবহান' শব্দের আরেক অর্থ 'সাঁতারু' । আল্লাহ প্রেমের অথৈ সমুদ্রে এই সাহসী সাঁতারু পাড়ি দিচ্ছেন ।

মুদ্রণে : **হযরত বাগদাদী (রা:) প্রেস**
নিউ মার্কেট, কুমিল্লা । মোবাইল: ০১৯২৬৪৯৭৫৪৮

হাদিয়া : **১৩৩/-** (একশত তেত্রিশ) টাকা মাত্র ।

Ke Aie Mohan Taposh! Gause Jaman Mojaddede Jaman Sheikh-UL-Qurrah Hazrat Shah ABDUS SOBHAN Al-Quadery (R.A). Written by Md. Ruhul Amin Saber Sobhani Al-Quadery, Pulbished: by Al-Hajj Shahjada Mahbub llah Al Quadery, President, Shahpur Darbar Sharif, Cumilla. Second_Edition: October 2024. Price: TK 133.00 Only. E-mail: golam.zobair@gmail.com

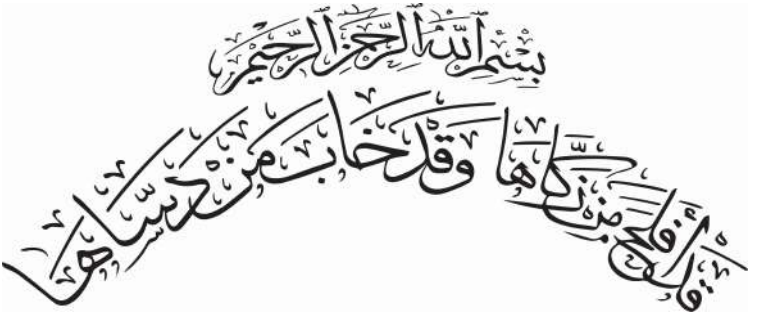

চাও যদি নিজ মন **দর্পণ করিতে।**
দশ চীজ দুর কর **আপন হইতে ।।**
লোভ, হিংসা, ক্রোধ, মিথ্যা, **কীনা, অহংকার।**
বখিলি, গীবত, রীয়া, **দূরাশাদি আর।।**

গাউসে যামান, মোজাদ্দেদে যামান, শায়খ-উল-ক্বোররা

হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)

গাউসে সাকলাইন, সাইয়্যেদুল আবরার,
পীরানে পীর দস্তগীর

হযরত সাইয়্যেদেনা
মহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) এঁর
জ্যোতির্ময় শক্তিধর পূত চরণে চুম্বন ও ভক্তি রেখে
তাঁর দয়া কামনায়-

আমার পিতামহ মরহুম জনাব মাওলানা মকবুল আহমেদ (মিছরী ভাই) এর বিদেহী আত্মা যেন শোধন চক্রের বন্ধন থেকে চির মুক্তি পেয়ে যায়, এই শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ পরম প্রভুর নিকট জানিয়ে 'উৎসর্গ' করলাম ।

প্রথম প্রকাশের 'লেখকের কথা'

আরম্ভ করলাম সেই পরম একক সয়ম্ভূ সত্বার মহা পবিত্র নামে এবং তাঁরই জন্য অবিরাম সমস্ত প্রশংসা সহকারে যিনি সৃষ্টি করেছেন এই মহাবিশ্বকে; আর প্রতিপালন করেছেন কোন কিছুর মুখাপেক্ষী না হয়ে। এ কথাটি শিখেছি সৃষ্টির সর্ব প্রথম কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে। কারণ তিনি সমস্ত কান্ডজ্ঞানের ও বিবেকের কেন্দ্রবিন্দু। সমস্ত সুসাধনার সাধুরাজ, সৃষ্টিজগত ও স্রষ্টার মাঝখানে সেতুবন্ধন। তাই তাঁকেই হৃদয় রাজ্যের পবিত্র ভালবাসার সবটুকু উজার করে দিলাম নিঃশেষে।

আল্লাহ্ তায়ালা এই আঠার হাজার আলমকে সৃষ্টি করেছেন। যাকে বাংলা পরিভাষায় 'মহাবিশ্ব' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যা সৃষ্টি হয় তা একদিন না একদিন এর আসল অবস্থা ধ্বংস হয়ে অবস্থান্তর হয় বলে দ্বীনি ও বিজ্ঞানী অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে মানবকূল এক আশ্চর্য ও সর্বোত্তম সৃষ্টি। সমস্ত রহস্যঘেরা সত্যকে উদঘাটন করে দেখতে হলে ও ধারাবাহিকতা বুঝতে হলে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা মানব মস্তিষ্কেই স্থাপন করা হয়েছে। এবার মানুষ তা অনুশীলন করুক আর নাই করুক তা মানুষের ইচ্ছা।

আল্লাহর জগত 'না' এর জাগত। যাকে আরবী ভাষায় 'লা মাকান' বলে। তৌহিদ কালেমা 'লা' দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এই তৌহিদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করলে মানব জনম স্বার্থক হয়। তৌহিদের এ রাজ্যে পৌঁছা বস্তুনির্ভর সাধারণের জন্য একেবারেই দূরূহ ব্যাপার। চরম প্রজ্ঞা, পুত-পবিত্র, স্বীয় সত্তা নিঃশেষে নিবেদিত কর্তা ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। আর এই বিশেষ দলের বা উচ্চ পরিষদের তাপস-মনীষীগণকে কোরানুল করিমের ভাষায় 'নাহনু' বলা হয়েছে। আর কোরান বুঝতে হলে 'সত্যদর্শন' ক্ষমতা অর্জন অত্যাবশ্যক। মোমিন ব্যক্তিগণই কোরান আলোকে উদ্ভাসিত করেন তাঁদের হৃদয় রাজ্যকে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "কোরানের দুইটি চরিত্র বা দিক আছে। একটি অন্তরের দিক অপরটি বাহ্যিক দিক।" আল কোরানের আভ্যন্তরীণ আলো দ্বারা এই 'নাহনু' গণ তাঁদের ভিতর ও বাইরের চারিত্রিক দিক দুইটিকে তাফসির করে তোলেন। এই 'নাহনু' বা 'উচ্চ পরিষদ' ঊর্ধ্ব জগত থেকে আকর্ষণ অর্জনকারী এবং নিম্ন জগতের অধিবাসীদের নিকট আকর্ষণ বন্টনকারীও বটে। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত দিক নির্দেশনা মোতাবেক স্ব-স্ব আন্তরিক চেষ্টা তদবীরের দ্বারা আত্মিক শক্তির আলোকে কামেল মুর্শীদের সক্রিয় সহযোগিতায় অথবা দুরদার্শনিক প্রক্ষেপণ দ্বারা এ রহস্যঘেরা জগতে গমন করা যায়। দলগত বা সমষ্ঠিগত এমনকি দ্বিত্ববাদের সঙ্গেও সেখানে প্রবেশাধিকারের কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি বলে পরমার্থজ্ঞানী দর্শকগণ বলেছেন। উক্ত মাকামে পৌঁছাতে হলে সত্যদ্রষ্টা

সাহসী ব্যক্তির প্রয়োজন। তাই গাউসুল আযমুসসাকলাইন (রাঃ) কি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন, "এ রাস্তাটি সাহসী বীরদের জন্য বিপদ আপদে ঘিরে রাখা হয়েছে যেন ভন্ডেরা মারেফাতের দাবীদার না হতে পারে।"এই অনাবিল চরিত্র মাধুর্য অর্জন করতে হলে নিম্নের চারটি বিষয় অত্যাবশ্যক-

১. বিশেষভাবে কিছু কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বিনা দ্বিধায় প্রত্যয় স্থাপন করণ (ঈমান- বিল-গায়েব)।
২. মানবকে প্রদত্ত নির্বাচনী শক্তি ও স্বাধীনতা দ্বারা অর্জিত মানবীয় প্রবৃত্তাদি পরিত্যাগ করণ।
৩. আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে পরমার্থজ্ঞান বা প্রজ্ঞালাভ মাফিক এর অনুশীলন করণ।
৪. ধর্মের প্রাথমিক পর্যায়ের আদব ও তাজিমকে জয় করে ভক্তির মাধ্যমে চরম প্রেম লাভ করা।

এই চারটি বিষয়ে অর্জিত সমষ্টির ফল হল আত্মদর্শন। আত্মদর্শনের পরই ব্যক্তি হয়ে উঠেন একজন সত্যদ্রষ্টা। যুগে যুগে বিরল সংখ্যক সত্যদ্রষ্টাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করে এই পৃথিবীতে পাঠান বলেই সৃষ্টির সকলের রক্ষা।

মানুষ যেমন কাঁচা ফুলের সুবাসকে আতরের মধ্যে, সুমিষ্ট সুর ও কণ্ঠকে রেকর্ডের শতপাকে বা সরু ফিতায়, আর ঘটনা প্রবাহকে কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে ধরে রাখে যুগ যুগ ধরে। আমরাও স্মরণকালের একজন ক্ষণজন্মা সত্যদ্রষ্টা মনীষী আমার মুর্শীদে বরহক হযরত শাহ সুফি গাউসে জামান শায়খ-উল-ক্বোররা মাওলানা আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নাম ঠিকানা অনন্য গুণাবলী ও কার্যক্রম আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য স্মৃতির এ্যালবাম থেকে শ্রদ্ধাভরে সুরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

এই মহান তাপস প্রবরের জীবনালেখ্যটি অনেক প্রচেষ্টার পর সাধ্যমত প্রস্তুত করে রেখেছিলেন এই মহান মনীষীরই জীবদ্দশায়, তাঁর একান্ত নিকটের একজন প্রবীণ শিষ্য জনাব মরহুম মগফুর মাওলানা মকবুল আহমদ। জীবনীটির লেখা শেষ করে লেখক তার নিকট রেখে দিলেন। কিন্তু তা মুর্শীদ কেবলাহর হায়াতে হালতে থাকা অবস্থায় তাঁর সম্মুখে পাঠ করা পরহেজগারীর বিপরীত একথা ভেবে মুর্শীদ কেবলাহকে না শুনিয়ে মকবুল আহমদ সাহেব তাঁর দু'চার জন সম-সাময়িক পীর ভাইয়ের নিকট ঘটনাটি বললেন। এরই মধ্যে মকবুল আহমদ সাহেবের জনৈক পীর ভাই (নাম প্রকাশে আমি অনিচ্ছুক) হযরত পীর কেবলাহর সাথে এক সময় কথোপকথন কালে জীবনী লেখার ঘটনাটি তৃপ্তি সহকারে বলে দিলেন। পরবর্তীতে আমার প্রজ্ঞাময় সত্যদ্রষ্টা মুর্শীদ ঐ মুরীদের দ্বারাই মকবুল আহমদ সাহেবকে ডাকালেন উভয়কে হযরতের সামনে বসতে বলাতে তারা বসলেন। তখন হযরত কেবলাহ একটু রাগ মিশ্রিত স্বরে বললেন, "মকবুল মিয়া, তুমি নাকি আমার জীবনী

লিখেছ? কি জন্য লিখেছ? আমার হুকুম নিয়েছ কি? আমার জীবনের কি-ই-বা জান তুমি?" কথাগুলো হযরতজী একনাগাড়ে বলে গেলেন। খানিক পর জনাব মকবুল আহমদ সাহেব অত্যন্ত ভক্তির মাধ্যমে শান্ত অথচ দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, "হুজুর জীবনীখানা লিখেছি আমার ভবিষ্যত আওলাদ ফরজন্দগণের জন্য, শুধু যেন তারা জানতে পারে আমার পীর কেমন ছিলেন। তখন তারা ভক্তি সহকারে দু'একটা আগরবাতি ও মোমবাতি সহকারে মাজারে আসবে এবং আল্লাহর দরবারে দু'ফোটা চোখের পানি ফেলবে। তা না হলে তারা আনন্দ ফুর্তি করে গন্তব্য স্থলে ফিরে যাবে।" মুর্শীদ কেবলাহর প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বললেন, "হুজুর আমি যতটুকু জানি ততটুকু লিখেছি। আর আপনার হুকুমের প্রয়োজন মনে করিনি, যেহেতু এটা আমি বাড়িতে বসে লিখেছি। যেমন, জাগতিক অনেক কাজ কারবারই বাড়ীতে বসে আপনার হুকুম ছাড়াই করে থাকি।" হযরত মুর্শীদ কেবলাহ বললেন, " কি লিখেছ? শোনাও।" মকবুল আহমদ সাহেব জীবনী গ্রন্থটির পান্ডুলিপিটি পড়ে শোনালেন। পান্ডুলিপিটি মকবুল আহমদ সাহেব যখন পাঠ করছেন তখন হযরত মুর্শীদ কেবলাহর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে তাঁর দাঁড়ি মোবারক সিক্ত করে ফেলল। পাঠ শেষ হলে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে অনুচ্চ স্পষ্ট সুরে ধীরলয়ে একটি শব্দই উচ্চারণ করলেন- 'আল্লাহ্'। তারপর বললেন, "মকবুল মিয়া, তুমি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রাম কর।" বিকেলে আবার ডাকালেন এবং জীবনীখানা আবার পাঠ করালেন যেন মোহতারেমা আম্মা সাহেবানী পর্দার অন্তরাল থেকে শুনতে পান। সে সময় পাঠ শেষ হলে হুজুর নিজেও Dictation দিয়ে কিছু তথ্য সংযোজন করালেন। এ সম্পূর্ণ ঘটনাটি আমার পিতামহ মকবুল আহমদ সাহেব আমাদের নিকট বলেছেন বহুবার। এ ঘটনা 'মহাকালের সংরক্ষিত স্মৃতি ফলকে' সুরক্ষিত আছে, এটাই বিশ্বাসীদের বিশ্বাস।

হযরত কেবলাহর তিরোধানের পর আশায় আর প্রতীক্ষায় বিয়াল্লিশটি বছর একের পর এক কেটে গেল, এরই মধ্যে পৃথিবীতে কতজন আসলো কতজন যে বিদায় নিল এর পরিসংখ্যানই বা কে রাখে? "Evrybody's duty is no body's duty" ইংরেজী প্রবচনটিও কেন জানি মনে পড়ে যাচ্ছে। জীবনীটি কেন যে মুদ্রিত হলোনা এর নিগুঢ় রহস্য আলেমুল গায়েব-ই উত্তমভাবে অবগত আছেন। এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে, সকল নবী-রাসূল (আঃ), আউলীয়া আব্দাল, গাউস-কুতুবগণ বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য একক সম্পদ নহেন। তাঁরা মাখলুকাতেরই সম্পদ। কোরান যেমন স্পষ্ট করে বলছেন, "ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন।" আর এটা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, অলী- আল্লাহগণের মানসপুত্র তাঁরাই যাঁরা অলীগণের সুকোমল আদর্শ ও জ্ঞান প্রজ্ঞায় ভরপুর আত্মিক দিকটি চর্চ্চা ও অনুশীলন করেন। এ জন্যই প্রখ্যাত অলীগণের জীবনী অনুশীলন করে দেখা গেছে যে, তাঁরা তাঁদের মুর্শীদগণের

আলোর সন্তান বা মানসপুত্র হিসেবে দাবী করেছেন। "আল উলামাও ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া।"-এই হাদিস বাণীটিতে 'আল আওলাদো' বলা হয়নি। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে রূহীজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনরত ব্যক্তিকে আলোর পুত্র (Astral son) অর্থাৎ 'আল' হিসেবে সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

দাবী প্রধানতঃ দুই প্রকার। একটি বংশধারা রক্ষা করে জন্মগত অধিকারের দাবী, যাদেরকে আওলাদ বা ওয়ারিশ বলে। আওলাদ শব্দ দ্বারা রক্ত সম্পর্ক সনাক্ত করে, আর এই আওলাদকেই যখন ওয়ারিশ শব্দ দ্বারা আখ্যায়িত করা হয় তখন তাঁর পূর্বসূরীদের ত্যাজ্যবিত্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভোগের অধিকার সংক্রান্ত উপযুক্ততা প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিতীয় দাবীটি হল, কোন মনীষীর গুণগত, আদর্শগত ও পবিত্র মনোরাজ্যের আলোতে নিজকে সমর্পণ করে চরমভাবে আলোকিতকারীর দাবী। অর্থাৎ- আলোর পুত্র বা মানসপুত্রের দাবী। হযরত মুর্শীদ কেবলাহ (রাঃ) এরশাদ করছেন,"রাজার ছেলে রাজা হতে পারে কিন্তু অলীর ছেলে অলী হয় না যদি তাঁর মধ্যে অলী হওয়ার আধ্যাত্মিক গুণ না থাকে।" আমি আমার শায়খ হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর 'আল' অর্থাৎ মানসপুত্র (Astral son) হিসেবে আমার আল-আওলাদগণের দাবী আর দায়িত্ব নিয়ে একাজে অগ্রসর হয়েছি।

তাই আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, আল-আওলাদগণের বর্তমান চরম উৎকণ্ঠা ও উপর্যুপরি চাহিদা এবং আশু মুদ্রণের জন্য প্রবল তাগিদের কারণে এ প্রয়াস গ্রহণ করলাম। কিন্তু এও জানি যে, আল্লাহর প্রেমাস্পদগণের জীবনের ঘটনা প্রবাহের অনেক কিছু আংশিক বা প্রায় পূর্ণ অজানা থেকে যায়। তবুও ঘটনা প্রবাহের অবগতির সীমিত পরিসীমার অভ্যন্তর থেকে হলেও পাঠকদের তৃষিত মনকে মোদ্দাভাবে নিবারিত করার লক্ষে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ মহান তাপস প্রবরের জীবনের কোন গুরুপ্তপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা কোন সুহৃদ ভক্তের জানা থাকলে তা আমাদের নিকট লিখে জানাতে অনুরোধ করছি। আমরা যেন পরবর্তী সংস্করণে বর্ধিত কলেবরে তা প্রকাশ করতে পারি।

সন্দেহ নেই, আমার এই উদ্যোগ নির্মল হৃদয় থেকে উদ্ভূত। জাগতিক অর্থ-লালসা, সুনাম কিংবা দুর্নাম, মুন্সিয়ানা বা অহংবোধ এগুলোর কোনটাই অর্জনের লক্ষ্য নেই এতে। আশা করি সুবিজ্ঞ-সুবিবেচক কোন পাঠক অহেতুক 'অন্যের ছিদ্র অনুসন্ধান' এ মনোভাব পরিহার করে গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবেন। কোন পাঠক বইটি দ্বারা সাধনা জীবনের অনুশীলনে এতটুকু উপকৃত হতে পারলে আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব। সামর্থের সীমিত পরিসর হতে আমার এ প্রচেষ্টায় প্রমাদ থাকবেনা এ দাবী করি না। শুধু ভক্ত-মুরীদ ও আল্লাহর বিনয়াবনত পাঠকের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ রইল যদি কোথাও কোন প্রমাদ থেকে থাকে তাহলে, "ইন্নামা আমালু বিন্নিয়াত" অর্থাৎ-" নিয়ত অনুসারে আমল ও বরকত" এবং "মা

আরা হুল মুসলিমুনা হাসানা ফাহুয়া ইনদাল্লাহে হাসানা" অর্থাৎ- "মুসলমানগণ যে কাজকে সুন্দর বলে বিবেচনা করে আল্লাহর বিবেচনায়ও তা সুন্দর।" অন্ততঃ এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন।

এই জীবনী গ্রন্থটি রচনার জন্য যে সকল বর্ষীয়ান মুরুব্বী সম্প্রতি আমাকে বিভিন্ন প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছেন, তাঁদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং এ শুভেচ্ছা পোষণ করছি যেন রহিম ও রহমান আল্লাহ তায়ালা এই মুরুব্বী ও বিভিন্ন প্রকার সহয়তা প্রদানকারী অন্যান্য সকলকে যথেষ্ট দানে সন্তুষ্ট করেন। বিশেষ করে প্রায় অর্ধ বৎসর ধরে দিবা-রজনী কায়িক পরিশ্রম দ্বারা আমাকে এ কাজে সহায়তাকারী সর্বজনাব এনায়েত মোর্শেদ খান (বুলবুল), ফজলুর রহমান (চঞ্চল) ও মশিউর রহমান (নয়ন) এদের প্রতি আমার হৃদ্যতাপূর্ণ ভালবাসা রইল। আল্লাহ্ তায়ালা যেন তাঁর প্রেমাস্পদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও আউলিয়াগণের উসিলায় তাদের ঐহিক ও পারত্রিক জীবনকে সহজ ও সুন্দর করে দেন এই দোয়াই করছি।

আমার এই শ্রম যাতে অনন্তকালে নাজাতের অর্থাৎ বন্ধন থেকে উদ্ধারের একটি উসিলা হিসেবে আল্লাহর দরবারের উচ্চ পরিষদ ও আল্লাহ জাল্লাশানুহু স্বয়ং অনুমোদন করেন পাঠক বৃন্দের নিকট এই দোয়াই আশা করছি। আমিন, বহুরমতে সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

তারিখ: জানুয়ারী ১৯৯৮ ঈসায়ী

বিনীত

মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবের সোবহানী আল ক্বাদেরী

প্রথম প্রকাশের 'প্রকাশকদের কথা'

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলে সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলেহী ওয়া আহলে বাইতিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আউলীয়ায়ে আবরারেহী ওয়াসাল্লাম।

চারদিকে উপর্যুপরি চাহিদার চাপের কারণে এই জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশানার কাজে বিশেষভাবে হাত দিতে হলো এক্ষণি। হযরত মখদুম শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বেশুমার ভক্ত ও মুরীদগণের আশু প্রকাশের দিকে তীর্থের কাকের ন্যায় তাকিয়ে থাকার কারণে লেখক বইটির কলেবর বৃদ্ধি করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকলেও উপরিউক্ত কারণে লেখকের সে ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হলো।

কুমিল্লা জেলা, এমন প্রখ্যাত একজন ক্ষমতাধর মহান তাপস অলীকে কতযুগ আগে থেকেই বক্ষে ধারণ করে রয়েছে যাঁর পরিচয় সীমিত সীমানার গন্ডি পেরিয়ে উন্মুক্ত অঙ্গনে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমাদের অনেক আগেই উচিত ছিল। যাক, তবুও চল্লিশোর্ধ ওফাত বয়স হলেও অন্ততঃ একটা উদ্যোগ তো নেয়া হয়েছে। তাই এটা আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া ও আনন্দের বিষয়।

এ পুস্তিকাটির গ্রন্থনার গুরু দায়িত্বভার সোবহানীয়া গবেষনা কেন্দ্র জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবের সোবহানী সাহেবের উপর ন্যস্ত করেছেন দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

আঞ্জুমানে আহলে আলে মীম সংগঠন প্রকাশনার ভার আমাদের উপর দেয়ায় আমরা উভয় সংগঠনকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। বইটির সুন্দর সফলতা ও পাঠকবৃন্দের যৎকিঞ্চিৎ হলেও উপকার আশা করছি।

বিনীত প্রকাশকবৃন্দ

তারিখ: জানুয়ারী ১৯৯৮ ঈসায়ী

১। মোহাম্মদ গোলাম দস্তগীর
২। মোহাম্মদ গাউস পেয়ারা
৩। মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

প্রসঙ্গ কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমার প্রসঙ্গ এখানে শুধু শায়খ-উল-ক্বোররা, গাউসে যামান, হযরত শাহ সুফি মাওলানা আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)। আর অন্য সব প্রাসঙ্গিক।

হযরত ক্বেবলাহর জীবনি সংক্রান্ত যতটুকু জানি তা নিয়েই আগে আমি 'কে এই মহান তাপস' নাম করণ করে বইটি ছাপাই। ঐ সময় আমার হাতে হযরতের জলজ্যান্ত প্রমাণসিদ্ধ অনেক তথ্য ও ঘটনা ছিল না বিধায় বইটিকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। কালক্রমে আমার চরম বিশ্বস্ত প্রেমাস্পদ ভাই আলহাজ্ব হযরত শাহজাদা মাহবুব ইলাহ আল ক্বাদেরী বইটির সংস্করণ করা নিয়ে আমার সাথে বিশদ আলোচনা করেন । আমি দ্বিধা হীন চিত্তে সম্মতি জানালে উভয়ে আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রথম সংস্করণের কাজে অগ্রসর হই।

হযরত শাহ সুফি গাউসে জামান শায়খ-উল-ক্বোররা মাওলানা আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর নিজস্ব গুণাবলীতে এমনই ভাস্বর ছিলেন যা চিন্তাশীল মুরীদের হৃদয় সদা চিত্তাকর্ষক। চিত্তের চিরন্তন গুণধর সুকোমল মানুষের কথাই সাধু সৎ গুণের মুরীদগণকে তাঁদের স্মরণগাহে মুর্শীদের স্মৃতি শুধু রোমন্থন করে। কালজয়ী পুরুষোত্তম হযরত বাবা সোবহান (রাঃ) ছিলেন জ্ঞানময় বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ। ভাষা শৈলিতায় অত্যন্ত নিপুণ, কোরআন-হাদীস ও আল ফেকহুল আলাল মাজাহিবিল আরবায়া অর্থাৎ চারি মাজহাবের ফিকাহ শাস্ত্রের জ্ঞানে জ্ঞানবান। শরীয়তে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর একজন পরিপূর্ণ অনুসারী, ন্যায়-নীতির প্রশ্নে আপসহীন একজন ব্যক্তিত্ব। মুরীদের দুঃখ দূর্দশায় দারুন দরদী দাতা। অচিন্তনীয় কঠোর সাধনায় আল্লাহ্ প্রাপ্তির পথের একজন গোপন সন্ধানি। তিনি আমাদেরকে কথায়, কাজে, অনুশীলনে সংসারে কোন সমস্যায় কোন ধরনের সমাধানমূলক কাজ করতে হবে তা সহজ সরলভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা হযরতের দেয়া মত ও পথে চলে শুধু কল্যাণই পেয়েছি। এও দেখেছি যারাই নিজের বুদ্ধি ও রীপুতাড়িত ধারণার বশবর্তী হয়ে চলেছে তাদের অবস্থা 'হযবরল' হয়েছে।

মোরশেদ কেবলাহ কারো কোন নব্য জটিল সমস্যা দেখা দিলে অল্প অথচ সরল কথায় প্রত্যুতপন্নমতির ন্যায় উত্তর ও সমাধান দিতেন। মুরীদের সংকটে বা কোন কিছু জানার জন্য কোন জিজ্ঞাসায় তিনি যে কথা বলতেন তা কথার কারামতে পরিণত হত। এত কিছু সত্তেও আমাদের আত্মীয়-স্বজন ও মুরীদগণের কেউ কেউ হযরতের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য আকীদা পোষণ করছেন। সতর্ক না হলে হবেই তো। কারণ জ্ঞান সম্পর্কে আল কোরআন-হাদীসে বিশদভাবে যা বলা আছে তা প্রণিধান যোগ্য। "যদি কোন ব্যক্তির আমলের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি থাকে

তাহলেও তাঁর মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভ্রান্ত আকিদা থাকলে আর কোন সুযোগ থাকে না (হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ), সূত্রঃ তওবা ও গুণাহ মাফ)।" আজকাল অতি সহজে অন্ধকার চোরাগলিতে ধূম্রজাল সৃষ্টিকরে সরল মনাদেরকে বিভ্রান্ত করতে বেগ পেতে হয় না। "ওয়ামাই ইউদলিল ফালান তাজিদালাহু ওয়ালিয়াম মুর্শীদা।" অর্থ- "আমি যার ভাগ্যকে সুউন্নত করবনা তার ভাগ্যে আমি একজন কামেল মুর্শীদ রাখি নাই (আল কোরআন-সূরা কাহফ, আয়াত-১৭)।"

আম্বিয়া (আঃ) হতে পরবর্তীতে যতদিন তাঁদের পূর্ণ অনুসারীগণকে হেদায়েতের কার্যভার অর্পণ করে আল্লাহ্ তা'য়ালা দুনিয়ায় রাখবেন তাঁদেরকে নিরলস সম্মান দেখাতে স্বেচ্ছায় কেউ বেলেহাজ শৈথিল্য করলে এর জওয়াবদিহিতার দিয়তে অর্থাৎ দায়ভারে পরে যাবে এতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং আজকাল কোরআন সুন্নাহর উপর নির্ভরশীল দ্বীনের সঠিক আকিদা একেবারে আখেরি জামানায় এসে অতিব দুর্বল ও মনগড়া হয়ে গেছে। এমন যুগ সন্ধিক্ষণে হযরত মুর্শীদ ক্বেবলাহ গাউসে যামান, শায়খ-উল-ক্বোররা শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর পথ দেখানো রুসুম অর্থাৎ আদর্শের জন্য আমরা এই বইটির প্রথম সংস্কণের পর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম।

যাঁরা যেভাবে পেরেছেন উদার মনে সাহায্যকারী হাত এ বিষয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা এবং আমরা লেখক ও প্রকাশক উভয়কে আল্লাহ্ তা'য়ালা হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর উম্মতের 'নাজি' অর্থাৎ নাজাত প্রাপ্ত দলের মধ্যে সামিল করে নেন এ প্রণতিই জানালাম রাব্বুল উলাকে। আমিন! সুম্মামিন!! বহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

এলাহি তোফায়েলে পীর শাহ্ শায়খ সোবহান,
সাত কেরাতে শায়খুল কোররা যিনি অবিসম্বাদিত হন।
মানব রীপুর রাজত্বে প্রবেশী যিনি মহা সমর লিখেন,
অনবদ্য অনুপম নির্দেশিকা মানবেরে দিলেন।
সাবের আহকারের যিনি মুর্শিদ তপোধন,
খোদার রহম বর্ষুক উপরে তাঁহার অগণন।

তারিখঃ ১৫/১০/২০২৪ ঈসায়ী

আহকার লেখক
মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবের সোবহানী আল ক্বাদেরী
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
আরেফে রাব্বানী শাহ আবদুস সোবহান রিসার্চ সোসাইটি
কুমিল্লা-৩৫০০ মোবাইল-০১৭১৮৩৭২৬২৬
ই-মেইলঃ golam.zobair@gmail.com

প্রকাশকের কথা

বিসল্লিাহির রাহমানির রাহিম

নাহমুদুহু ওয়া নূসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারিম। আল হামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে অত্র জীবনী গ্রন্থটির নতুন আঙ্গিকে প্রথম সংস্করণের পর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনার কাজ সমাপ্ত হলো। বইটিতে আমার আব্বাজান এবং পীর মুর্শীদ গাউসে যামান, মোজাদ্দেদে যামান, শায়খ উল ক্বোররা, হযরত শাহ সুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর জীবনের বিভিন্ন দিকের আরও কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। যা তাঁর মহাসমুদ্র তুল্য জীবনের তুলনায় ক্ষুদ্র এক পাত্র পানির ন্যায়। বহু মুখি গুণধর জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব আব্বাজান কেবলাহ কেমন ছিলেন সেটি বলার চেয়ে তিনি কেমন ছিলেন না সেটি বলাই যেন সহজ। জীবনের এমন কোন অধ্যায় নেই যেখানে আব্বাজানের শিক্ষা-দীক্ষার জ্যোতি ও তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা দেখতে পাইনি। তাঁর রচিত কাসিদা ও বাংলা কাব্য সূমহ পাঠ করে এখনো মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। তিনি মুরীদগণকে কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সহজ সাধ্য যে সমস্ত অযিফা-আমল শিক্ষা দিয়েছেন তা ইখলাসের সাথে পালন করলে উভয় জগতে আল্লাহ্ তা'য়ালার অশেষ নেয়ামত লাভ সম্ভব।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ভ্রান্ত আকিদা পন্থিদের মতবাদের বিভিন্ন প্রচার প্রসার দেখে আব্বাজানের জীবন, কর্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আমাদের বর্তমান প্রজন্মের কেউ কেউ ভুল ধারণা ও বাতিল আকিদার পথে পা বাড়াচ্ছে এবং তাঁর শিক্ষা-দীক্ষার নির্ভুলতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও বিরূপ মন্তব্য করছে। এতে আমার চিন্তা হয় যে পরবর্তী প্রজন্ম সঠিক আকিদা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। তখন আব্বাজান কেমন ছিলেন ও তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা কেমন ছিল সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য 'কে এই মহান তাপস বইটি তাদের হাতে তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করি। যেন তারা আব্বাজান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা ও সঠিক আকিদা লাভ করতে পারে।

বইটির লিখক আব্বাজানের একনিষ্ঠ ভক্ত-মুরীদ জনাব মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাবের সোবহানী আল ক্বাদেরী ইখলাস পূর্ণ অন্তর নিয়ে এ কাজে অগ্রসর হয়েছেন তাতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু বইটি পাঠের পর কিছু তথ্যগত ভুল সংশোধন এবং আমার জানা ও সংগ্রহ করা তথ্য থেকে কিছু সংযোজন করে বইটির নতুন আঙ্গিকে একটি সংস্করণ প্রকাশ করা যায় কিনা সে চিন্তা করি। সে মতে লেখকের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে প্রথম সংস্করণ প্রকাশনার কাজে আমরা হাত দেই এবং বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হলো।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে বলা দরকার যে 'সাইয়্যেদ' বংশের তথ্যের ক্ষেত্রে লেখকের ইচ্ছায় তাঁর দেওয়া তথ্যই উল্লেখিত আছে। এ বিষয়ে আমার কোন মন্তব্য নেই। আমার আব্বাজান শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর বংশধারা যে 'সাইয়্যেদ' এটা জানতেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ সংক্রান্ত নসবনামা সংরক্ষিত হয়নি বিধায় তিনি সবাইকে নিষেধ করেছিলেন 'সাইয়্যেদ' শব্দটি তাঁর কিংবা পরবর্তীদের নামের সাথে ব্যবহার করতে। আব্বাজান কেবলাহর এই নিষেধজ্ঞার প্রতি সম্মান জানিয়ে লেখক সাহেবও জীবনী গ্রন্থের খাতিরে তাঁর জানা তথ্যটি উল্লেখ ব্যতিত কোথাও আব্বাজান বা আমাদের কারও নামের সাথে সাইয়্যেদ শব্দটি ব্যবহার করেননি। আশা করি আব্বাজানের এ নিষেধাজ্ঞার ব্যপারে তাঁর পরবর্তী বংশধর ও অন্যান্য সকলেই যত্নশীল হবেন। কেউ এর ব্যতিক্রম করলে লেখক বা প্রকাশক এর দায় বহন করবেন না।

বইটির সংস্করণ ও প্রকাশনার কাজে যুক্ত হওয়ার পর অনেক দিন-রাত পরিশ্রম কালে বুঝতে পেরেছি লিখক কি রকম পরিশ্রম করেছিলেন। আল্লাহ্ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে আমাদের এই পরিশ্রম কবুল করুন। এখানে কারো নাম উল্লেখ করে ধন্যবাদ দিতে চাই না। পরম করুনাময় আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে এটাই বিনীত প্রার্থনা যে, এই বইয়ের লিখক, প্রকাশক তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ ও সুহৃদ পাঠক এবং তাদের পরিবার পরিজন সকলকে তিনি সব জায়গায় আউলিয়াগণের সাথী হিসেবে রাখুন এবং রাসূলে কারিম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এঁর শাফায়াত নসিব করুন (আমিন)।

তারিখ: ১৫/১০/২০২৪ ঈসায়ী

বিনীত

আলহাজ্ব শাহজাদা মাহবুব ইলাহ আল ক্বাদেরী
সভাপতি
শাহপুর দরবার শরীফ, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭১১-১৮৯৮৩১

এক নজরে পুস্তকের ভিতর

কি		কোথায়
০১	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০১
০২	আলা হযরতের জন্ম, শৈশব ও বাল্যকাল	০২
০৩	শিক্ষা	০৪
০৪	শিক্ষা জীবনের একটি ঘটনা	০৬
০৫	শায়খ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বায়াত গ্রহণ	০৮
০৬	হযরতের তরিকতের শিজরা	১২
০৭	পারিবারিক দায়িত্ব পালন	১৪
০৮	হযরতের মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা	১৬
০৯	হরযতের সফর কালের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা	২৬
১০	হযরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথে সাক্ষাত	২৬
১১	কবরের ভিতরে আশ্রয়	২৭
১২	ঘোড়ার আস্তাবলে আশ্রয়	২৭
১৩	মরুভূমিতে ঠান্ডা দই	২৮
১৪	এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কান্ড	২৯
১৫	ইউসুফ (আঃ) কে জানার আগ্রহ	২৯
১৬	হযরত কেবলার একটি স্বপ্ন	৩০
১৭	কুর্দিস্তানের ঘটনা	৩০
১৮	হযরতের বিচক্ষনতা	৩১
১৯	হযরতের চিল্লাহ করার কতিপয় নমুনা	৩৩
২০	চিল্লাহয় বসার নিয়ম-কানুন	৩৬
২১	চিল্লাহ পালনকালে নির্দেশ পালনের কঠোরতা	৩৭
২২	চিল্লাহকারীর জয্বা	৩৮
২৩	হযরতের সামাজিক কর্মকাণ্ড	৩৮
২৪	হযরতের বায়াত করন	৪১
২৫	হযরতের দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা	৪২
২৬	হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযার সনাক্তকরণ	৪৩
২৭	আলা হযরত কেবলাহর বিবাহ	৪৭
২৮	তরিকতে হযরতের উর্ধ্বারোহণ	৫২
২৯	দার্শনিক পর্যালোচনায় হযরতের কাবেলিয়াত	৬৯
৩০	‘গুরু’ শব্দের ব্যাখ্যা	৭১
৩১	লেখকের হৃদয় চোখে মুর্শীদ	৭২

৩২	একজন ভক্তের প্রণতিপত্র	৭৩
৩৩	মুরীদগণকে নফস দমনের শিক্ষা দান	৭৭
৩৪	১১ শরীফে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব	৭৮
৩৫	মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে পীরকে পরীক্ষা	৭৮
৩৬	জনৈক অলীয়ে কামেলকে আব্রুআয়ন ও কুতুবীয়াত প্রদান	৭৯
৩৭	ইন্তেকালের পর কুতুবীয়াতের মর্যাদা দান	৮১
৩৮	মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ) কে জালালাবাদ প্রেরণ	৮১
৩৯	মাছের ভুনা কলিজা আহার	৮২
৪০	খাজা বাবাকে শিকার	৮৩
৪১	পদব্রজে সিলেট যাওয়ার আদেশ	৮৪
৪২	হযরত শামস্ তাবরীজ (রাঃ) এঁর দরবারে কাফেলা প্রেরণ	৮৬
৪৩	আগরতলার মহারাজার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ	৮৭
৪৪	তুলসি গাছের চেয়েও কি নিকৃষ্ট?	৮৮
৪৫	চাটগাঁও বদলি	৯০
৪৬	আরেকজন অলীর মাধ্যমে প্রকাশ	৯১
৪৭	মাটির নিচে কাঁঠালের অবস্থা	৯২
৪৮	বড় মাছ নজরানা	৯৩
৪৯	অদৃশ্য থেকে আঘাত প্রতিহত করা	৯৩
৫০	ঘাতকের আঘাত থেকে জীবন রক্ষা	৯৫
৫১	ডঃ সানাউল্লাহকে হযরতের বিচক্ষণ উত্তর প্রদান	৯৭
৫২	ইয়ে তো স্রেফ তাসবিহ ওয়ালা ফকির নেহীঁ	৯৯
৫৩	অন্তর দর্শণে মিথ্যা সনাক্ত	১০০
৫৪	তোরা কি আমাকে ভিক্ষুক মনে করেছিস?	১০১
৫৫	সাইয়্যেদ বংশ সমাচার	১০২
৫৬	পীরের দরবারে কাজের শিক্ষা	১০৩
৫৭	বাছুর মরে নাই	১০৪
৫৮	হযরতের কামালত পরীক্ষা	১০৪
৫৯	ঘোড়ার চিকিৎসা	১০৫
৬০	এক ধাক্কায় আজমীর	১০৬
৬১	মেহমানদারী	১০৭
৬২	গোস্ত খাওয়া	১০৮
৬৩	সুরমা নদীর ব্রিজ	১০৯
৬৪	বেতের শাস্তি	১০৯
৬৫	পানি পড়া	১১০

৬৬	আমার আর চিন্তা কি?	১১১
৬৭	পীর প্রাপ্তি	১১১
৬৮	রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতে চাচ্ছেন	১১৩
৬৯	স্বর্ণ তৈরী	১১৪
৭০	আমার আগে কই যাস	১১৪
৭১	তিনি বাক সিদ্ধ মহাপুরুষ	১১৫
৭২	দুধ খাওয়ালেন বন্দীশাহ (রাঃ)	১১৫
৭৩	মুরীদকে চেনা	১১৬
৭৪	খাদ্য দ্রব্যের প্রতি সম্মানের নসিহত	১১৭
৭৫	হুক্কার ঘটনা	১১৮
৭৬	ট্রেন ধরা	১১৮
৭৭	তসবিহর দানা একটি কম	১১৯
৭৮	চলন্ত ট্রেনের নীচে	১১৯
৭৯	লেখকের প্রণতি	১২০
৮০	হযরত কেবলাহর দান	১২২
৮১	হযরত কেবলাহর রচনাবলী	১২৪
৮২	হযরতের ওফাত	১২৫
৮৩	অমীয় বানী	১২৮
৮৪	সূত্র সমূহ	১৩২

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

নাম : হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ)

লকব : গাউসে যামান, মোজাদ্দেদে যামান, শায়খ-উল-ক্বোররা, হাজীউল হারামায়েনাশ্ শারীফাইন, সুফী, আল ক্বাদেরী ।

জন্ম : ১৮৭৬ ঈসায়ী ।

জন্মস্থান : কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত চান্দপুর গ্রাম ।

বংশ কুনিয়াত : পিতা- হযরত সাইয়্যেদ মীর কাশেম আলী (রাঃ)
মাতা- হযরত সাইয়্যেদা জোহরা খাতুন (রাঃ)

ওফাত : ৭ই রজব ১৩৭৪ হিজরী, ৩রা মার্চ ১৯৫৫ ঈসায়ী, ১৯ শে ফাল্গুন ১৩৬১ বাংলা । বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ৯.০০টায় ।

মাজার : কুমিল্লা শহরের পার্শ্ববর্তী পাঁচথুবি ইউনিয়নের অন্তর্গত শাহপুর গ্রামে ।

রচনাবলী :
১ । ক্বাসিদায়ে সোবহান
২ । শোগলে ক্বাদেরী
৩ । ঈদুল মৌলুদ
৪ । ক্বেরাত শিক্ষা
৫ । দরদে দিল
৬ । মহা সমর
৭ । ব্যবসায়ী আম্বিয়া
৮ । বাংলা কাব্যে শিজরা ।

আলা হযরতের জন্ম, শৈশব ও বাল্যকাল

শুরু করছি অবিরত প্রশংসা সহ সেই পূত পবিত্র অসীম, এক, অদ্বিতীয়, মহানসত্ত্বা আল্লাহ্ তায়ালার নামে এবং সাথে সাথে সীমাহীন সালাম ও তসলিম জানাই চরম সত্য সাক্ষীর মধ্যমণি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, তাঁর পাকিজা বংশধরগণ, প্রিয় ও প্রাণ নিবেদিত সাহাবীগণ এবং রাসূলগণের ওয়ারিশ সকল আউলিয়া কেরামগণের উপর।

হযরত শায়খ্ শাহ সাইয়্যেদ আবদুস্ সোবহান আল-ক্বাদেরী (রাঃ) হযরত মাহবুবে সোবহানী কুতুবে রাব্বানী শায়খ-উল-মাশায়েখ সাইয়্যেদেনা মহিউদ্দিন আবদুল ক্বাদেরী জিলানী শাইয়্যানলিল্লাহ (রাঃ) এঁর পবিত্র বংশোদ্ভুত। হযরত পীরানে পীর মাহবুবে সোবহানী গাউসুল আযম (রাঃ) এঁর শাহজাদাগণের বংশধরের মধ্যে চারজন নাতি ইরান থেকে বঙ্গের উদ্দেশ্য ভারত বর্ষের দিকে রওয়ানা হন। তাঁরা বহু পথ অতিক্রম করে ভারত বর্ষের দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। তখন মোগল রাজবংশের সময়কাল চলছিল। তাঁরা দিল্লী থেকে বিভিন্ন সময়ে বঙ্গে এসে উপস্থিত হন। গাউস পাক (রাঃ) এঁর শাহজাদাগণের যে চার জন নাতি বঙ্গে এসেছেন তাঁরা হলেন, যথাক্রমে হযরত শাহ্ মখদুম রূপোস (রাঃ), রাজশাহী। হযরত সাইয়্যেদ শাহ্ মিরান (রাঃ) কাঞ্চনপুর, নোয়াখালী। হযরত সাইয়্যেদ শাহ্ মুরাদ (রাঃ) ছালিয়াকান্দি, কুমিল্লা। হযরত সাইয়্যেদ শাহ্ বাহাউদ্দিন বাকের (রাঃ) চরবাকের, কুমিল্লা। উল্লেখ থাকে যে, একদা গোমতী নদীর তীরবর্তী বর্তমানে চরবাকের নামের এলাকাটি নদী ভাঙ্গনের ফলে ধীরে ধীরে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। এ সময় হযরত বাহাউদ্দিন বাকের (রাঃ) সে এলাকায় আগমন করেন এবং তাঁর আগমনের পর সে এলাকা ভাঙ্গন থেকে রক্ষা পায়। ফলে জায়গাটি তাঁর নামানুসারে হয়ে দাঁড়ায় চরবাকের। এই হযরত বাহাউদ্দিন বাকের (রাঃ) এঁর বংশ পরম্পরাতেই আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ)।। হযরত বাহাউদ্দিন বাকের (রাঃ) এঁর বংশধর অর্থাৎ আলা হযরতের পূর্ব পুরুষগণ বঙ্গের সুবেদার শায়েস্তা খাঁর দরবারে রাজ কর্মচারী হিসেবে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী কালে ইংরেজ শাসনামালে বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের ফলে রাজকার্য ছেড়ে দিয়ে তেজারতি বা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। এ পর্যায়ে হযরতের পূর্বপুরুষ ঢাকার বর্তমান জয়নাগ রোডের মীর বাড়ীতে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময়েই কোন একদিনে জয়নাগ রোডের মীর বাড়ী থেকে মীর সাইয়্যেদ কাশেম আলী (রঃ) ব্যবসা উপলক্ষে কুমিল্লা আগমন করেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় তিনি কুমিল্লা কোতয়ালী থানার মোগলটুলীতে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। কিন্তু পরম প্রেমময় মহাকৌশলী

খোদা তায়ালার ইচ্ছাতেই তিনি দারিদ্রকে বরণ করে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ জীবন যাপন করতে থাকেন। পরবর্তীতে হযরত সাইয়্যেদ মীর কাশেম (রঃ) কুমিল্লা সদরের চান্দপুর গ্রামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সৈয়দ নাছির উদ্দিন সাহেবের বিদুষী তনয়া সৈয়দা জোহরা খাতুনের সাথে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সৈয়দ মীর কাশেম আলী (রাঃ) এঁর ঔরশে, সৈয়দা জোহরা খাতুনের গর্ভেই জন্ম নেন কালজয়ী মহাতাপস, যুগশেষ্ঠ সুফীপ্রবর, হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)।

জন্মঃ হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) তাঁর মাতৃ গর্ভের সপ্তম মাসের সময় জন্মগ্রহণ করেন। সময়টি তখন সুবেহ সাদেক। কিছুক্ষণ পরেই সূর্য উদিত হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ায় আজান দেয়া হল। যেন মহাকালের গর্ভ থেকে মানুষের অন্ধকার হৃদয়কে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত আলোক সূর্যের উদয়ে আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁরই জয় ঘোষিত হচ্ছে। জন্মকালীন সময়ে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মানুসারে যে আকারে মানব সন্তান মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয় তার চেয়ে আশ্চর্যকর ছোট আকারে তিনি ভূমিষ্ট হন। শুধু তাই নয় জন্মের পর থেকে সাতদিন পর্যন্ত তাঁর জড়জগতের চোখ ফোটেনি। মহা কৌশলময় আল্লাহ্ তায়ালা যাদেরকে তাঁর পছন্দ অনুসারে প্রিয় বান্দা বানাবেন তাঁদের কে নিয়ে তিনি তাঁর কৌশলের কত কি-ই না দেখান। হযরতের ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর এই নাজুক পরিস্থিতিতে হযরতের নিকটাত্মীয়গণ তাঁকে কার্পাস তুলার মধ্যে রেখে অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে প্রতিপালন করার ব্যবস্থা নেন। তিনি জন্ম নেয়ার পর থেকে তাঁর অসুস্থ মায়ের অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই তিনি অনেক দিন মাতৃদুগ্ধ পান করা থেকে বিরত থাকেন। এই মহর্ষি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন তাঁর সু-শিক্ষিতা মাতা আল-কোরআন ও আল-হাদীস চর্চার পাশাপাশি 'দরবেশনামা' (আউলিয়াগণের জীবন চরিত্র) ও বীর মোজাহেদগণের বীরত্ব গাঁথা 'জঙ্গনামা' (যুদ্ধগাঁথা) পাঠ করতেন। তার মাতার 'জঙ্গনামা' পাঠের প্রভাব দেখা যায় তাঁর জন্ম পরবর্তী সময়ে। পরবর্তীতে কালের পরিক্রমায় কর্মময় জীবনে যখন তিনি একজন বীর মোজাহিদের ভূমিকা পালন করেছেন। বার্ধক্য জীবনে এসে তিনি স্বয়ং তাঁর মুরীদগণের নিকট এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমার মা জঙ্গনামা' পাঠ করেছেন দেখে আমি পরবর্তীতে একজন বীর মোজাহিদ হয়েছি।" কিন্তু 'দরবেশ নামার' বিষয়বস্তুও যে তাঁর জীবনে পুংখানুপুংখভাবে চিত্রায়িত হয়েছে মধ্যাহ্নের দিবাকরের ন্যায় এ সত্যটিকে তিনি সুকৌশলে অনুল্লেখ রেখেছিলেন।

শৈশব ও বাল্যকাল: আমি (লেখক) 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' গ্রন্থ সমূহে অনূন্য আড়াইশত প্রখ্যাত অলী দরবেশগণের জীবনী পাঠ করেছি। এ সকল অলী দরবেশগণের জীবনে যে ধাঁচ ও ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়েছে তা আমার এ প্রিয় মুর্শীদ কাবার শৈশব ও বাল্য জীবনেও সেই ধাঁচ ও ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম ছিলনা। প্রভাতের সূর্য দেখলে যেমন বুঝা যায় যে দিন কেমন যাবে। তাঁর শৈশব ও বাল্য কালও সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ করতো যে পরবর্তীকালে তাঁর থেকেও হেদায়েতের জ্যোতি বিকিরিত হয়ে জগৎকে আলোকিত করবে। তাঁকে শৈশব কাল থেকেই অনেকটা আত্মনিমগ্ন থাকতে দেখা গেছে। অন্যান্য আর দশজন সমবয়সীদের সাথে তিনি অহেতুক খেলাধুলায় আত্মনিয়োগ করেননি। যদিও বা কদাচিৎ সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা দেখতেন। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শীদের ভালবাসা, পিতা-মাতার সযত্ন ও সতর্ক তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন এবং আত্ম-সচেতনতার মধ্য দিয়ে তিনি পাড়ি দিতে লাগালেন তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল।

শিক্ষা

প্রভাতের সূর্য যেমন ধীরে-ধীরে লাল প্রভা ছড়িয়ে উদিত হয়ে মধ্যাহ্নের ঔজ্জ্বল্যের দিকে যায়। তেমনি হযরত শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) ও শৈশব অতিক্রান্ত করে শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করলেন। শুরু হয় তাঁর জগতের পাঠশালা হতে শিক্ষা গ্রহণের পালা। প্রতিষ্ঠানে যাবার আগেই পিতা-মাতার সযত্ন তত্ত্বাবধানে গৃহের শিক্ষার কাজ সুচারু রূপে সমাপ্ত করলেন। গৃহের প্রাথমিক পাঠ সমাপন করার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বালক শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) কে কুমিল্লা শহরে অবিস্থত হোচ্ছামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা নামক শিক্ষা নিকেতনে ভর্তি করানো হয়। ছোট বেলা থেকেই তিনি শিষ্টাচার, ভক্তি নিয়মানুবর্তীতার শিক্ষা পেয়েছেন গুরু জনদের কাছে। সুতারাং, স্কুলের পাঠ্য জীবনেও নিয়মানুবর্তী হয়ে কঠোর অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে লাগলেন। সাথে মহাপ্রভু প্রদত্ত মেধা শক্তির মিশ্রণ তো আছেই। ফলে প্রতি বৎসরই বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল লাভ করতেন। বলা বাহুল্য তাঁর শিক্ষানুরাগ, মিষ্টি ভাষা, বিনয়, শিষ্টাচার ইত্যাদি সদগুণাবলীর কারণে শিক্ষক, সহপাঠী নির্বিশেষে সব মহলেই বিশেষভাবে সমাদৃত হতেন। তাঁর সহপাঠীগণ তাঁকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন। হযরতের আত্মীয় স্বজন এবং প্রবীণ মুরীদগণের কাছ থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য সহপাঠীদের মধ্যে যদিও বা কোন অপ্রয়োজনীয় কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ; দেখা যেত যে, তিনি তাদের কাছাকাছি এলেই তারা তাঁর সম্মানে চুপ হয়ে যেত। তারা বলত, "চুপ, চুপ, ঐ দেখ সোবহান আসতেছে।" এছাড়াও হযরতের মাদ্রাসায় যাবার সময় বা ফেরার সময় নদীর খেয়া ঘাটে নৌকায় উঠার কালে অন্যান্যগণ তাঁর পরে উঠতেন ও পরে

নামতেন বা সসম্ভ্রমে জায়গা করে দিতেন। হযরত কেবলাহ রাস্তা দিয়ে চলাচল করার সময় অযথা এদিক সেদিক তাকাতেন না। নিজের দৃষ্টি অত্যন্ত সংযত রেখে চলাফেরা করতেন। এ প্রসঙ্গে সে সময়ের চানপুর খেয়াঘাটের ইজারাদার সুপরিচিত মজিদুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেছেন," আমি এই খেয়াঘাটের ইজারাদার হওয়ায় সবসময় এখানেই থাকি। কত রকমের লোক ঘাটে আসে। চামার বাড়ির মেয়েলোক গুলোতো প্রায় সময় নদীর ঘাটেই পড়ে থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। কত লোকের কত রকমের স্বভাব প্রকৃতি ও দৃষ্টি ভঙ্গি দেখেছি এখনও দেখছি। কিন্তু একজনই আমাকে আশ্চর্য করেছে। আবদুস সোবহান নামক ছেলেটিকে আমি দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর ভাল ভাবে লক্ষ করেছি কিন্তু কখনই নিম্ন দিক ছাড়া ডান অথবা বাম দিকে চোখ উঠিয়ে দৃষ্টির অপব্যয় করতে দেখি নাই।" নিম্নে আলা হযরতের মাদ্রাসার শিক্ষাকালীন সময়ে মাতৃ-ভালবাসার একটি ঘটনা তুলে ধরা হল:-

হযরতের ঘরে তাকের উপর রক্ষিত একটি সিকি ছিল। ঐ সময় হযরতের তা দরকার হল। তখন হযরতের আম্মা গৃহে ছিলেন না। তাড়া থাকায় তিনি কিছুক্ষণ মায়ের অপেক্ষা করে মুদ্রাটি তাক থেকে নামিয়ে মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু মাদ্রাসার ক্লাস শুরু হলে শ্রেণীকক্ষে এ মহামতি বালকের হৃদয় আত্ম-জিজ্ঞাসায় দংশিত হতে লাগল। তাঁর মা হয়ত বাড়ীতে এসে সিকিটি না পেয়ে চিন্তা করতে পারেন বা মায়ের কোন প্রয়োজনে হয়ত এটা লাগতে পারে। তাঁর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর শিক্ষক থেকে সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়ি গেলেন যা পাঠ্য জীবনে তিনি সাধারণতঃ করেননি। বাড়ীতে যেয়ে মাকে মাদ্রাসা থেকে আসার কারণ ও বিষয়টি জ্ঞাত করালেন। তাঁর এ আচরণে তাঁর মা অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি মাদ্রাসায় ফিরে আসলে মাদ্রাসার হেড মোদাররেস (শিক্ষক) তাঁর সাময়িক ছুটি নেয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বাড়ী থেকে না বলে সিকিটি নিয়ে আসায় তাঁর মনের অস্থিরতার কথা বললেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে শিক্ষক মন্তব্য করলেন, "বড় হয়ে তুমি একজন কামেল অলী হবে।" এই উন্মুক্ত হৃদয়ের বালক কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে অধ্যয়ন করে বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষাগুলো কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। সামনে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার প্রস্তুতিও চলছে সুন্দর ভাবে। কিন্তু এর আগেই পরম দয়াময় আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দার বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা নিয়ে নিলেন যেন ভবিষ্যতে আল্লাহ্তা'লার একজন খাঁটি প্রিয় বান্দা হতে পারেন। অর্থাৎ-ইত্যবসরে তাঁর পিতা হযরত সাইয়্যেদ মীর কাসিম আলী ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। যাক, শেষ পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পরীক্ষা সহকারে মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। সেখান থেকে জমিয়তে উলা পাশ

করেন। হযরত তাঁর ছাত্র জীবন থেকেই দেশের জাগরণ তথা দেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে সহপাঠী ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। যার ফলে তখন থেকেই বেনিয়া ইংরেজ গোষ্ঠির প্রশাসন হযরতের দিকে বিশেষ নজর রেখেছিল।

শিক্ষা জীবনের একটি ঘটনা

ফরিদগঞ্জ থানার অধিবাসী হযরতের জনৈক সহপাঠী হযরত আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। একদিন সে হযরতকে তার দোস্ত হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেয়। হযরত বললেন যে, আমরা তো সহপাঠি এখানে আলাদাভাবে আবার দুস্তির কি প্রয়োজন? কিন্তু ছেলেটি বার বার হযরত কে উক্ত প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিল। হযরত এতে সাড়া না দিলে ছেলেটি হযরতের আম্মার সাহায্য কামনা করল যাঁকে সে আম্মা ডাকত। হযরতের আম্মা হযরতকে বললেন যেন ছেলেটির সাথে দুস্তি করে। সেই আমলে দুস্তি প্রথা প্রচলন ছিল। বিয়ে সাদীর মত আত্মীয়-স্বজন এলাকাবাসী সবাইকে দাওয়াত দিয়ে ধুমধাম করে জেয়াফত করত এবং সেই অনুষ্ঠানে একে অপরের দোস্ত হিসেবে ঘোষণা দিত। কিন্তু হযরত এতে সায় না দিয়ে মাকে বুঝালেন যে এর কোন প্রয়োজন নেই। কারণ দুইজন এক সঙ্গেই পড়াশুনা করছি।

হযরতের এক ফুফা একদিন বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি লাকসামের সাবরেজিষ্ট্রার ছিলেন। দু একদিন এখানে থাকার পর তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ট্রেন ছিল রাত ১.৩০ মি.। হযরত তাকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে আসলেন। হযরতের বাড়ী চান্দপুর গ্রামে। রেল ষ্টেশন থেকে প্রায় ৩ মাইলের অধিক দূরত্বে, সময়টি ছিল শীতকাল। ট্রেন ছেড়ে গেল। এতরাতে হযরত ক্বেবলাহ কিভাবে বাড়ি ফিরে যাবেন তা চিন্তায় আসলো। হঠাৎ খেয়াল হলো বাড়ি না গিয়ে ফরিদগঞ্জের সেই সহপাঠীর সঙ্গে তার মেসে রাত কাটানো যায়। মেসটি ছিল ষ্টেশনের কাছাকাছি বাগিচাগাঁওয়ে। হযরত মেসে পৌঁছে দেখলেন ছেলেটির কামড়ার দরজাটি খোলা। টেবিলে হারিকেন জ্বলছে। খোলা বইয়ে মাথা রেখে ছেলেটি ঘুমাচ্ছে, আরো দেখলেন বইয়ের পাতা ভিজা। হযরত বুঝলেন ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে। হযরত তাকে ডেকে ওঠালেন এবং তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ছেলেটি বলল, "ভাই তুমি আমার সাথে দোস্তি করতে রাজি হচ্ছো না বলে আমার মন প্রায়ই পেরেশান হয়ে ওঠে এবং কান্না আসে।" হযরত রাগান্বিত স্বরে বললেন," এটা কি ধরনের ব্যাপার। ছেলে মেয়েদের মধ্যে এ জাতীয় অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আমরা দুজনই ছেলে। আমাদের মধ্যে এটা কেন হবে।" ছেলেটি বলল, "তাহলে ভাই তুমি আমার কথা শোন-

আমি যখন জুনিয়র মাদ্রাসা পাস করি তখন আমার বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেন। এটা জানতে পেরে বাবাকে বললাম আমার আরো উচ্চ শিক্ষা করার আগ্রহ আছে। আমি এখন বিয়ে করতে চাই না। বাবা রাগত স্বরে বললেন যে আমি বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। এখন তুমি যদি বিয়ে করতে রাজি না হও তাহলে মেয়ের বাবার কাছে কি আমার অসম্মান হবে না? বাবাকে তখন অনুনয় করে বললাম বাবা ছোট ভাইকে বিয়ে করিয়ে দাও তাহলে তোমার সম্মান নষ্ট হবে না। বাবা রাজি হলেন। আমি কুমিল্লা আসার সময় বাবা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে ছোট ভাইয়ের বিয়ের সময় যেন আমি বাড়িতে থাকি এবং বিয়ের তারিখটিও জানিয়ে দিলেন। বিয়ের দিন খুব ভোরে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে মেস থেকে বের হলাম। বের হয়েই দেখি দরবেশ প্রকৃতির একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে যাবি?" আমি তখন ছোট ভাইয়ের বিয়ের কথা ভুলে গেছি। সম্মোহিতের মতো হয়ে বললাম-যাবো। তিনি তখন আমাকে নিয়ে হাটতে আরম্ভ করলেন। কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় কোন দিকে যাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ মনে হলো চট্টগ্রাম শহরে আছি। তিনি আমাকে নিয়ে হযরত বায়েজীদ বোস্তামি (রাঃ), হযরত আমানত শাহ (রাঃ), হযরত বদর শাহ (রাঃ), ও আরো অনেক অজানা দরবারে নিয়ে জেয়ারত করিয়েছেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "তিন দিন, অতিক্রম হয়ে গেল, তোমাকে আর দেরি করানো যায় না, চল তোমাকে তোমার মেসে পৌঁছে দেই"। এই বলে তিনি আমাকে নিয়ে হাটতে আরম্ভ করতেই দেখলাম আমি আমার মেসের সামনে পৌঁছে গেছি। বুঝতে পারলাম এই লোক একজন বুজুর্গ। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললাম, "আপনি যখন ধরা দিয়েছেন, তখন আমার কিছু একটা উপায় করে দিন।" উক্ত দরবেশ তখন আমাকে বললেন, "তোমার সাথে সোবহান নামে যে ছেলেটি পড়ে তার সাথে সম্পর্ক রেখো।" ছোট ভাইয়ের বিয়ের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তাই দেরি না করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলাম। মনে মনে পেরেশান ছিলাম বাড়ি গিয়ে বাবাকে কি জবাব দিবো। যাই হোক বাড়ি পৌঁছার পর দেখলাম কেউই আমাকে বিয়েতে অনুপস্থিত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করছে না। আমার খুব অবাক লাগলো। আমি বাড়ির একজন বৃদ্ধ কাজের লোককে আলাদা করে দূরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে বিয়ের আয়োজন কেমন হয়েছে। সে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "বিয়ের সকল কাজের আঞ্জাম আপনিই তো দিয়েছেন। কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন।" আমি তখন বুঝে গেলাম এটা সেই দরবেশেরই কাজ। তাই ঘুরিয়ে তাকে বললাম," আমি জানতে চাইছি যে তোমার কাছে কেমন লেগেছে?" সে তখন উত্তর দিলো, "আপনি সকল কাজের আঞ্জাম অত্যন্ত সুন্দরভাবে দিয়েছেন। বিয়ের ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর হয়েছে।"

আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে যেই দরবেশ আমাকে নিয়ে তিন দিন ঘুরেছেন। তিনি অতি উচ্চ পর্যায়ের দরবেশ তাই তার উপদেশ মতো আমি তোমার সাথে দোস্তি করতে ব্যস্ত হয়ে আছি।"

তখন হযরত বর্ণিত ঘটনার উপর কোন মন্তব্য না করে বললেন, "ভাই রাত অনেক হয়েছে, চলো এবার ঘুমাই।"

শায়খ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বায়াত গ্রহণ

আলা হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস্ সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) ভারতের গাজীপুর থেকে আগত একজন মহান অলীর নিকট পবিত্র ক্বাদেরীয়া তরিকায় বায়াত গ্রহণ করেন। তখন তিনি বয়সে নবীণ। হযরত যখন বায়াত গ্রহণ করেন তখন ইংরেজ শাসনামল ছিল। চারদিকে ইংরেজদের প্রশাসনিক ও প্রভুত্বের দাপটে দেশবাসীর কাঁধে দাসত্বের জোয়াল ঝুলছিলো। তদানিন্তন ত্রিপুরা এবং পরবর্তীতে কুমিল্লা জেলায় মুর্শিদী-মুরিদী অর্থাৎ তরিকতের প্রথা প্রচলিত ছিল না বললেই চলে। এমন সময় একদিন বিশেষ করে কুমিল্লা শহর বাসি তথা জেলা বাসিদের সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের সুদূর গাজীপুর থেকে একজন শক্তিধর মহান তাপস অলীর আগমন ঘটে। তিনি রেংগুনে যাচ্ছিলেন। তাঁর বাহনটি দারোগা বাড়ীর সম্মুখে দূর্ঘটনায় পড়ে। তখন তিনি যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় তিনি কুমিল্লা শহরের সু পরিচিত দারোগা বাড়িতে মৌলভী আশ্রাফ উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন।

এখানে সংক্ষিপ্ত একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মৌলভী আশ্রাফ উদ্দিন সাহেব তৎকালীন একজন জমিদার, উকিল এবং বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তিনি শরীয়তি বাহ্যিক এলেমে (এলমে ফরাসাত) সু পন্ডিত ছিলেন বিধায় প্রায়ই গর্ব করে বলতেন," মেঘনার পূর্বপাড়ে যত আলেম আছে সকলের মাথাই আমার পকেটে।"

অত্যন্ত সাধারণ পোষাকে কাঁধে একটি ঝুলানো ব্যাগ সহকারে মৌলভী আশরাফ উদ্দিনের দরজায় উপরিউক্ত অলী একজন মুসাফির বেশে এসে দাঁড়ালেন। মৌলভী সাহেব তখন কাজী খাঁ ফতোয়ার কিতাব দেখে মাসালা তালাশ করছিলেন। অপরিচিত আগন্তককে দরজায় দাঁড়ানো দেখে মৌলভী সাহেব তাকে ভিক্ষুক মনে করে, একটু তাচ্ছিল্যের মনোভাব নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোম কউন হো, কাহাঁ সে আয়া আওর ক্যায়া মাঙ্গতা? তোমহারা শোগল ভি ক্যায়া?" অর্থাৎ: তুমি কে কোত্থেকে এসেছো? কিইবা চাও? তোমার পেশাই বা কি? উত্তরে আগন্তক বললেন, "ম্যাঁয় এক মুসাফির হোঁ, মুলকে হিন্দুস্থান সে আয়া, পীরী মুরীদী মেরা কাম হ্যায়।" অর্থাৎ: আমি একজন মুসাফির,ভারতবর্ষ থেকে এসেছি পীরী মুরীদী আমার

কাজ। মৌলভী সাহেব বললেন, "ওয়হ কাম তো গাঁওমে চালতে হ্যায়। ইয়ে তো এহাঁ নেহিঁ চলেগা।" প্রত্যুত্তরে আগন্তক বললেন, "ইনশাআল্লাহ্ এহাঁ সে শুরু হোগা।" অর্থাৎ- আল্লাহ্ চাহেত এখান থেকেই শুরু হবে। আগন্তক মুসাফির জিজ্ঞাসা করলেন, "মাওলানা ক্যায়া তালাশ কাররাহা হো?" ইতি পূর্বে বলা হয়েছে যে তিনি একটি মাসালা তালাশ করছিলেন। আগন্তকের প্রশ্নে মাওলানা সাহেব মাসালাটির নাম বললেন। আগন্তক মুসাফির বললেন, "ইয়ে কাজী খাঁ কিতাব কী আন্দার মিলেগা।" মাওলানা সাহেব বললেন, "ওয়হ কিতাব হাম আমিন উদ্দিন (সে সময়ের সাবরেজিষ্টার) কি সাথ সাত দাফা দেখচোকা হোঁ, মাগার মিলা নেহিঁ।" আগন্তক মুসাফির কিতাবটি চেয়ে নিয়ে এক টানে কিতাবটি খুলে কিতাবের প্রতি না তাকিয়ে আংগুল দিয়ে মাসালাটি দেখিয়ে দিলেন। অহংপূজারী মৌলভী সাহেব এটা দেখে আগন্তক মুসাফিরের প্রতি তার ভূল ধারণা বুঝতে পেরে মনে মনে লজ্জিত হলেন এবং তাঁকে তিনি ভিতরে এনে স্বসম্মানে বসালেন। আগন্ত ক মুসাফির যে একজন মস্ত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি তা তার বোধগম্য হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দারোগা মিয়াকে (যার নামে দারোগা বাড়ি) ডেকে বললেন, "ইনি জ্বীন না মানুষ? মেঘনার পূর্বপাড়ে যত আলেম আছে সকলের মাথাই আমার পকেটে। এখন দেখি এ ব্যক্তির পকেটে আমার মাথা ঢুকতে চায়।" তার সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল। হযরতের জ্ঞানের গভীরতা দেখে মৌলভী সাহেব অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। পরদিন তিনি হযরতকে হোচ্ছামিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য মাদ্রাসায় নিয়ে গেলেন। সেখানে সকল শিক্ষকের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদ্রাসার অন্যতম মোদাররেস মৌলভী ওয়াজেদ আলী সাহেব তখন অজু করতে বাহিরে গিয়েছিলেন। অজু করে ফিরে এসে আগন্তক হযরতকে দেখে কাউকে কিছু না বলে সোজা গিয়ে আগন্তক হযরতের পায়ে ধরে সালাম করে তাঁকে মুরীদ করার জন্য আবেদন জানালে হযরত তাকে বায়াত করে নিলেন। বিষয়টি মৌলভী আশরাফ উদ্দিনের অত্যন্ত অপছন্দ হলো। তিনি গোস্যার সাথে উক্ত শিক্ষককে বললেন, " জানা নেই শোনা নেই আমাকে ও কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না হঠাৎ একজন অপরিচিত লোকের কাছে বায়াত হলেন এটা কি ভাল কাজ করলেন?" উক্ত শিক্ষকও কিছুটা রাগত স্বরে বললেন, "আপনাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবো? গত রাতে হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই হুজুরকে দেখিয়ে আমাকে নির্দেশ দিলেন ওনার নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য। ঘুম ভাঙ্গার পর থেকে আমি হয়রান হয়ে আছি যে এই মহান ব্যক্তির সন্ধান কোথায় পাবো। ওনাকে দেখার পর আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কি প্রয়োজন ছিল?" মৌলভী আশরাফ উদ্দিন শিক্ষকের এই কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন এবং আগন্তক হুজুরের কাবিলীয়ত এবং মর্যাদা সমন্ধে তাঁর ধারনা আরো অনেক বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে মাদ্রাসার অধিকাংশ আলেমই হযরতের পবিত্র হাতে

মুরীদ হন এবং চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। পরবর্তীতে আলা হযরতের নিকট মুরীদ হয়ে মৌলভী আশরাফ উদ্দিন সাহেব একজন অন্যতম শীষ্য হিসেবে পরিগণিত হলেন।

আলা হযরতের এই অলৌকিক অসাধারন ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। লোকজন তাঁকে এক নজর দেখার পর তার 'উসওয়াতুন হাসানা'র অনুসৃত আচার ব্যবহার, নূরানী চেহারা মোবারক, দ্বীনি জ্ঞানের প্রাচুর্য, তওহীদ বাণী এবং খোদা প্রেমের প্রজ্জ্বলিত শিখা মানুষকে যেন 'শামা' আওর 'পরওয়ানা'র যেমন আকর্ষণ তেমনি আকর্ষণে তাঁর নিকট টেনে নিল। স্থানীয় ইতিহাস চর্চা করে দেখা গেছে যে, এখানকার খুব কম সংখ্যক লোকই এ মনীষীর আগমনের পূর্বে গাউসুল আজম হযরত বড়পীর সাহেব কেবলাহ (রাঃ) এঁর তরিকায়ে ক্বাদেরিয়া সম্পর্কে জানতো। এ মনীষী আর কেহ নন, তিনি আমাদের মহামহিম ও প্রিয় দাদা পীর সাহেব কেবলাহ গাউসে যামান শাহ্ সূফী হাফেজ মাওলানা শায়খ আবদুল্লাহ আল ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ)। এদিকে আল্লাহ্ প্রেমে আত্মদগ্ধ ছাত্র যুবক শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) ভারতবর্ষ থেকে আগত এ মহর্ষির সাথে সাক্ষাৎ রক্ষা করে চলতেন। হযরত শাহ্ আবদুল্লাহ গাজিপুরী (রাঃ) এ অধ্যয়নরত যুবকের মধ্যে দ্বীন ও হেদায়েতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত অন্তরদর্শন দ্বারা জানতে পেরে তাঁর অধ্যয়ন চালিয়ে যাবার জন্য উপদেশ দিলেন। এ জন্য তাৎক্ষনিক পর্যায়ে আলা হযরতজী তাঁকে মুরীদ করেননি। শুধু একটি কাজই তাঁকে দিলেন তিনি যেন প্রতি বৃহস্পতিবার হযরত শাহ্ সাহেবের কাপড় চোপড় নিয়ে গিয়ে ধৌত করে শনি কিংবা রবিবার আলা হযরতকে পৌঁছে দেন। এ যুবকও কাপড় চোপড় ধৌত করে নিজ নেক বুদ্ধি বলে তাতে আতর মেখে হযরতকে ফেরত দিতেন। বর্ষীয়ান মুরুব্বীগণের নিকট একথা শ্রুত যে, আলা হযরতজী কাপড় পরিষ্কার ও সু গন্ধময় দেখে বলেছেন, "বেটা মেরা কাপড়া এতনা ছাফা করকে খোশবু লাগা কর হামেশা দেতা হ্যায়, মেরি ইয়ে দোয়া কে খোদাওন্দ কারীমভী তেরা দিল এতনা সাফা কারকে খোশবুদার বানা দে।" অর্থাৎ "হে আমার মানসপুত্র তুমি সর্বদা আমার কাপড়গুলী এত পরিষ্কার করে ধুয়ে আতর লাগিয়ে দাও, আমার আন্তরিক দোয়া আল্লাহ তায়ালাও যেন তোমার হৃদয়কে তদ্রুপ স্বচ্ছ করে সুগন্ধময় করে দেন।" দক্ষ তীরন্দাজের তীর যেমন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না ঠিক তেমনি আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত অলীর আশীর্বাদও বিফলে পর্যবসিত হয় না। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ছাত্র যুবকই স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়ে আলা হযরত শাহ্ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ) এঁর দস্তে করমে নিজের তন-মন সপেঁ দিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁকে মুর্শীদরূপে বরণ করেন। হযরতের ফয়েজ ও লোত্ফে করমে অবশেষে তিনিও একদিন লাখো ভক্ত-মুরীদের হৃদয়ের আসনে মুর্শীদ রূপে অধিষ্ঠিত হন।

দারোগাবাড়ীস্থ হযরত শাহ্ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর মাযার, মসজিদ ও সংলগ্ন পুকুরের ছবি ।

হযরত শাহ্ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর মাযারের ছবি ।

হযরতের তরিকতের শিজরা

নিম্নে হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর পবিত্র ক্বাদেরীয়া তরিকার শিজরা শরীফ উল্লেখ করা হল:-

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

হাজিহী শাজারাতুন আলীয়াতুন ক্বাদেরীয়াতুন আসলুহা সাবেতুন ওয়া ফারউহা ফিস্সামায়ি। আলহামদুলিল্লাহি জাল্লা ওয়া আল্লা ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা মুহাম্মাদিন বাদরিদ্দুজা ওয়া আলা আলেহি ওয়া আসহাবিহী কাহ্ফিল ওয়ারা।

ইলাহি বহুরমতে রাজ নিয়াজ সারওয়ারে কায়েনাত খোলাসায়ে মওজুদাত পেশওয়ায়ে মুরসালীন সাইয়্যেদিল ওয়াসিলীন আহমদ মুজতবা মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

০১। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত আমিরুল মুমিনীন ইমামুল আরেফিন মাওলানা আলী মর্তুজা কার্রামাল্লাহু ওয়াজহুহু।

০২। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম হোসাইন সিবতে হাবীবে রাব্বিল মাশরেকাইন (রাঃ)।

০৩। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ)।

০৪। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)।

০৫। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)।

০৬। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম মুসা কাজেম (রাঃ)।

০৭। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত ইমাম আলী মুসা রেজা (রাঃ)।

০৮। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আসাদুদ্দীন মারুফ কারখী (রাঃ)।

০৯। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবুল হোসাইন সির্‌রি সাকতী (রাঃ)।

১০। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ জুনায়েদ বাগদাদী (রাঃ)।

১১। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবু বকর ইবনে আবদুল্লাহ শিবলি (রাঃ)।

১২। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবুল ফজল আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আবদুল আজিজ ইমনী (রাঃ)।

১৩। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবুল ফারহা ইউসুফ তারতুসি (রাঃ)।

১৪। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবুল হাসান আলী হাঙ্কারী (রাঃ)।

১৫। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আবু সাঈদ আলী মাখজুমী (রাঃ)।

১৬। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ কুতুবে রাব্বানী গাউসে সামদানী হযরত শেখ মহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জিলানী হাসানী ওয়া হোসাইনী (রাঃ)।

১৭। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ জিয়াউদ্দীন আবু নজিব আবদুল কাহের সোহরাওয়ার্দী (রাঃ)।

১৮। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আম্মার ইয়াসির আন্দালুসী (রাঃ)।
১৯। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ নাজমুদ্দীন কোবরা (রাঃ)।
২০। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মাজদুদ্দীন বাগদাদী (রাঃ)।
২১। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ রাজিউদ্দীন মারুফ আলী লালা (রা:)।
২২। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আহমদ জোরফানী (রা:)।
২৩। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ নূরুদ্দীন মশহুর বিল কবীর (রাঃ)।
২৪। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ আলাউদ্দীন (রাঃ)।
২৫। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মাহমুদ সামনানী (রাঃ)।
২৬। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ সৈয়দ আলী হামদানী (রাঃ)।
২৭। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত খাজা ইসহাক খাতলানী (রাঃ)।
২৮। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মুহাম্মদ নূর বখ্শ (রাঃ)।
২৯। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মুহাম্মদ আলী নূর বখ্শ (রাঃ)।
৩০। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মুহাম্মদ গিয়াস নূর বখ্শ (রাঃ)।
৩১। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মুহাম্মদ হাসান (রাঃ)।
৩২। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মুহাম্মদ (রাঃ)।
৩৩। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ মহিউদ্দীন ইউসুফ ইয়াহ্ইয়া মাদানী (রাঃ)।
৩৪। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ কালিমউল্লাহ দেহলভী (রাঃ)।
৩৫। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শাহ্ নিজামুদ্দীন আওরাঙ্গাবাদী (রাঃ)।
৩৬। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন দেহলভী (রাঃ)।
৩৭। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত মাওলানা শাহ্ সোবহান আলী টান্ডবী (রাঃ)।
৩৮। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ মুরাদে আলম (রাঃ)।
৩৯। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত শেখ শাহ্ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ)।
৪০। ইলাহি বহুরমতে রাজ ও নিয়াজ হযরত কিবলাতিনা মুর্শিদিনা মাওলানা শায়খ্ উল ক্বোররা শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)।

খাতমায়েঁ কামতরিন বন্দেগান ও খাতেমা ইয়ারান মা বখাইর গারদাঁ ওয়া সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলা খাইরে খালক্বিহী সাইয়্যেদেনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলেহী ওয়া আসহাবেহী ওয়া আউলিয়ায়ে উম্মাতিহী আযমাইন ওয়াল হামদুলিল্লাহী রাব্বিল আলামিন।

পারিবারিক দায়িত্ব পালন

হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) পিতার ইন্তেকালের পর হযরতের পরিবারের উপার্জনক্ষম কেউ রইল না। আলা হযরত তখনও ছাত্র, পড়া-শোনা করছেন। তখন হযরতের নিকটাত্মীয়গণ পরিবারের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টি দান পূর্বক প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব নিয়ে নিলেন। আলা হযরত কিছুদিন পর কৃতিত্বের সাথে 'জমিয়তে উলা' পাশ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ চুকালেন। পরিবারের দায়-দায়িত্ব এখন তাঁর। যেন স্রষ্টার পক্ষ থেকে পরিবারের জন্য প্রখর রৌদ্রতাপে রহমতের ছায়া। হযরত শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) কুমিল্লা ইউছুফ হাই স্কুলে এ্যাংলো পার্সিয়ান (ইংরেজি বাংলা) বিষয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিনি কিছুদিন সাবেক চাঁদপুর মহকুমার (বর্তমান চাঁদপুর জেলা) জাফরাবাদে নুরিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বাল্যজীবন থেকেই হযরতের অন্তরে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল প্রেমের দীপ্ত শিখা প্রজ্জ্বলিত থাকায় তিনি আল্লাহর পরম প্রেমাস্পদ, মদীনাতুল মুনাওয়ারায় রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর রওজাপাক জেয়ারত ও হজ্জব্রত পালনের সুপ্ত আকাংখা লালন করে আসতেন।

রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন আলা হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ)। ব্যক্তিগত জীবনে সুন্নাতের পাবন্দী হয়ে স্বীয় কাজকর্ম সর্বদা নিজ হাতে করতেন। হযরতের মায়ের অসুস্থ অবস্থায় পারিবারিক বিভিন্ন কাজ তিনি স্বীয় হস্তে করতেন এমন কি পারিবারিক রান্না-বান্নার কাজও তিনি করেছেন বলে বিভিন্ন সুত্র হতে জানা গেছে। হযরতের আম্মা তাকে বিয়ে করে সাংসারিক হওয়ার জন্য বলতেন। তিনি আরো বলতেন তার শারিরিক অবস্থা অনেক দূর্বল হয়ে গেছে। সংসারের কাজ কর্ম করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তাই ঘরে যদি বউ থাকতো তাহলে তার কষ্ট অনেক কমে যেত। হযরত তার আম্মাজানকে জানালেন সংসারের যত রকম কাজ আছে, যেমনঃ বাজারকরা, রান্নাবান্না করা, পানি টানা, লাকড়ি চিড়া, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি সংসারের সকল কাজ তিনি করে দিবেন এবং কথা মতো তিনি তাই করতেন। তারপরও ওনার আম্মাজান তাকে বিয়ে করার জন্য প্রায়ই বলতেন। কিন্তু হযরত তা এড়িয়ে যেতেন। একদিন তাঁর আম্মাজান তাঁকে শক্তভাবে ধরলেন যে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ার কারণ কি? হযরত বার বার এড়িয়ে যেতে চাইলেও তার আম্মাজান তাঁকে চাপ দিতে থাকেন। অনেক চাপাচাপির পর হযরত বললেন তিনি মদিনা শরীফ যাওয়ার চিন্তায় আছেন। তবে মাকে একা ফেলে যাবেন না। তিনি বললেন, "আম্মাজান আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি মনে প্রাণে আপনার জন্য এই দোয়া করি। তবে আমার জীবিত অবস্থায় যদি আপনার ইন্তেকাল হয় তবে আমি মদিনা শরীফ সফরে বের হব।" হযরতের আম্মা তখন হাত তুলে তাকে

দোয়া করলেন। চাকুরী করা কালীন সময়ে একদিন তার মাতার অসুস্থতা বেড়ে গেলে মায়ের সেবা যত্নের জন্য চাকুরী ছেড়ে মায়ের রোগ শয্যার পাশে চলে আসেন। এই দায় দায়িত্বের মধ্যে তাঁর একমাত্র ছোট বোনকে সৎপাত্রে সম্প্রদান সম্পাদন করেন। ছোট বোনের বিবাহ ছোট ভাইয়ের দায় দায়িত্ব, অসুস্থ মায়ের সেবা যত্ন ইত্যাদির মাঝে লক্ষ্য করলেন মায়ের শারিরিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকে এবং চেহারায় ফুটে ওঠেছে শেষ বিদায়ের লক্ষণ। পিতা হারা পরিবার, অন্তর বিদগ্ধ খোদা প্রেমে এবং মন সার্বক্ষনিক চঞ্চল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর জেয়ারতের আকাঙ্খায়। সর্ব ক্ষেত্রে ধৈর্যের এক দারুণ ক্ষণ। সব মিলিয়ে হুজুর গাউছে পাক পুরনূর (রাঃ) এঁর এরশাদ হচ্ছে, "আল্লাহ্ প্রেমের দাবিদারদের জন্য তাদের পথটি দুনিয়ায় হাজারো মুশকিল দ্বারা তিনি ঘিরে রেখেছেন, ভন্ডেরা যেন প্রেমিক দাবী করতে না পারে।" হুজুর গাউসেপাক (রাঃ) এঁর এই বাণীর চরম সত্যতা হযরতের ধৈর্য ও স্থিরতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত। এই অবস্থাটি হযরতের প্রতি যে পরীক্ষা হিসেবে ঈমানের উন্নতির জন্য দেওয়া হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অবস্থাটি পাঠকের চিন্তা করাই শ্রেয়। এ অবস্থার মাঝে একদিন তাঁর অসুস্থ মা ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)।

হযরতের পার্থীব সম্পদের আধিক্যের তো প্রশ্নেই ওঠে না, এমনকি স্বাভাবিক স্বচ্ছলতাও ভোগ করেননি। স্বেচ্ছায় দারিদ্রতাকে বরণ করে নিয়েছেন। হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর বাণী, "যারা আল্লাহ্কে ভালবাসে তারা যেন রোগ ব্যধিকে গায়ের চাঁদর বানিয়ে নেয়, আর যারা আমাকে ভালবাসে তারা যেন দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে নেয়,।" হযরত এ বাণীরই যথার্থ রূপায়ন করে নিয়েছেন তাঁর জীবনে।

এই পর্যায়ে হযরত তাঁর ছোট ভাইকে ব্যবসার জন্য দোকান করে দেন এবং তাঁকে বিয়ে করিয়ে দেন। দুনিয়াদারির সাংসারিক ঝামেলা থেকে যেন নিস্কৃতি পেলেন। তাঁর হৃদয় এখন প্রেমাস্পদের জেয়ারতের জন্য আরো উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

চান্দপুর নাজির মসজিদ নিকটবর্তী কবরস্থানে হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর পিতা (১) এবং মাতার (২) কবরের ছবি।

হযরতের মদিনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা

আল্লাহর বিশেষ পছন্দানুসারে নবী-রাসূল ও আউলিয়াগণের পারিবারিক যে দৈন্যাবস্থা পরিলক্ষিত হয়, হযরত মুর্শীদ ক্বেবলাহর জীবনেও সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর এই বৈশিষ্টটি পালন করিয়ে নেন। তিনি তার মায়ের ত্যাজ্যবিত্ত সম্পত্তি হতে ৪৫ টাকা পেয়েছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্র হতে প্রকাশ। কুমিল্লা মাঝিগাছা নিবাসী গৃহস্থ মৈধর আলী মিয়া স্ত্রীর নিজ জমির ফসল বিক্রয় লব্ধ ১০ টাকা হাদিয়া সহ মোট ৫৫ টাকা এই সামান্য সম্বল নিয়ে মুর্শীদ ক্বেবলাহ মদিনা জেয়ারতের আকাঙ্খায় বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেন।

এই দিক দিয়ে গ্রামবাসী, আত্মীয়-স্বজনদের নিকট তিনি তখনকার যুগের বিদায় সম্ভাষনে, শুভেচ্ছা স্বাগতমে, আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের রীতি পরিহার করে এবং ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সর্বসাধারণকে জানাবার মানসিক লালসাকে পদদলিত করে গোপনীয়তা রক্ষা করে মদিনা শরীফের উদ্দেশ্য রওনা হয়ে গেলেন। হযরতের পাঠ্য সময়ের বন্ধু মাঝিগাছা নিবাসী মৌলভী হানিফ সাহেব হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কে কুমিল্লা রেলস্টেশন পর্যন্ত পৌঁছে দেন। তিনি সেখান থেকে চাঁদপুর হয়ে গোয়ালন্দ পৌঁছলেন। দীর্ঘ পথের যাত্রী, পথে টাকা পয়সার প্রয়োজন, তাই গোয়ালন্দে কিছুদিন থেকে কুলিগিরি করে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করলেন। তিনি এ বিষয়ে আমাদের মোহতারেমা আম্মা সাহেবাকে বলেছিলেন যে, গোয়ালন্দ ঘাটের কুলিরা দুই থেকে আড়াইমনের বোঝা স্বচ্ছন্দে পিঠে উঠিয়ে পার করে নিয়ে যেত। হযরতের পক্ষে এই বোঝা টানা প্রচন্ড কষ্টকর হতো। কিন্তু মনের খেয়াল মদিনা শরীফ যাওয়া, তাই এই কষ্টকে কষ্ট মনে হত না। হযরত গোয়ালন্দ ঘাটে কিছুদিন কাজ করে কিছুটা পাথেয় সংগ্রহের পর গোয়ালন্দ থেকে প্রথম কলকাতায় যান। সেখানে হযরত মাওলা আলী শাহ্ (রাঃ) এঁর মাজার জেয়ারত করে ফয়েজ বরকত হাসিল করেন। অনুমান করা হচ্ছে এখান থেকে তিনি বিহারে যান। বিহারের গোরক্ষপুরে খুনিপুর মহল্লায় হযরতের দাদা পীর শাহ্ মোহাম্মদ মোরাদে আলম (রাঃ) এঁর মাজার অবস্থিত। তাই তাঁর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বিহার গমন করেন। দাদা পীরের জিয়ারতের পর তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দিল্লির মোযাফ্ফরপুরে হযরত শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) নামক একজন খ্যাতনামা অলীর সঙ্গে হযরত শাহ্ সোবহান (রাঃ) এঁর দেখা হয়। হযরত শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) দাতাজি নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর দরবারে আসলে কখনো কেউ খালি হাতে ফিরে যেত না। তাঁর অনেক কারামতের কথা জনশ্রুতিতে বিদ্যমান। হযরত শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) এঁর খানেকায় হযরত দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। তাঁকে এখানে খানেকার লঙ্গরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। হযরত অবসর সময় শাহ্ সাহেবের নিকট বসে দ্বীনি এলেম সহ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ আলোচনা

করতেন। রবিউল আউয়াল মাসে একদিন এশার নামাজের পর শাহ্ সাহেব হযরতকে বললেন, "আগামীদিন সকাল ৮টায় ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাহফিলের ব্যবস্থা করেছি। লোকজনকে দাওয়াত দিয়েছি। মিলাদের সকল ব্যবস্থার দায়িত্ব তোমার উপর রইল।"

হযরত প্রায়ই শেষ রাতে শাহ্ সাহেবের সাথে আলোচনায় বসতেন। ঐ দিনও শেষ রাতে শাহ্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। সুবেহ সাদিকের সময় শাহ্ সাহেব হঠাৎ বলে ওঠলেন "মাওলানা চাদর বিছাও এখন মিলাদ ও সালাম পড়বো।" হযরত বললেন, "আপনি সকাল ৮টায় মিলাদের ব্যবস্থা করতে বলেছিলেন। লোকজনকেও সে সময়ে আসার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন।" শাহ সাহেব বললেন, "হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাশরীফ লায়েঙ্গে আভি আওর হাম তাজিম কারেঙ্গে আট বাজে?"

শাহ্ সাহেবের নিকট অনেক তালিমের মাঝে এই শিক্ষাটিও হযরত পেয়েছিলেন যা উল্লেখযোগ্য। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন সুবেহ সাদিকের সময় তাই তাজিম করা উত্তম হবে সুবেহ সাদিকের সময়। হযরত বন্দী শাহ্ (রাঃ) এঁর আস্তানায় আসার পর হযরত শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান (রাঃ) ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপলক্ষ্যে শেষ রাতে মিলাদ ও সালামের প্রচলন করেন। বিগত শতাধিক বছর যাবৎ যা চলছে এবং ইনশাআল্লাহ্ চলতে থাকবে। শাহপুর দরবার থেকে এই শিক্ষা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে তিনি 'ঈদুল মৌলুদ বা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ' নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ণ করেন। উল্লেখ্য এই শিক্ষার অনুসরণে হযরত কেবলাহর আমল থেকেই শাহপুর দরবারের প্রত্যেকটি ওরস মাহফিলেও শেষ রাতে ফজরের আগে সালাতুস্সালাম পাঠ করা হয়।

হযরত শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান (রাঃ) বাড়ি থেকে সফরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর সম্ভবত শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) এঁর খানকায় অবস্থান কালে প্রথম বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কারণ সফরকালীন সময়ে হযরতের কাছে দেশ থেকে প্রথম যে চিঠি আসে তা এই খানকায় অবস্থান কালে। হযরতের ফুফা চিঠি দিয়েছেন এই মর্মে যে, তিনি দুইবার বিভাগীয় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছেন। এইবার যদি অকৃতকার্য হন তবে তার চাকুরি থাকবে না তাই শাহ্ সিদ্দিক সাহেবকে দোয়া করার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিষয়টি শাহ্ সাহেবকে জানালে পরে তিনি বললেন, " তাকে বল আমার খানকায় যে ১১ শরীফের মাহ্ফিল হয় সেই তহবিলে যেন ১১ টাকা পাঠিয়ে দেয়।" হযরত তাঁর ফুফাকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। হযরতের ফুফা ১১ শরীফের তহবিলে ১১ টাকা পাঠিয়ে

দিলেন। দেখা গেল হযরতের ফুফা এবার খারাপ পরীক্ষা দিয়েও ভালোভাবে পাশ করেছেন।

হযরত শাহ্ সিদ্দিক (রা:) এঁর দরবারে বহুদিন থাকার পর তিনি দিল্লিতে হযরত নিজাম উদ্দীন (রাঃ) সহ বিভিন্ন বুজুগের্র মাজার জিয়ারত করে অশেষ ফয়েজ বরকত হাছিল করেন। এর পর তিনি আজমির শরীফ গমন করেন। সেখানে কয়েকদিন থেকে খাজা বাবা (রাঃ) থেকে ফয়েজ বরকত নিয়ে তিনি মুম্বাই যান। সেখান থেকে সমুদ্রগ্রামী জাহাজে করে তাঁর প্রেমিক অন্তরে গৈরিক নিস্রাবের ন্যায় পবিত্র প্রেম নিয়ে মহা পবিত্র প্রেমাস্পদের মিলন আকাঙ্খায় মদিনার পথে রওয়ানা হলেন। তাঁর প্রেমের গভীরতার প্রমাণ মিলে তাঁর রচিত 'দরদে দিল' ও 'কাসিদায়ে সোবহান' নামক কিতাবদ্বয়ে। তাঁর অন্তরের গহীণ কন্দরে লালিত তীব্র মর্ম বেদনা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি 'দরদে দিল' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন-

"মদদকুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ মোহাম্মদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্
তব প্রেমে যেই দিন মজিয়াছে এই মন
শোকে নিশি অবসান করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্॥"

পুনরায় তিনি তাঁর মনোজগতের পূর্ণ সমর্পণী অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

"তব ইচ্ছা ছোবহানে দয়া কিংবা হানবাণে।
তোমাকে জীবন প্রাণ সপেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্॥"

বস্তুতপক্ষে হযরতজীর সারাটা জীবনই সাধনা বা রেয়াজতপূর্ণ ছিল। তিনি যখন মদীনাতুল মুনাওয়ারায় রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর রওজা পাকে পরম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে জেয়ারতের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হতেন তখন তাঁর শারিরিক মানসিক বিহ্বল অবস্থা তাঁকে মৃত প্রায় করে ফেলত। একটানা কয়েকদিনও তাঁর এ অবস্থা কেটে যেত তখন তাঁর নাওয়া-খাওয়া আহার-বিহার থাকত না। হযরতের অবস্থা এমনও হয়েছিল যে, তিনি রওজা পাকের সন্নিকট মসজিদে নববীর পাশে মৃত প্রায় হয়ে পড়ে থাকতেন। একদিন মুসল্লিগণ তাঁর অবস্থা দেখে নিকটস্থ সরকারী হসপাতালে চিকিৎসার নিমিত্তে ভর্তি করান। এ সকল ঘটনা তিনি স্বয়ং আমার পিতা ও পিতামহ এবং অন্যান্য প্রবীণ মুরীদগণের নিকট বর্ণনা করেছেন। তাঁর এ সময়ের অবস্থা 'দরদে দিল' নামক গ্রন্থের 'মদদকুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ' নামক কাব্যে কিছুটা বর্ণনা পাওয়া যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি তীব্র প্রেম ও ভালবাসার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর রচিত 'দরদে দিল' নামক কাব্যে ও 'কাসিদায়ে সোবহান' নামক উর্দু, ফারসি ও আরবি ভাষায় মিশ্রিত কাসিদা সূমহের বিভিন্ন জায়গায় মনের তীব্র বেদনা ও প্রেম ভালবাসা প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনেক রচনা

শাহপুর দরবার শরীফে একটি কুঁড়ে ঘরে বসে করেছেন। তাঁর অভ্যাস ছিল সকাল বেলা গোমতী নদীর পাশ দিয়ে হাঁটা। একদিন সকাল বেলা হাঁটতে গিয়ে দেখলেন নদীর অপরপারে একটি চিতায় আগুন জ্বলছে। এটা দেখার পর তার মনে যে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি আস্তানায় ফিরে এসে লিখতে বসেন। তিনি লিখেন-

"সখী আমি মরে গেলে না জ্বালাইও চিতানলে
না ভাসাইও গঙ্গা জলে না গাড়িও মাটি তলে।।
না ঢাক কাফন তলে না ছিট গোলাপ জলে
আমাকে ফেলিয়ে দিও মরুতে খেজুর তলে।।
মরুভূমে বালু পাশে ফেলে দিও মোর লাশে
মাংস মোর খাবে তার কাক কুকুর শৃগালে।।
বলে দিও কাক পাখি না খাবে প্রেমিক আঁখি
লুকাইও হাড় আঁখি প্রিয়া দেশে বালু তলে।।
উপরেতে সূর্যতাপ নিচে হবে বালু তাপ
অন্তরেতে অনুতাপ জ্বলিব ত্রি তাপানলে।।
ভাগ্য ফলে উট তার আসে যদি মরুপার
জুড়াইবে প্রাণ মোর যদি দলে পদতলে।।
দহিতেছে সোবহান তিলেক না অবসান
আর কি জ্বালাবে সখী যে জ্বলেছে প্রেমানলে।।"

হযরতের সফরে অতিবাহিত দশ বৎসরকাল (মতভেদে সাত বছর) কত কষ্টকর পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন এবং কত অলৌকিক ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। কথা প্রসঙ্গে বা ঘটনাবলির প্রসঙ্গ আসলে তিনি যতটুকু বলেছেন আমরা ততটুকুই জানতে পেরেছি।

হযরত মুসলিম বিশ্বে অবস্থান কালে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য মদিনা শরীফ, মক্কা শরীফ জেয়ারত করার পর বায়তুল মুকাদ্দাস, ইয়েমেন, শ্যাম, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, বর্তমান ফিলিস্তিন, তুরস্ক ও আরো বহু জায়গা ভ্রমন করেছেন। কত আম্বিয়া (আঃ), আলেম সুফি অলী আল্লাহর দরবার ও পূণ্যময় স্থান জিয়ারত করে ফয়েজ বরকত লাভ করেছেন তার অনেকটাই অজানা রয়ে গেছে। মদিনায় থাকা অবস্থায় তিনি মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শাহ্ আব্দুল আজিজ (রাঃ) এঁর নিকট থেকে ইলম ও ফয়েজ হাসিল করেন। হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর এই দীর্ঘ সফরকালীন সময়ে চারবার হজ্বব্রত পালন করেছেন বলে নিকটাত্মীয় সূত্রে বর্ণিত আছে।

তাঁর এই ভ্রমনকালে কোন এক পর্যায়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। হযরত মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ করার উদ্দেশ্যে তুরস্ক চলে যান। তুরস্কের

সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিশ্ব মুসলিমের পক্ষে তার সমর্থন প্রকাশ করেন। এখানেই সেনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তলোয়ার চালানো, লাঠি চালানো, মল্ল যুদ্ধ, কারাতে ইত্যাদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন বলে অনুমান করা যায়। কারন এ শিক্ষাগুলো পরবর্তীতে তিনি মুরিদগণকে প্রদান করেছেন। হযরত তাঁর গুণ ও যোগ্যতার কারনে সেনাবাহিনীর ১ শত সদস্য বিশিষ্ট একটি সেনা দলের কমান্ডার নির্বাচিত হন। তাঁর চাল চলন ও সুউন্নত নীতি-নৈতিকতার জন্য সেখানে তাঁকে 'হালা দরবেশ' বলা হত। সেনাবাহিনীতে থাকা কালীন হযরত লক্ষ্য করলেন যে তুরস্কের সৈন্যরা মুসলমান হলেও নামায তো পড়েই না মদ পাণে তারা অভ্যস্ত। হযরতের মনে প্রশ্ন জাগে এ কোন জিহাদে যোগ দিলাম? এরা ত মুসলমান নামের কলঙ্ক। অনেক চিন্তা ভাবনা করে কোন সিদ্ধান্ত না নিতে পেরে তাঁর পরিচিত একজন বুজুর্গ মুফতি আবদুল্লাহ্ সাহেবের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাঁকে তার মনের অবস্থা ব্যক্ত করলেন এবং জানতে চাইলেন যে তিনি কি সত্যিই জিহাদে আছেন ? মুফতি আবদুল্লাহ্ উত্তরে বললেন, "মাওলানা সত্য কথা প্রকাশ করলে আমাদের উভয়ের গর্দান কাটা যাবে।" আরো বললেন, "দুই শুয়োর ঝগড়া লেগেছে এখানে কিসের জিহাদ করবে? সম্ভব হলে এখান থেকে পালাও।" হযরত গভীর চিন্তায় পড়লেন। সেনাবাহিনী হতে নিঃস্কৃতি পাওয়া খুব সহজ কাজ নয়। তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিলেন। এখান থেকে তিনি ইরাক রওয়ানা হলেন। পথে একটি পাহাড়ের উপর তুরস্কের সেনা ঘাটি ছিল। পাহাড়ের কাছাকাছি এসে দেখলেন সেনাঘাঁটি থেকে একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ঘোড়ায় চড়ে নিচের দিকে নেমে আসছেন। হযরতকে দেখে তিনি তাঁকে থামালেন, হযরতের পরিচয় ও গন্তব্য জানতে চাইলেন। হযরত যে একজন তুর্কি সেনাবাহিনীর সদস্য সে কথাটি গোপন রেখে নিজেকে মুসাফির হিসেবে পরিচয় দিলেন। আলাপ আলোচনার পর ঘোড়সাওয়ার তাকে বললেন এ রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না। প্রহরী যখন তোমাকে বাধা দিবে তখন আমার নাম বলবে। আমার নাম মোস্তাফা আফেন্দি। এ বলে ঘোড়সাওয়ার চলে গেল। হযরত যখন ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছলেন প্রহরী তাঁকে বাঁধা দিয়ে বলল, "এ দিক দিয়ে যাওয়ার কোন অনুমতি নেই।" হযরত বললেন, "মোস্তাফা আফেন্দি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।" প্রহরী তখন তাঁকে ছেড়ে দিল। কিন্তু উপরে যখন সৈনিকদের সাথে দেখা হলো তারা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলো। হযরত পরিচয় দিয়ে বললেন, "মোস্তাফা আফেন্দি আমাকে এ দিক দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।" তখন তারা হযরতকে যত্ন করে ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে বসাল। হযরতের বিদেশ সফর নিয়ে তারা অনেক কিছু জানতে চাইলো। তারা হযরতকে জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি এত দেশে ঘুরছো, তুমি কয়টা ভাষা জানো?" হযরত

বললেন, "আমি পাঁচটা ভাষা জানি।" এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চুপ হয়ে হযরতের দিকে তাকিয়ে রইল। হযরত বুঝলেন তিনি ভুল করে ফেলেছেন। হযরত ছিলেন সুঠাম দেহি একজন যুবক। সংসার ধর্ম না করে দেশ বিদেশে ভ্রমনে নেমেছেন এটা তারা সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। হযরত বুঝলেন তারা তাকে গুপ্তচর মনে করছে। তাই এখানে বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয় মনে করে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ের অপর পাশ দিয়ে নিচে নামার পর পরই তাকে বন্দী করা হলো। হযরতকে তারা বন্দীখানায় নিয়ে রাখল। এ বন্দীখানাটি ছিল এক জনমানবহীন এলাকায়। অন্যান্য বন্দীদের নিকট জানতে পারলেন এখানে প্রায়ই দুই একজন বন্দীকে নিয়ে আসা হয় এবং এর মধ্যে থেকে অনেককেই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। এ কথা জানার পর হযরত সকল বন্দীদেরকে একত্র করলেন তিনি তাদেরকে বললেন, "আমাদের কার উপর কি মুসিবত আসে আমরা কেউ জানি না তবে আমরা সবাই বন্দী। বিপদ মুক্তির জন্য দোয়া ইউনুছ খতম পড়া হয়। চলুন আমরা সবাই একত্রে দোয়া ইউনুছ পড়ি।" এখানে একটি বিষয় হযরত লক্ষ্য করলেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হাত পায়ে শিকল দিয়ে বাঁধা একজন বন্দিকে এনে তার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখত। পরদিন সকালে আবার তাকে নিয়ে যেত। হযরতের সন্দেহ হলো এই লোকটি সত্যিকারের বন্দী নয়। তাকে কেন প্রতিদিন আনা হয় তা জানতে হবে। তাই তিনি বন্দী লোকটির সাথে আস্তে আস্তে সম্পর্ক গড়ে নিলেন। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ভাই আপনার এই অবস্থা কেন? আপনাকে প্রতিদিন এভাবে আনে আবার নিয়ে যায়। লোকটি মুচকি হেসে বলল, "মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামীদেরকে এই হাজতখানায় আনা হয়। এরপর আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করা হয় যে তারা সত্যিকারের অপরাধী কিনা। বন্দীদের আলাপ আলোচনা থেকে সত্যিকারের অপরাধীকে সনাক্ত করা যায়।" হযরত জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আমার মধ্যে এমন কিছু পেয়েছেন কিনা?" লোকটি উত্তর করল, "তুমি সহ আরো দুই তিনজন খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পাবে।" কয়েকদিন পর হযরত সহ আরো দুইজনকে মুক্তি দেওয়া হলো। তাদের মুক্তির ফরমান সহ দুইজন সিপাহীকে দায়িত্ব দিয়ে বলা হলো তাদের যেন তুরস্ক সীমানা পার করে দেওয়া হয়। দুইদিন পায়ে চলার পর একজন সিপাহী বিরক্ত হয়ে গেল। সে অন্যজনকে বললো ভাই তুমি তাদেরকে নিয়ে যাও আমি আর পারছি না। অন্যজন বললো আমি কেন একা দায়িত্ব নিব। এভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে মুক্তির ফরমান বন্দীদের হাতে তুলে দিয়ে দুজনেই বলল, "যে দিকে পারো চলে যাও আমরা তোমাদেরকে নিতে পারবো না।" এ বলে সিপাহী দুইজন ফিরে গেল। হযরত তখন সঙ্গীদের নিয়ে ইরাকের দিকে রওয়ানা হলেন। হযরত ইরাকের মসুল শহরে গিয়ে অবস্থান নিলেন। এখানে তিনি একটি মজিদের

ইমামতির দায়িত্ব পেলেন। মছুল থাকা কালীন হযরতের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানেই 'সাবআ আহরুফ' বা সাত ক্বেরাতের 'শায়খুল ক্বোররাহ্' সনদ অর্জন করেন।

একদিন মাগরিবের নামাজের পর হযরত কেবলাহ লক্ষ্য করলেন একজন লোক জামাতে নামায পড়ার পর আবার মাগরিবের ফরয নামায পড়ছেন। হযরত কিছুটা আশ্চর্য হয়ে বাকি নামাযের পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই আপনি তো জামাতে নামায পড়েছেন, তারপর কেন আবার ফরয নামায পড়লেন?" লোকটি কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন এবং এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত তাঁকে বার বার অনুরোধ করতে থাকলে তিনি বললেন, "ভাই আমি একজন কোরআনে হাফেজ এবং শায়খুল ক্বোররা। তেলাওয়াতে সামান্য ত্রুটি থাকলে আমার নামায হবে না। তুমি নামাযে সূরা লাহাবে একটু ভুল করেছো। 'ওয়ামরাআতু' এর স্থলে 'ওয়াআমরাআতু' পড়েছ। তাই আমি নামায পূনরায় আদায় করছি।" যেহেতু তিনি হাফেজ এবং শায়খুল ক্বোররাহ তাই হযরত তখন হাফেজ সাহেবকে অনুরোধ করলেন যেন তাঁকে কোরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেন। হাফেজ সাহেব বললেন যে তাঁর সময় হবে না তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত। হযরত বার বার তাঁকে অনুরোধ করার ফলে হযরতের আগ্রহ দেখে তিনি বললেন, "আমি পড়াতে পারবো যদি ফজরের আগে সময় নিয়ে আমার খানেকায় আসতে পারো।" হযরত তাতে রাজি হয়ে গেলেন। হাফেজ সাহেবের খানকা হযরতের মসজিদ থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে ছিল। তিনি নিয়মিত শেষ রাতে হাফেজ সাহেবের খানকায় গিয়ে কোরআন শিক্ষা গ্রহণ করতে লাগলেন। এ সময় হযরত কেবলাহ(রাঃ) হাফেজ সাহেবের খানকায় যেয়ে শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তাঁর জন্য অজুর পানির ব্যবস্থা করতেন শীতকালে পানি গরম করা ও অন্যান্য সেবা মূলক কাজ গুলো করতেন। হযরত কেবলাহর একদিন খেয়াল হলো শেষ রাতে হয়তোবা হাফেজ সাহেবের ক্ষুধা লাগে তাই তিনি প্রতিদিন হাফেজ সাহেবের জন্য কিছু পরিমান খেজুর, কিসমিস, পেস্তা বাদাম, কাজু বাদাম কিংবা আখরোট ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। একদিন হাফেজ সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাওলানা এগুলো আনার দরকার কি? তুমি এগুলো কেন আন?" হযরত কেবলাহ বললেন, "হযরত শেষ রাতে তো একটু ক্ষুধা লাগে তাই এই হাদিয়া পেশ করি।

হযরত কেবলাহ একদিন হাফেজ সাহেবকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন। কোন একটি তরকারির স্বাদ ভাল হলেও সেটি ঝাল হয়ে গিয়েছিল। তা খাওয়ার পর হাফেজ সাহেব ঝাল খেয়ে অভ্যস্ত ছিলেননা তাই ঝাল খাওয়ার পর হাফেজ সাহেবের চোখ দিয়ে পানি পড়ছিল। যেহেতু ঝালের কারনে হাফেজ সাহেবের কষ্ট হয়েছে তাই হযরত কেবলাহ হাফেজ সাহেবকে আরেক দিন দাওয়াত দিয়ে ঝাল

ছাড়া তরকারি রান্না করলেন। হাফেজ সাহেব খাওয়ার পর মজা করে বললেন, "মাওলানা তোমার সেদিনকার তরকারির ঐ জিনিসটা কোথায় যেটা খেলে চোখ দিয়ে পানি পড়ে ?"

যা হোক এক বছর অতিক্রম হলে হাফেজ সাহেব বললেন, "তোমার ক্বেরাত শিক্ষা শুদ্ধ হয়েছে তুমি এখন পড়া শেষ করতে পার।" হযরত তখন তাকে সনদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। হাফেজ সাহেব বললেন, "সনদ পেতে হলে মোট তিন বছর পড়তে হবে।" হযরত তাতে রাজি হয়ে গেলেন। এখানে উল্লেখ্য প্রতিদিন শেষরাতে এক মাইল রাস্তা যাওয়া এবং হাফেজ সাহেরেব অযুর পানির ব্যবস্থা করা ও শীত কালে পানি গরম করে দেওয়া এবং পড়া ইত্যাদি কাজ শেষ করে নিয়মিত ফযরের আগে ফিরে আসা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। বিশেষকরে শীতের রাতে যখন বৃষ্টি হতো। এই অঞ্চলে প্রায়ই শীত কালে বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়। কিন্তু এই কষ্ট স্বীকার করার মূল কারণ ছিলো সাবআ আহরুফ বা সাত ক্বেরাতে 'শায়খুল ক্বোররা' সনদ লাভ করা। কোরআন শরীফ তিলাওয়াতে সাত ধরনের কিরাতে যারা বুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁদেরকে 'শায়খ-উল-ক্বোররা' বলা হয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবা (রাঃ) গণ তাঁদের থেকে তাবেঈন ও তাবেঈন গণ তাঁদের থেকে পরবর্তীগণ এই শিক্ষা লাভ করেছেন। তরীক্বতের খেলাফতের শিজরার ন্যায় 'শায়খুল ক্বোররা' সনদেও হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে সর্বশেষ শিক্ষার্থী পর্যন্ত নামের শাজরা বা পরম্পরা উল্লেখ থাকে। শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর হৃদয়ের একান্ত কামনা ছিল যে এই বরকতময় শিজরায় তাঁর নামটিও অন্তর্ভুক্ত থাকুক। তাই তিনি রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি সকল প্রকার কষ্টকে তুচ্ছ করে তিন বছর বিরতিহীন কঠোর পরিশ্রম করেছেন। হযরতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেমের এটি আর একটি দৃষ্টান্ত। খুব কম সংখ্যক লোকই সাবআ আহরুফ বা সাত ক্বেরাতে 'শায়খুল ক্বোররা' হতে পারেন। কারণ আল্লাহ সোবহানু তা'য়ালার বিশেষ ফজল প্রাপ্ত মেধা না থাকলে তা অর্জন করা যায় না। এই বরকতময় শিজরা লাভের পর এই মহান সুফি প্রবর ইহলৌকিক কোন কাজেই কখনো এ সনদ ব্যবহার করেননি।

মসুলে থাকাকালীন হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) নামে একজন প্রখ্যাত অলি আল্লাহর সন্ধান লাভ করেন। তিনি প্রায়ই সেই অলি আল্লাহর দরবারে যেতেন। তরীক্বত ও মারফতের বহু গোপন এলেম তাঁর কাছ থেকেও তিনি পেয়েছিলেন। হযরত কেবলাহ পরে জানতে পারলেন শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) ইরাকের কুতুব।

মসুলে তিন বছর থাকার পর শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বাগদাদে আসার খেয়াল করছিলেন। একদিন হযরত শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) হযরতকে বললেন তুমি ইরাক ছেড়ে যেওনা তোমাকে ইরাকের কুতুবীয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এটা শুনে হযরত অত্যন্ত চিন্তায় পড়লেন কারণ বেলায়েতের রাস্তায় কোন কিছু হাসিল করতে হলে এবং কোন দায়িত্ব পেতে হলে সেটা পীরের মাধ্যমেই হওয়ার কথা। তাই তিনি কি জবাব দিবেন বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর পীর শাহ্ আব্দুল্লাহ্ ক্বাদেরী গাজীপুরীকে স্মরণ করে চিন্তা করতে লাগলেন কি করা যায়। এর মধ্যে তাঁর পীরকে স্বপ্নে দেখলেন, পীর সাহেব বললেন,"বেটা তোমার জন্য অনেক বড় কিছু রয়েছে সুতরাং তুমি এই প্রস্তাবে রাজি হয়ো না তুমি দেশে ফিরে আসো।" হযরত তখন শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) কে জানালেন কুতুবীয়তের দায়িত্ব গ্রহনে তাঁর অপারগতা রয়েছে। শাহ্ আব্দুল মজিদ (রা:) যে এতে মনক্ষুন্ন হয়েছেন তা হযরত পরিষ্কার ভাবে বুঝলেন। কিন্তু তিনি পীরের নির্দেশ অমান্য করে শাহ্ সাহেবকে খুশি করতে পারলেন না। পরদিনই দেখা গেল হযরতের গালে একটি ফোঁড়া উঠেছে এবং এটা দ্রুত বড় হতে লাগল। দু একদিনে ফোড়াটি বেশ বড় হয়ে পেকে গেল। ফোঁড়ার ব্যথায় হযরত রাতে ঘুমাতে পারছিলেন না। তাই তিনি হযরত শাহ্ আব্দুল মজিদ সাহেবের নিকট গিয়ে বললেন, "হুজুর আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি।" এ কথা শুনে হযরত শাহ্ আব্দুল মজিদের মনটা নরম হলো এবং তিনি বললেন, "তুমি তোয়াহার (রাঃ) নিকট যাও।" তোয়াহার (রাঃ) ঠিকানা তিনি বলে দিলেন। হযরত তোয়াহার (রাঃ) বাসস্থান শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর মসজিদ থেকে প্রায় ১.৫/২ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আসরের নামায পড়ে তিনি হযরত তোয়াহা (রাঃ) কে তালাশ করতে বের হয়ে গেলেন। হযরত তোয়াহা (রাঃ) এঁর বাসস্থানে গিয়ে তাঁর খোঁজ করলে একজন দেখিয়ে দিলেন। সে সময় হযরত তোয়াহা (রাঃ) ঘোড়ার ঘাস ধুইতেছিলেন। হযরত তাঁর কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, "শাহ্ আব্দুল মজিদ আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন"। হযরত তোয়াহা (রাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝতে পেরেছি শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) তোমাকে থাপ্পড় মেরেছে, অপেক্ষা করো আমি ওযু করে আসছি।" হযরত তোয়াহা (রাঃ) ওযু করে এসে শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) কে দোয়া পড়ে ফু দিয়ে দিলেন এবং চলে যেতে বললেন। ফিরে আসার সময় তিনি দ্রুত হাঁটছিলেন যাতে মাগরিবের আগে মসজিদে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। দ্রুত হাঁটার কারনে গালের ফোঁড়াটি ঝাকুনি খাচ্ছিলো। এতে হযরতের প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু ইমামতির দায়িত্ব পালনের খেয়ালে এই কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছিলেন। যাই হোক সময় মতো মসজিদে গিয়ে মাগরিবের নামায পড়ালেন। শরীরে প্রচন্ড জ্বর, গালে প্রচন্ড ব্যথা। এশার নামায বাকি রয়েছে, তাই শুতে পারছেন না। এশার নামাযের সময় হলে

আযান দিয়ে নামায আদায় করলেন। হযরতের একটি ওভারকোট ছিল। নামাযের পর ওভারকোটটি গায়ে দিয়ে মাথা সহ ঢেকে শুয়ে পড়লেন। শেষরাতে ঘুম ভাঙ্গলে অনুভব করলেন যে তার গালটি হালকা হালকা লাগছে। হাত দিয়ে বুঝলেন ফোঁড়াটি ফেটে গেছে। পুঁজ বের হয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পিঠের নিচে চলে গেছে। হযরত তাড়াতাড়ি ওঠে দেখলেন সুবিহ সাদিকের সময় হয়ে এসেছে। তিনি দ্রুত গা ধুয়ে নিলেন ওভারকোট ধুয়ে নিলেন এবং অযু করে আযান দিয়ে নামায আদায় করলেন। এরপর ভ্রমনের সকল কিছু গুছিয়ে বেঁধে পিঠে নিলেন। এখান থেকে সোজা হযরত শাহ্ আব্দুল মজিদ (রাঃ) এঁর খানকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। শাহ্ আব্দুল মজিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সাথেই সাথেই সালাম দিয়ে বললেন, "আমি গাউসে পাকের দরবারে যাবো।" শাহ্ সাহেব বললেন, "বড় বাবার নাম নিয়েছো, ঠিক আছে যাও।" তিনি দোয়া করে দিলেন।

বাগদাদ মসুল থেকে অনেক দুর। যাত্রাপথে সঙ্গী না থাকলে নানা বিপদের সম্ভাবনা থাকে। তাই বাগদাদগামী কাফেলার খোঁজ নিয়ে একটি কাফেলার সন্ধান পেলেন। সেই কাফেলার সঙ্গে তিনি বাগদাদে রওয়ানা হলেন। তাঁর পথ চলার জন্য একটি গাধা সংগ্রহ করেছিলেন। পথে মরুভূমিতে একদিন তাঁর বাহক গাধাটি চোরাবালিতে দেবে গেল। সঙ্গীরা অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু গাধাটি কোন অবস্থাতেই তুলতে পারলো না। তখন তারা হযরতকে বলল ভাই তোমার জন্য আমরা সবাই বিপদে পড়ে যাবো। সূর্য ডোবার আর বেশি বাকী নাই। তাই আমাদেরকে দ্রুত রাত্রি যাপনের একটি জায়গা তালাশ করে নিতে হবে। ইত্যাদি বলে চলে গেল। হযরত তখন গাউসে পাক (রাঃ) এঁর স্মরণে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন এবং ফরিয়াদ করলেন, "আল মাদাদ ইয়া গাউসে পাক (রাঃ)। হে গাউসে পাক (রাঃ) আমি আপনার দরবারেই আসছি। আমার এই বিপদ হতে আমাকে উদ্ধার করুন।" একটু পড়েই দেখলেন দূরে একজন ঘোড়সওয়ার খুব দ্রুত এগিয়ে আসছেন। কাছাকাছি আসলে দেখলেন একজন সাদা দাড়িওয়ালা, সাদা কাপড়ে আবৃত সুন্দর বয়স্ক লোক। ঘোড়াটি এসে গাধাটির পাশে দাঁড়ালে ঘোড়সাওয়ার কোন কথা না বলে ঘোড়ার পিঠ থেকেই হাত বাড়িয়ে গাধাটির কোমর ধরে টান দিয়ে উঠিয়ে দূরে ফেলে দিলেন এবং দ্রুত চলে গেলেন। হযরতের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে এই মহান ব্যাক্তিত্ব গাউসে পাক (রাঃ) ছাড়া আর কেউই হতে পারেন না।

বাগদাদ শরীফ পৌঁছার পর হযরত শাহ্ সূফী আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) হযরত গাউসে পাক (রাঃ) এঁর দরবারে যান সেখানে তিনি এবাদত ও রিয়াজতে মগ্ন হয়ে পড়েন। বাগদাদ তখন ব্রিটিশ এর অধিনে ছিল। বাগদাদ থাকাকালীন হযরত একদিন ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী হলেন।

হযরতকে তারা বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের ভুল তারা বুঝতে পারল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ কৃপায় তাঁকে তারা মুক্তি দিল এবং সরকারী খরচে তাকে মুম্বাই পর্যন্ত পাঠানোর ব্যবস্থা করল।

হরযতের সফর কালের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

হযরত ১০ বৎসর কাল (মতভেদে ৭ বৎসর) ভ্রমনের সময় তাঁর জীবনে কত ধরনের ঘটনা যে ঘটেছে তার কতটুকুই বা আমরা জানি। কথা প্রসঙ্গে হুজুর যতটুকু বলেছেন আমরা ততটুকু জানতে পেরেছি। বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে আমরা যা জানতে পেরেছি তা দীর্ঘ সময়ের ঘটনাবলির মধ্যে অতি সামান্যই বটে। তবুও পাঠকের জানার জন্য নিম্নোক্ত ঘটনাবলি উল্লেখ করা হল-

হযরত খাজা খিজির (আঃ) এঁর সাথে সাক্ষাতঃ

একবার হযরত দুইজন সঙ্গি সহ লোহিত সাগরের পাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাধারণতঃ ফযরের নামায পড়ে তিনি যাত্রা শুরু করতেন। ঐ দিন চলতে চলতে দুপুর হয়ে গেল। সঙ্গিরা সহ তিনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথাও কোন বস্তি বা সরাইখানা নজরে পড়ল না। একজন বললেন ভাই খুব ক্ষুধা পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে খাওয়ার মত আছে শুধু রুটি। হযরত বললেন, "পানির রাজত্বে আছেন খিজির (আঃ)। তিনি ইচ্ছা করলেতো আমাদেরকে মাছ খাওয়াতে পারেন।" এ কথা বলার কয়েক মিনিট পর একজন সুন্দর বয়স্ক লোক কোন একদিক থেকে এসে কাফেলায় যোগ দিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে বলতে চলতে লাগলেন। এক সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই তোমাদের কাছে কি কিছু খাবার আছে?" একজন উত্তর করলেন, "ভাই আমাদের কাছে শুধু রুটি আছে। রুটির সাথে খাবার মতো কিছু নেই।" বৃদ্ধ বললেন, "ভালোই হলো আমার কাছে মাছ আছে। চলো মাছ দিয়ে রুটি খাওয়া যাবে।" তখন সবাই একটি বালির ডিবির কাছে চাদর বিছিয়ে বসলেন। বৃদ্ধ তার পুটলি থেকে গরম গরম ভুনা মাছ বের করলেন। হযরত গরম ভুনা মাছ দেখে একটু আশ্চর্য হলেন। এই মরুভূমিতে বৃদ্ধ এই গরম গরম মাছ কোথায় পেল। তখন হযরতের স্মরণ হল যে একটু আগে তিনি মাছের জন্য খিজির (আঃ) এর কথা বলেছিলেন। তাই হযরত বুঝে গেলেন ইনি হযরত খিজির (আঃ) ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। যাই হোক খাওয়া দাওয়ার পর বৃদ্ধ লোকটি বললেন, "ভাই তোমাদের পানির কেটলিটা একটু দাও। আমি এস্তেঞ্জায় যাবো।" এই বলে তিনি কেটলি হাতে বালির ঢিবির অপর প্রান্তে গেলেন। হযরত সঙ্গীদেরকে বললেন বৃদ্ধ কোন দিকে যায় খেয়াল রাখবে। অনেক সময় পার হয়ে গেলেও বৃদ্ধ যখন ফিরে আসলো না, তখন তারা ঢিবির অপর

পাশে গিয়ে দেখলেন কেটলিটি পড়ে আছে কিন্তু বৃদ্ধ কোথাও নাই। কেটলির আশে পাশে পানি ব্যবহারের কোন চিহ্নও নাই। হযরত তখন সঙ্গীদেরকে বললেন, "তোমরা কি বুঝতে পেরেছো এ বৃদ্ধ কে ছিলেন? আমরা একটু আগে খিজির (আঃ) এঁর কথা আলোচনা করেছি, তিনি খিজির (আঃ) ই ছিলেন।" হযরতের একটি কাসিদার এক জায়গায় হযরত খিজির (আঃ) সাথে কোন এক সময়ে কথোপকথন এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন-

"ম্যায়ঁনে জব খিজর সে পুছা
ওয়াজহে বাকা তেরী হায় কেয়া
কান মেঁ ঝুককে ইউঁ কাহা
সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন।"

কবরের ভিতরে আশ্রয়:

একদিন হযরত একাকী মরুভূমির উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সকাল থেকে চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল কিন্তু রাত কাটাবার মতো কোথাও আশ্রয় পেলেন না। রাত গভীর হতে লাগল। মরুভূমির বাতাস ঠান্ডা হতে লাগল (মরুভূমিতে রাতের বেলায় প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ে)। হযরত শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি কবরস্থান নজরে পড়ল। হযরত ভাবলেন কবরস্থানে পাকা কবরের পাশে শুয়ে থাকলে ঠান্ডা বাতাস কম লাগবে। তাই তিনি কবরস্থানে ঢুকে পড়লেন। সুবিধা মতো জায়গা খুজতে গিয়ে হঠাৎ একটি ভাঙ্গা কবর নজরে পড়ল। হযরতের খেয়াল হলো কবরের ভিতরে নিশ্চয়ই ঠান্ডা আরো কম হবে। তাই তিনি কবরে ঢুকে পড়লেন। কবরে ঢুকেই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে কবরের ভিতর একজন লোক বসে আছে। হযরত তাঁকে তিনি কে জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি উত্তর দিলেন, "আমি এই কবরের মালিক, তুমি এখানে আসবে আমি জানতাম, আমি বহু বৎসর যাবৎ তোমার অপেক্ষায় আছি।" কবরের মালিক হযরতের সাথে সারারাত্র আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু কি আলোচনা হয়েছে তা হযরত কিছুই প্রকাশ করেন নি। শুধু এটুকু বলেছেন যে, আমার ঐ রাতের আলোচনায় পরকালের বিষয়ে অনেক রহস্য উন্মোচন হয়েছে যা আমার জ্ঞানকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। রাত শেষ হয়ে আসলে হযরত কবরের মালিক থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে আসলেন।

ঘোড়ার আস্তাবলে আশ্রয়:

হযরত একদিন একজন সঙ্গীসহ ভোরবেলায় বের হলেন। সারাদিন চলার পর কোথাও কোন আশ্রয় পেলেন না। সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। রাত বাড়তে লাগল, তারা দুজনেই শীতে কাবু হতে লাগলেন। এক সময়ে একটি বড় ধরনের বাড়ি নজরে পড়লো। বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে খেয়াল করলেন যে কোথাও আলো দেখা যাচ্ছে না। হযরত বুঝে নিলেন রাত গভীর হয়ে যাওয়ায় সবাই ঘুমিয়ে আছে। কাউকে

বিরক্ত না করে ঘোড়ার আস্তাবলে খড়ের মাঁচায় আশ্রয় নিলেন। এমন সময় আস্তাবল থেকে একটি ঘোড়া ছুটে গেল। এদিকে বাড়িওয়ালা ঘোড়ার আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন। ঘোড়াটিকে ধরে আস্তাবলে নিয়ে আসলেন। ঘোড়াটি বাঁধার পর তিনি চারদিকে দেখতে লাগলেন যে আস্তাবলে চোর ঢুকলো কিনা। হযরত এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, "তখন আমাদের মনের অবস্থা কি যে ছিল তা বর্ণনা করার মতো ভাষা নাই।" যাই হোক বাড়ি ওয়ালা আমাদেরকে দেখে ফেললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কারা?" জবাব দিলাম, "আমরা মুসাফির।" বাড়ি ওয়ালা আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমরা এখানে কেন? আমাকে ডাকলে না কেন?" আমরা জানালাম, আমরা কোথাও আশ্রয় না পেয়ে এখানে এসেছি। বাড়িতে কোন আলো নেই দেখে বুঝলাম সবাই ঘুমিয়ে আছে। তাই আপনাদের বিরক্ত না করে এখানেই আশ্রয় নিয়েছি।" বাড়িওয়ালা তখন বললো, "তোমরা নেমে ঘরে আসো।" এই বলে বাড়িওয়ালা ঘরে ঢুকে মেহমানদের জন্য হাত মুখ ধোয়ার পানির ব্যবস্থা করলেন। তারপর তাদের জন্য খাবার নিয়ে আসলেন খাওয়া দাওয়ার পর তাদেরকে শোয়ার জন্য বিছানা করে দিলেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা তার পেয়ারা বান্দাদেরকে কত ভাবেই না সাহায্য করে থাকেন।

মরুভূমিতে ঠান্ডা দইঃ

একদিন হযরত সকাল বেলা একাকী বের হলেন। চলতে চলতে প্রায় দুপুর হয়ে আসল। পানির পিপাসায় হযরত কাতর হয়ে পড়লেন। ভাগ্যক্রমে দূরে একটি বাড়ি নজরে পড়ল। ঐ বাড়িতে গিয়ে তিনি লোকজনকে ডাকাডাকি করলেন। কিছুক্ষণ পর একজন বয়স্ক মহিলা বের হয়ে আসলেন এবং বললো, "বাড়ির লোকজন কাজ-কর্মে বের হয়ে গেছে তুমি কি চাও?" হযরত বললেন, "আমার সঙ্গে খাবার পানি নাই। পিপাসায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। একটু পানি পান করাতে পারবেন?" বৃদ্ধা তখন হযরতকে ঘরে নিয়ে বসিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর হযরত ধারণা করলেন ঘরে হয়তো পানি নেই। তাই বৃদ্ধা পানি আনার জন্য দূরে কোথাও গিয়ে থাকতে পারে। যাই হোক অনেকক্ষণ পর বৃদ্ধা পানি এবং একটি দৈ এর পাতিল, বাটি চামিচ ইত্যাদি নিয়ে হাজির হলেন এবং হযরতকে দৈ পরিবেশন করলেন। দৈ বেশ ঠান্ডা ছিল। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "দৈ কি আপনার ঘরে ছিল?" বৃদ্ধা হ্যাঁ বললে হযরত বললেন, "তাহলে আমাকে এতক্ষণ কষ্ট দিলেন কেন? আপনিতো আরো আগেই আমাকে পানি ও দৈ খাওয়াতে পারতেন।" বৃদ্ধা বললেন, "পারতাম তবে এতে তোমার ক্ষতি হতো। কারণ তুমি প্রখর রোদ থেকে এসেছো। পিপসায় তোমার বুক শুকিয়ে আছে। এ অবস্থায় তোমাকে যদি ঠান্ডা দৈ খাওয়াতাম তাহলে তোমার প্রচন্ড ক্ষতি হতো, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়তে। তাই এই দেরিটুকু করলাম যাতে তোমার শরীর ঠান্ডা হয়ে

আসে। এখন ঠান্ডা দৈ খেলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।" হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এখানে ঠান্ডা দৈ কোথায় পেলেন?" বৃদ্ধা বললেন, "আমরা দৈ তৈরী করার পর পাতিলটাকে মাটির নিচে ডুবিয়ে রাখি তাতে দৈ আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে আসে।"

এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার কান্ডঃ

হযরত যথারীতি সকাল বেলা তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। সাধারণত: দুপুরের পর বা আসরের সময় যদি কোন আশ্রয় পেতেন তবে কোন রকম ঝুঁকি না নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম নিতেন। কারণ সন্ধ্যার আগে কোন আশ্রয় না পাওয়া গেলে এবং সন্ধ্যার পর আশ্রয় পেতে যদি দেরি হয় তবে মরুভুমিতে ঠান্ডায় কষ্ট হয়। তাছাড়া মরুচারি বেদুইন চোর-ডাকাতের ভয় থাকে। তিনি দুপুরের পর এক জায়গায় দেখলেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা তাদের বাড়ির সামনে বসে গল্প করছে। হযরত কাছে গিয়ে মুসাফির পরিচয় দিয়ে রাত্রি যাপনের জন্য আশ্রয় চাইলেন। তারা হযরতকে বসতে বললেন। হযরত তাদের থেকে একটু দূরে মাটিতে বসে পড়লেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধার চুল আঁচড়াতে ছিলেন, তেল লাগিয়ে দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন, হে আল্লাহ তুমি না জানি কত সুন্দর। তোমাকে পেলে তোমার চুলে তেল দিয়ে দিতাম, মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম।" ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে, সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বৃদ্ধ হঠাৎ হযরতকে লক্ষ্য করে বলল "রোহ রোহ" অর্থাৎ- ভাগো ভাগো। বৃদ্ধের হঠাৎ এই ব্যবহারে হযরত আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিন্তু করার কিছু নেই। বৃদ্ধকে কারণ জিজ্ঞাসা করার মতো পরিস্থিতি ছিল না। তাই ওখান থেকে উঠে আবার পথ চলতে আরম্ভ করেছিলেন। এ যাত্রায় কখন কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলেন তা আর জানা যায় নাই।

ইউসুফ (আঃ) কে জানার আগ্রহঃ

হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর সফরকালিন সময়ে একদিন রাতের জন্য একটি বাড়িতে আশ্রয় গ্রহন করেন। রাতের বেলা হযরত কেবলাহ অত্যন্ত সুমধুরভাবে নামাযে সূরা ইউসুফ থেকে তেলাওয়াত করলেন। বাড়ির সবাই তাঁর তেলাওয়াত শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সকাল বেলা বাড়ির অত্যন্ত বয়স্ক একজন মহিলা এসে হযরত কেবলাহকে বললেন," মাওলানা, তুমি আমাকে ইউসুফ (আঃ) এঁর কাহিনী শোনাও।" হযরত বললেন," আমি আপনাকে ইউসুফ (আঃ) এঁর কি কাহিনী শোনাবো?" বৃদ্ধা বললেন," তুমিতো রাতের বেলা নামাযের সুরায় ইউসুফ (আঃ) এঁর ঘটনা তেলাওয়াত করেছো সেখান থেকেই শোনাও।" হযরত তখন সুরা ইউসুফ তেলাওয়াত শুরু করলেন। বৃদ্ধা বললেন," না, তুমি রাতের বেলা যে ভাবে ক্বেরাত পড়েছ সে ভাবে ক্বেরাত পড়ো।" হযরত তখন আবার সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করে বৃদ্ধা কে ইউসুফ (আঃ) এঁর জীবন

কাহিনী কিছুটা শুনিয়ে দিলেন। হযরত সেখানে কয়েক দিন অবস্থান করে আবার সফর শুরু করেন।

হযরত কেবলার একটি স্বপ্নঃ

চাঁদপুর ডুমুরিয়া নিবাসি মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তুরস্ক থেকে পদব্রজে মসুল যাওয়ার সময় এক রাত্রে আশ্রয় নেয়ার মত কোন স্থান পেলেন না। এক পর্যায়ে একটি পাকা সমাধি দেখতে পেলেন। তাঁর ধারনা হল এটি কোন বুজুর্গের মাযার হবে। রাত কাটানোর জন্য তিনি ক্লান্ত দেহে সেখানেই আশ্রয় নিলেন। হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে দেখেন যে, একজন সুদর্শন ব্যক্তি হযরত কেবলাহ (রাঃ) কে সংগে করে নিয়ে একটি সুসজ্জিত প্রাসাদে বসালেন। তখন হযরত কেবলাহর সংগে ছিলেন ছাত্র জীবনে সহপাঠি জনাব মৌলভি মাহমুদ আলী সাহেব। সেখান থেকে সেই সুদর্শন ব্যক্তি তাঁদেরকে আরো সামনে নিয়ে গেলেন। তারা সেখানে দেখলেন সামনেই উজ্জ্বল নুর দ্বারা অধিকতর আলোকিত ও অধিকতর সুসজ্জিত সুন্দর একটি প্রাসাদ। হযরত কেবলাহ (রাঃ) ও সংগী মাহমুদ আলী সাহেব সেই প্রাসাদে প্রবেশ করবেন এমন সময় সেই সুদর্শন ব্যক্তি হযরতকে বললেন," আপনার সংগী (মাহমুদ আলী) আর আপনার সাথে যেতে পারবেনা, আপনি চলুন।" হযরত কেবলাহ (রাঃ) বললেন," আমি তাকে ছাড়া যেতে চাইনা।" এরপর তাঁরা উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করার পর যা যা দেখলেন এ প্রসঙ্গে হযরত কেবলাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন," ভিতরে প্রবেশ করে যা দেখলাম তা বর্ণনা করার মত ভাষা নাই।"

কুর্দিস্তানের ঘটনাঃ

হযরত কেবলাহ তাঁর সফরকালীন কোন এক সময়ে পদ ব্রজে কুর্দিস্তানের একটি এলাকায় পৌঁছেন। তাদের মাতৃভাষা হল কোরমানজি। আরবি ফারসি মিশ্রিত ভাষায়ও তারা কথা বলত। অপরিচিত জায়গা টাকা পয়সাও সাথে নেই। তিনি ক্ষুধার জ্বালায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। কোন ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারলেন না। কারো কাছ থেকে নিজের জন্য চেয়ে খাওয়ার মতো অবস্থাতেও তিনি নন। ক্ষুধাক্লিষ্ট দেহে একটি মসজিদে ঢুকলেন এবং তাঁর প্রিয়তম প্রভুর প্রতি দীর্ঘ সময় সেজদা রত রইলেন। এক সময় মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলেন মাথার কাছে একটি মুদ্রা পড়ে আছে। তিনি বুঝলেন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই এটি দেয়া হয়েছে। তা দিয়ে তিনি নিজের প্রয়োজন মেটালেন। কুর্দিস্তানের সেই মসজিদে তিনি কিছু দিন অবস্থান করেন। তাঁর ইলম আখলাক ও বুজুর্গীর পরিচয় পেয়ে পার্শ্ববর্তী একটি মাদ্রাসার কিছু ছাত্র তাঁর কাছে ইলম হাসিলের জন্য যাতায়াত শুরু

করল। তারা তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানেও যেত এবং তারাই বিভিন্ন সময়ে হযরতের খাবারের ব্যবস্থা করত। কিছু দিন পর তিনি সেখান থেকে মসুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরতের বিচক্ষনতা:

হযরত যখন মসুলে অবস্থান করছিলেন তখন সেখানে আশেক আহাম্মদ নামক এক পেশোয়ারীও ছিল। সে হযরতকে যথেষ্ট ভক্তি করতো। সে ব্রিটিশ বাহিনীর একজন গোলন্দাজ ছিল। বাগদাদের সীমান্তে তাকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। সীমান্তের অপর পাড়ে ছিল তুর্কি বাহিনী। কোন এক সময় সে কামানের গোড়ায় বসে কামানের গুলি নিক্ষেপ করার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। অপর পাশে তুর্কি মুছলিম বাহিনী সীমান্ত রক্ষার কাজে রত ছিল। তাদের সামনে কম্বল গায়ে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক পর্যায়ে কামানের গুলি ছোড়ার জন্য অফিসার কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে আশেক কামানের গুলি ছুড়লো। অপর দিকে কম্বলওয়ালা ব্যক্তি কামানের গোলাটি হাতে ধরে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিলেন। দ্বিতীয়বার গুলি ছোড়ার নির্দেশ হলো। আশেক গুলি ছুড়ল। কম্বলওয়ালা ব্যক্তি এবারো গোলাটি ধরে একপাশে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তৃতীয়বার গুলি ছোড়ার নির্দেশ হলো। এবারও কম্বলওয়ালা ব্যক্তি গোলাটি ধরে কম্বলের মধ্যে পেচিয়ে নিলেন। এ দৃশ্য দেখে আশেক তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কামানের গোড়ায় মাথা ফেলে পড়ে রইলো। হঠাৎ তার কাঁধে হাত দিয়ে কে যেন বললো, "আশেক উঠো। তুমি কি মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো? এটা কি ঠিক?" আশেক মাথা তুলে দেখল সেই কম্বলওয়ালা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তখন কম্বলওয়ালা ব্যক্তি বললেন, "তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো না।" এই বলে তিনি যেন কোথায় চলে গেলেন। আশেক চারদিকে তাকিয়ে দেখল তার অফিসারও আশে পাশে কোথাও নেই। সে সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে মসুল চলে আসল। এখানেই হযরতের সাথে তার দেখা হয়। হযরতের জ্ঞান-গুণ দেখে সে তাঁর ভক্ত হয়ে পড়ে।

হযরত যে মসজিদে নামায পড়াতেন সেখানে অবসর সময় নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করতেন। একদিন কোরআন তিলাওয়াত রত অবস্থায় দেখলেন আশেক তলোয়ার হাতে মসজিদে ঢুকলো এবং হযরতের সামনে এসে বসল। তার চেহারা রাগান্বিত ছিল। হযরত ভাবলেন যেকোন কারনেই হোক আশেক রাগান্বিত হয়ে আছে। তাকে শান্ত হওয়ার জন্য কোরআন তিলাওয়াত চালিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পর হযরত তিলাওয়াত বন্ধ করে আশেককে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার খবর কি?" আশেক পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "হযরত আপনি বলুন দেখি কালিমা না জানলে কি মুসলমান হওয়া যায় না?" হযরত অনুমান করলেন

কালিমা শরীফ নিয়ে কোন একটা গোলযোগ হয়েছে। তাই হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি কালিমা জানো?" আশেক বললো, "না"। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে?" সে বলল, "আল্লাহ্ তায়ালা।" তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, "আমাদের নবী কে?" সে বলল,"হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ।" হযরত বললেন, "তুমি কালিমা জানো না কেন বললা, এটাই তো কালিমা।" আশেকের চেহারা তখন স্বাভাবিক হাস্যোজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। তখন আশেক বললো," আপনার সাথে যেই বাঙ্গালি মাওলানা আছে সে আমাকে বলেছিল কালিমা না জানলে মুসলমান হওয়া যায় না। আমি তার গর্দান নিতাম কিন্তু আপনার কথা খেয়াল হলে ভাবলাম আগে আপনাকে কথাটি জিজ্ঞাসা করে নেই। আপনি সত্যিই বিচক্ষণ। না হলে সে মাওলানা আজকে আমার হাতে মারা যেত। হযরত তখন বললেন, "মাওলানা সঠিক কথাই বলেছে। কালিমা না জানলে মুসলমান হওয়া যায় না। তবে তুমি তো কালিমা জানো, তাই তোমার কোন সমস্যা নেই।" আশেক খুশি মনে ওঠে গেল। হযরত পরে মাওলানাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন কথাবার্তা বলতে যেন মানুষের মানসিক অবস্থা চিন্তা ভাবনা করে বলে, নতুবা ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। হযরতের এই দীর্ঘ সফরকালে কত ধরনের ঘটনা, কত ধরনের বিপদ, কত ধরনের কষ্ট হয়েছে তার কতটুকুই বা তিনি প্রকাশ করেছেন। তবে 'দরদে দিল' নামক গ্রন্থে তার লিখা কাব্য থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়।

যেমন, তিনি 'দরদে দিল' নামক কাব্য গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে যে সকল কথা লিখেছেন তা থেকে 'মদদ কুন ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)' শিরোনামের কাব্য থেকে কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

তব প্রেমে যেই দিন, মজিয়াছে এই মন
শোকে নিশি অবসান, করিছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
অসার সংসার মাঝে, সন্যাসীর বেশ সেজে
কত রাজ্য পদব্রজে, ভ্রমেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
কভু মুসলিম কারাগারে কভু কাফের যমাগারে
জিঞ্জির পায়েতে পরে, সয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
মরুভূমি বালু রাশি, মত্তহাল উপবাসি
কখনো শিবির বাসি, হয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
ফিরিয়াছি দ্বারে দ্বারে কখনও পর্ব্বত-শিরে,
লতা-পাতা অনাহারে খেয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।

তিনি এই কাব্যেরই অন্য এক জায়গায় লিখেছেন-

মরুভূমে বালুতাপে, কভু শীতে হিয়া কাঁপে,
কাঁটা শয্যায় অনুতাপে, শুয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।

হযরতের চিল্লাহ্ করার কতিপয় নমুনা

১ম চিল্লাহঃ হযরত শাহ্ ছুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রা:) যখন দিল্লির মোজাফ্ফরপুরে শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) এঁর খানকায় অবস্থান করছিলেন সেই সময় শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) তাঁকে চিল্লাহ করার নির্দেশ দেন। একদিন শাহ্ সাহেব হযরতকে বললেন," মাওলানা তুমি ৪০ দিনের চিল্লাহ করো। এই চিল্লার সময় খাওয়ার জন্য ১ সের ভাজা চনাবুট দিলেন। হযরত চিল্লাহর নির্দেশ পেয়ে চিল্লাহ আরম্ভ করলেন। চিল্লাহর শেষাংশে একদিন শাহ্ সাহেব হযরতকে ঘরের চাবি দিয়ে বললেন, "বাহিরে আমার কিছু জরুরী কাজ রয়েছে তাই আমি এখনই যাচ্ছি। আমি আসতে অনেক দেরী হতে পারে ঘরের খেয়াল রেখো।" উল্লেখ্য ঐ ঘরে হযরত এবং শাহ্ সাহেব ব্যতীত আর কেউ থাকতেন না। শাহ্ সাহেব বাহিরে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরে এক অপরূপ সুন্দরী মহিলা ঐ ঘরে ঢুকে হযরতকে ঘরের সকল প্রকার কাজ করে দেওয়ার অনুমতির জন্য অনুরোধের পর অনুরোধ করতে লাগল। হযরত মহিলার প্রতি প্রথম নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ভয়ের চাঁদরের নিচে লুকিয়ে ফেললেন। মহিলাকে অত্যন্ত কঠোরভাবে বললেন, "কিছুই লাগবেনা বের হয়ে যাও।" মহিলা তার উদ্দেশ্য সফলের কোন লক্ষণ না দেখে নীরবে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই শাহ্ সাহেব ফিরে এলেন এবং হযরতকে বললেন, "মাওলানা নামাযের ব্যবস্থা করো।" তিনি হযরতকে ইমামতি করার আদেশ দিলেন। ইতিপূর্বে শাহ্ সিদ্দিক (রাঃ) নিজেই ইমামতি করতেন। আজকে হযরতকে এই পরীক্ষা করার পর তাঁর পিছনে তিনি মুক্তাদি হলেন। হযরতের ৪০ দিনের চিল্লাহ শেষ হওয়ার পর শাহ্ সাহেবকে বললেন চিল্লার মধ্যে আমি যে চনাবুট খেয়েছি তার বাকি কিছু অংশ রয়ে গেছে। তিনি এটা শাহ্ সাহেবকে ফেরত দিলেন। ফেরৎ দেওয়া চনাবুটের পরিমাণ দেখে শাহ সাহেব বললেন "মাওলানা তোম এতনা খালিয়া।" হযরত তখন কিছুটা লজ্জিত হলেন এবং আরো শক্তভাবে চিল্লাহ করার ইরাদা করলেন।

দ্বিতীয় চিল্লাহঃ হযরত দেশে ফেরার পর চানপুরস্থ নাজির মসজিদের হুজরায় অবস্থান করতে থাকেন। এখানে তিনি কঠোর সাধনায় লিপ্ত হন। প্রথম চিল্লাহর পর শাহ সাহেবের মন্তব্যের কথা খেয়াল করে তিনি দ্বিতীয় চিল্লা আরম্ভ করলেন। তিনি ছোট একটি নারিকেলের মালা নিলেন। এই নারিকেলের মালার পরিমাণের চাউল নিয়ে তিনি দিনে একবার ভাত পাক করে খেতেন। তিনি মালাটিকে প্রতিদিন পাকার মধ্যে ঘষতেন যাতে এটা ছোট হয়। ৪০ দিনে দেখা গেল মালাটি ছোট একটি টেবিল চামচের আকার ধারণ করলো এভাবে তিনি দ্বিতীয় চিল্লাহ শেষ করলেন।

তৃতীয় চিল্লাহঃ হযরত তৃতীয় বারের চিল্লাহর নিয়ত করলেন। ৪০ দিনের এই তৃতীয় চিল্লাহতে তিনি দিনে একবার অতি সামান্য আহার করতেন। তার খাবার

ছিল কুড়িয়ে আনা কচু পাতা, কচুর ডোগা, ইত্যাদি তেল মসলা লবণ বিহীন সিদ্ধ করে খেতেন। সত্য দর্শনের সত্য সাধকগণের সাধনার তৃষ্ণা কি তাতেও মিটে? তাই তিনি কিছুদিন যেতে না যেতেই পরবর্তী চিল্লাহর মনস্থ করেন।

চতুর্থ চিল্লাহঃ এবার তিনি কচুর শাক লবন ও মসলা ছাড়া সিদ্ধ করে আর খাবেন না। খাবেন শুধু সিদ্ধ পানিটুকু সকাল বিকাল আহার হিসেবে চল্লিশ দিন। পরবর্তীতে তা খেয়েও ছিলেন।

পঞ্চম চিল্লাহঃ হযরতের জীবনের অন্যতম কঠিন সাধনা ছিল মাত্র ৭টি লং খেয়ে ৪০ দিনের চিল্লাহ করা। এ চিল্লাহ নাজির মসজিদেই করেছিলেন। প্রত্যক্ষ দর্শী মুরব্বিগণ বর্ণনা করেছেন। ৪০দিন চিল্লাহর পর হযরতের শরীরে হাড় চামড়া ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গায়ের রং সম্পূর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

হযরত নাজির মসজিদের এই হুজরায় কত যে কঠিন সাধনা করেছেন। তা সর্ব সাধারণের পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল। তবে এটুকু বুঝা যেত যে তিনি সারারাত্র এবাদত রেয়াজতে নিয়োজিত থাকতেন। হযরত যে উত্তরোত্তর আল্লাহর রাস্তায় উর্ধ্বগামী এক ব্যক্তিত্ব তা মানুষ অনুভব করতে পারছিল। এদিকে হযরত প্রায় দশ বৎসর পর দেশে ফিরাতে আত্মীয় অনাত্মীয় ভক্ত অনেকেই তার সাথে দেখা করতে আসতেন। এতে হযরতের এবাদতের বিঘ্ন ঘটতো। তাই লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এর জন্য আসর নামাজের সময় থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেন। অলি আল্লাহগণের বিশেষ স্বভাব হলো তারা এবাদত বিহীন সময় কাটাতেন না। তাই কেউ যেন তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে পারে সে জন্য তিনি হুজরার দরজা সবসময় বন্ধ রাখতেন। মসজিদের ইমামতির দায়িত্ব ছিল বিধায় নামাযের একামতের তিন চার মিনিট পূর্বে হুজরা থেকে বের হয়ে সোজা গিয়ে মেহরাবে বসতেন। ফরয নামায শেষ হলে সোজা হুজরায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন।

হযরত শায়খ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রায়ই সারারাত্র এক পায়ে দাঁড়িয়ে কোরআনুল কারিম তিলাওয়াত করতেন। যা আমরা সাইয়্যেদেনা হুজুর গাউসেপাক (রাঃ) এবং অন্যান্য জলিলুলকদর আরেফে রাব্বানীগণের জীবনে দেখতে পাই। কখনো কখনো তিনি গাছ বা খুঁটির সাথে নিজেকে বেঁধে নিয়ে এভাবেই ইবাদতে সারারাত্র কাটিয়ে দিতেন। কাঁটাবিলের জনাব মকবুল আহমদ মগফুর থেকে বর্ণিত যে, একদা কোন এক শীতের রাত্রিতে হযরত মুর্শীদ ক্বেবলাহ সালাত কায়েম করার সময়ে তাঁর বিছানার পাশে রেখে দেওয়া জলন্ত কয়লার পাত্র কোন কারণ বশত উল্টে যায়। এক পর্যায়ে জলন্ত কয়লায় বিছানা জ্বলতে জ্বলতে তাঁর শরীরে চামড়া স্পর্শ করে কিন্তু তিনি সালাতে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে সে সময়ে তাঁর বিন্দু মাত্র খেয়াল হয়নি যে তাঁর শরীর আগুন স্পর্শ করেছে।

চান্দপুর নাজির মসজিদ সংলগ্ন এই স্থানেই টিনের চাল দেওয়া হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর হুজরা খানাটি অবস্থিত ছিল ।

চান্দপুর নাজির মসজিদ সংলগ্ন হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর হুজরা খানাটির বর্তমান ছবি ।

চিল্লাহয় বসার নিয়ম-কানুন

চিল্লাহ এবাদতের এবং তরিকতের নেয়ামত লাভের একটি উত্তম পন্থা। কিন্তু চিল্লাহর প্রথা অনুযায়ী ৪০ দিন চিল্লাহ করা সাধারণ মানুষের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে চিল্লাহ করার লোক খুব একটা পাওয়া যেত না। তাই হযরত তার মুরীদদের সুবিধার জন্য যথাযথ কৃতপক্ষ হতে অনুমতি নিয়ে ৪০ দিনের চিল্লাহর পরিবর্তে ১১ দিনের চিল্লাহর প্রবর্তন করেন যেন মুরীদগণ চিল্লার নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। তিনি ১০ দিনের এতেকাফের সাথে ৫ দিন, ৩ দিন ও ২৪ ঘন্টার এতেকাফের ব্যবস্থাও জারি রাখেন।

দরবারে চিল্লাহ ও এতেকাফ পালনের বিষয়ে পূর্বে কিছু কথা বলা হয়েছে। চিল্লাহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিয়ম কানুন পালন অপরিহার্য। সপ্তাহের দুটি নির্দিষ্ট দিনে এবং সময়ে চিল্লাহ শুরু করা হতো এবং নির্দিষ্ট দিনে শেষ করা হতো। সপ্তাহের দুটি দিন হলো বৃহস্পতিবার ও রবিবার। সময় হলো আসরের জামাতে শরীক হওয়া। বৃহস্পতিবার যারা চিল্লাহ শুরু করবে তারা এগার দিন পর সোমবার বাদ ফজর মোনাজাতের মাধ্যমে চিল্লাহ শেষ করবে। আর যারা রবিবার বসবে তারা এগার দিন পর বৃহস্পতিবার বাদ ফজর মোনাজাতের মাধ্যমে চিল্লাহ শেষ করবে।

একবার কয়েকজন লোক চিল্লাহ করার জন্য হুজুর কেবলার নিকট অনুমতি নিল এবং দিনও ঠিক করা হলো। ঐ চিল্লাহতে শরীক হওয়ার জন্য হযরতের এক মাত্র ছোট ভাই জনাব আবদুল ওয়াহাবও হযরতের অনুমতি নিয়ে নিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে আসরের জামাতে সকলেই হাজির হলো কিন্তু জনাব আবদুল ওয়াহাব আসরের জামাত ধরতে পারেন নাই। রাজগঞ্জ বাজারে তাঁর একটি গেঞ্জির দোকান ছিল। দোকান বন্ধ করতে করতে তাঁর দেরী হয়ে গিয়েছিল। হযরত কেবলাহ তাঁকে ডেকে এনে দেরী হওয়ার কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন যে দোকান বন্ধ করতে তার দেরী হয়ে গিয়েছিল। হযরত কেবলাহ হাতের বেতটি দিয়ে তাঁকে দুবার আঘাত করলেন এবং বললেন, "তোর চিল্লাহ করার প্রয়োজন নাই, তুই গিয়ে গেঞ্জি বিক্রি কর।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে হুজুর কেবলাহ শৃংখলা ও মান্যতার প্রয়োজনে স্নেহের ছোট ভাইকেও এতটুকু ছাড় দেননি। একাধারে তিনি ছিলেন স্নেহ, মমতা, ভালবাসার অবিরাম ফল্গুধারা, ন্যায়-নীতি ও শৃংখলা বিধাণের ক্ষেত্রে ছিলেন আমিরুল মুমেনিন হযরত ওমর (রাঃ) এঁর আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

চিল্লাহ্ পালনকালে নির্দেশ পালনের কঠোরতা

শাহপুর দরবার শরীফে বছরের যে কোন সময়ে চিল্লাহ করা যেত। তবে হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ওরছ শরীফের আগে এগার দিন করে পর পর তিনটা চিল্লাহ করা হত। এই চিল্লাহর সময় চিল্লাহকারীদের দ্বারা ওরছের যাবতীয় কাজ যেমন- গাছ কাটা, লাকড়ি চিড়া, লাকড়ি শুকানো, বাঁশ কাটা, বাঁশের বেড়া তৈরী, মাজার শরীফের আশ- পাশ পরিষ্কার করা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করা হতো। এভাবে তিন চিল্লাহ করার সময় হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ওরছের সকল কাজের আঞ্জাম দেওয়া হতো। চিল্লাহকারীগণ আসরের নামাযের পর থেকে এশার নামায পর্যন্ত বিভিন্ন তসবীহ আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের নামায থেকে শুরু করে ফজরের নামায, ফরজবাদ ওযীফা ইত্যাদি আদায় করার পর সকালের নাস্তা খেয়ে ওরছের কাজে বের হয়ে পড়তেন। মসজিদে তাদের মালপত্র পাহাড়া দেওয়ার জন্য একজনকে নিযুক্ত করা হতো।

একবার এক চিল্লাহর সময় একজনকে মসজিদে পাহারায় রাখা হল। হযরত মোর্শেদ কেবলাহ তাকে তার কর্তব্য পালনের সময় একটি নির্দিষ্ট সীমানা ঠিক করে দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "কর্তব্য পালনকালীন সময়ে এই সীমানার বাহিরে যেওনা। এই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থেকেই তুমি জিকির-আযকার ইবাদত করবে।" কর্তব্য পালনের সময় সে দেখতে পেল মাওলানা সেরাজ আহম্মদ, মৌলভী আব্দুল মান্নান সহ আরো দুই তিনজন প্রবীণ পীর ভাই দরবার সীমানার দক্ষিণ দিক থেকে দরবারের সীমানার মধ্যে ঢুকতে ছিলেন। চিল্লাহ কারী সেই পাহারাদার তার প্রতি নির্দেশীত সীমনা পার হয়ে উক্ত পীরভাইদেরকে এস্তেকবাল করার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই মোর্শেদ কেবলাহ তাকে খবর দিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে দেখা করার জন্য বললেন। সে হাজির হলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাকে যে সীমানা নির্ধারন করে দেওয়া হয়েছিল তুমি কি তার বাহিরে গিয়েছিলে?" চিল্লাহকারী হুজুরকে জানালেন, "মাওলানা সেরাজ আহম্মদ সহ যারা দরবারে হাজির হয়েছিলেন তাদেরকে এস্তেকবাল করার জন্য সীমানা অতিক্রম করে গিয়েছিলাম। " হযরত কেবলাহ তাকে বললেন, "তুমি নির্দেশ অমান্য করেছো, তোমার চিল্লাহ করার প্রয়োজন নেই। তুমি এই মুহূর্তে তোমার মালপত্র নিয়ে বাড়ি চলে যাও।" উপরোক্ত ঘটনা থেকে এটা প্রতিয়মান যে মুরীদদের সকল কর্মকান্ড এবাদত ইত্যাদির প্রতি মোর্শেদ কেবলাহ অন্তরদৃষ্টির মাধ্যমে সার্বক্ষনিক ভাবে খেয়াল রাখতেন। এছাড়া এটাও বুঝা যায় যে চিল্লাহ, ইতেকাফ ইত্যাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক নেয়ামত বরকত পেতে হলে পীরের নির্দেশ যথাযথভাবে পালন আবশ্যক।

চিল্লাহকারীর জয্বা

হযরত মুর্শীদ কেবলাহ'র আমলে একবার চিল্লাহ শেষ হলে ফজরের নামাযের পর মুর্শীদ কেবলাহ চিল্লাহকারীদের নিয়ে মোনাজাত করছিলেন। এই চিল্লাহয় হাজীগঞ্জের কাজীরগাঁও নিবাসী শাহেদ আলী দরবেশও ছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরহেজগার ও এবাদতী লোক ছিলেন। এ জন্য তাকে সঙ্গী সাথীরা দরবেশ বলতেন। ঐ দিন মোনাজাতের এক পর্যায়ে শাহেদ আলী দরবেশের জযবা এসে গেল। তিনি মসজিদে গড়াগড়ি আরম্ভ করলেন এবং এক ধরনের আওয়াজ তার মুখ থেকে বের হতে লাগল। সঙ্গী চিল্লাহকারী দুই একজন তাকে ধরে রাখলেন। মুর্শীদ কেবলাহ মোনাজাত শেষ করে চলে গেলেন। একটু পর শাহেদ আলী দরবেশ স্বাভাবিক জ্ঞানে ফিরে আসলেন। দুই একজন চিল্লাহকারী তার এই জযবা আসা সমন্ধে জানতে চাইলো এবং বলল, "জযবা আসার মতো হুজুর কেবলাহ'র মোনাজাতে আমরা এমন কিছুতো শুনলাম না। আপনার কি কারনে এই অবস্থা হল।" জনাব শাহেদ আলী দরবেশ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। সঙ্গীরা বার বার অনুরোধ করার পর তিনি বললেন, "ভাই মোনাজাতের এক পর্যায়ে আমার একটু তন্দ্রা এসে গেল। তখন দেখলাম মজলিশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও গাউসেপাক (রাঃ) উপস্থিত আছেন। এক পর্যায়ে মুর্শীদ কেবলাহ একটি কাগজ নিয়ে পীরানে পীর দস্তগীর হযরত গাউসুল আজম (রাঃ) এঁর হাতে দিলেন। হযরত গাউছুল আজম (রাঃ) কাগজটি দেখে তাতে একটি সীল মারলেন। তারপর কাগজটি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর হাতে তুলে দিলেন। আমার কৌতূহল হচ্ছিল এটা কি জিনিস। উঁকি দিয়ে দেখলাম আমরা যারা চিল্লাহ করেছি তাঁদের সকলের নাম ঐ কাগজটিতে লিখা আছে। এটা দেখার পর আমার আর কোন হুঁশ ছিল না"।

উপরোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে হযরত মুর্শীদ কেবলাহ'র আমলে যারা চিল্লাহ করতেন তাদের চিল্লাহ কবুলের জন্য মুর্শীদ কেবলাহ বিশেষভাবে দোয়া করতেন।

হযরতের সামাজিক কর্মকাণ্ড

হযরত দেশে ফিরে আসার পর তাঁর নিজ গ্রাম চাঁদপুরের ঐতিহাসিক জামে মসজিদের (নাজির মসজিদ) হুজরাখানায় অবস্থান আরম্ভ করেন এবং কঠিন সাধনায় লিপ্ত হন। তাঁর সাধনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লোকজনকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণকর শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি সমাজের মধ্যবিত্ত ও নিম্নস্তরের লোকজনকে জীবিকা নির্বাহের জন্য সকল পেশা বা ব্যবসা অবলম্বন করার

নির্দেশ বা উপদেশ দিতেন। ঐ সময়ে মুসলমানগন অত্যন্ত গরীব ছিল। সমাজে কুসংস্কারের কারনে তাদের রোজগারের পথ অত্যন্ত সীমিত ছিল। লোকজনকে সকল প্রকার ব্যবসায়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য 'ব্যবসায়ে আম্বিয়া' নামক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। তাছাড়া তিনি গরীব মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য নিকট আত্মীয় ও ঘনিষ্ট মুরীদদেরকে তখনকার সমাজের দৃষ্টিতে ছোট ছোট ব্যবসায় লাগিয়ে দিতেন। যেমন- মাছ বিক্রি করা, পান বিক্রি করা, ধোপার কাজ করা, চুল কাটা, ইত্যাদি কাজ যা হিন্দুরাই একচেটিয়া ভাবে করত। হযরতের এই প্রচেষ্টার ফলে বৃহত্তর কুমিল্লার বহু গরীব মুসলিম পরিবার এ সকল কাজ করতে শুরু করে। ফলে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতাও আসতে থাকে। এতে কু-সংস্কার বিশ্বাসী তথাকথিত বনেদি মুসলমানদের অনেকেই এই গরীব মুসলমানদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক কমিয়ে আনতে থাকে।

কচুয়ার কোন এক অঞ্চলে স্বচ্ছল ও তথাকথিত বনেদি পরিবারগুলি গরীব মুসলমান যারা উপরোক্ত ব্যবসায় জড়িত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সামাজিকভাবে এক ঘরে করে ফেলল। এই গরীব গোষ্ঠী উপায়ন্তর না দেখে তাদের পীর হযরত শাহ সুফি আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর নিকট তাদের উদ্ভুত সমস্যার কথা জানালো। হযরত কচুয়া এলাকায় সবাইকে নিয়ে একটি সভার ব্যবস্থা করার জন্য বনেদিদের নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মতো একটি সভার আয়োজন করা হল। সভাস্থলে বনেদিরা নিজেদের জন্য আলাদা স্থান ঠিক করল এবং এক ঘরেদের জন্য আলাদা স্থান ঠিক করল। হযরত নির্দিষ্ট দিনে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখলেন এক ঘরে ও বনেদিদের বসার ব্যবস্থা আলাদা আলাদা করা হয়েছে। তিনি সোজা গিয়ে এক ঘরেদের স্থানে বসলেন এবং বললেন আমি এদের সাথে আছি। বনেদিরা তখন খুব লজ্জিত হয়ে বললেন হুজুর আমরা ভূল করেছি। হযরত তখন তাদেরকে বললেন, "ব্যবসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও নবী (আঃ)গণের সুন্নত।" তিনি ব্যবসার উপকারিতা সমন্ধে তাদেরকে বুঝালেন। তিনি আরো বললেন, "ব্যবসা সুন্নতের নিয়তে করলে অনেক সওয়াব হাসিল হয়।" এভাবে গরীব মুসলমানদেরকে উৎসাহ প্রদান করে তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনে সাহায্য করেন।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এরপর ধীরে ধীরে দিল্লীর শাসন সহ এ উপমহাদেশের প্রায় সকল অঞ্চল ইংরেজদের দখলে চলে যায়। এদিকে সচেতন ও স্বাধীনচেতা জনগণ স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য আস্তে আস্তে সংগঠিত হতে থাকে। এ কারনে উপমহাদেশের হাজার হাজার লোক জেল খেটেছে, অনেকে ফাঁসিতে ঝুলেছে, অনেকে দিপান্তর হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতাকামীরা থেমেছিল না। তাদের এই

আন্দোলন প্রকাশ্যে ও গোপনে বিভিন্নভাবে চলছিলো। হযরত নিজেও একজন স্বাধীনতাকামী ছিলেন যে কারণে মুসলমানদের স্বাধীন করার নিয়তে তুরস্ক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন।

হযরত শাহ্ সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) দেশে ফিরার পর লক্ষ্য করলেন ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন যথেষ্ট জোরদার হয়েছে যা উপমহাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অবস্থা সামলানোর জন্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে দূর্বল করার জন্য ইংরেজরা কু- মন্ত্রনা ও চংক্রান্তের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগল। এতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানদের জানমাল রক্ষার্থে হযরত তাঁর নিজ এলাকায় শারিরিক ভাবে সমর্থ লোকদেরকে সংগঠিত করেন এবং তাদেরকে লাঠি চালানো, তলোয়ার চালানো, ছুরি চালানো, তীর-ধনুক চালানো, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ দিতে লাগলেন। আশুরার মাসে মিছিল করার সরকারী অনুমোদন থাকায় মিছিলে তলোয়ার খেলা, লাঠি খেলার ছলে ইত্যাদির উপর খোলাখুলিভাবে জোরদার প্রশিক্ষণ কর্ম তৎপরতা চালান। যাই হোক এর ফলে বিভিন্ন দাঙ্গার সময় এ প্রশিক্ষিত লোকগুলি মুসলমানদের জান মাল রক্ষার্থে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বৃহত্তর কুমিল্লার বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমাবেশ করেন। এই উপমহাদেশের পরাধীন জাতিকে ইংরেজ শাসনের শৃংখল মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতার সচেতনতা বৃদ্ধির যে সকল বিষয় সর্বসাধারনের জানা দরকার তার উপর তিনি সাবলীল ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করতেন। তিনি মুসলমানদেরকে বলতেন "দেশ ধর্মের জন্য এবং ধর্ম আল্লাহর জন্য", তিনি আরো বলতেন, "আমি রাজনীতি করিনা, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই এবং সম্পর্ক করতেও চাই না। আমি চাই এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হোক যেখানে মুসলমানগণ শান্তিতে ধর্ম পালন করতে পারবে। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে এই উপদেশ দিতেছি।" উল্লেখ্য যে ভারতের তদানিন্তন কংগ্রেস কর্তৃক সংখ্যা গরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্য এবং তদানিন্তন মুসলিম লীগ কর্তৃক মুসলমানদের জন্য স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালিত হয়। পাক ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর পাকিস্তানের সাংবিধানিক অবকাঠামো কেমন হবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিলো। হযরতের মতামত ছিল," বিজাতীর উপর যেন জুলুম বা বেইনসাফি না হয়, এমন আইন দ্বারা রাষ্ট পরিচালনা করতে হবে।" জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে হযরতের এই মনোভাব হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর কর্তৃক সম্পাদিত ঐতিহাসিক 'মদিনা সনদের' কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও বিভিন্ন সভায় তিনি তৎকালে মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট শতধা বিভক্ত রাজনৈতিক দল সূমহের স্ব স্ব রাজনৈতিক

ঘোষনা (Manifesto) সমূহের মূল মন্ত্র গুলো সাধারণ লোকদের সামনে সহজ সরল ভাষায় ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহকারে বুঝিয়ে দিতেন। যেন তারা ভুল পথে পরিচালিত না হয়। আলা হযরত মুসলমান সমাজে মুসলমানদের ঈমান আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন মতবাদ সূমহের দুষ্ট জঞ্জাল সূমহের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে লোকজনকে সাবধান বাণী সহকারে ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। সমাজে বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান দুর্নীতি দমন কল্পে তিনি বিভিন্ন প্রকার গঠনমূলক অভিমত বা মূল্যবান উপদেশ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতেন। এ প্রসঙ্গে হযরতের একটি বাণী হল- "দেশের দূর্নীতি কোন গভর্ণমেন্ট আইনের বলে দুর করতে পারবে না, একমাত্র আল্লাহর ভয় মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে পারলে ইহা দমন হবে।" (জনাব মরহুম মকবুল আহমদ কৃত 'রাজনীতিতে আমার মোর্শেদ ক্বেবলা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।)

ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রাপ্তি ও ইসলামী ঐতিহ্যকে ধারন করতে হলে ব্যাপকভাবে আল কোরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন ও চর্চা আবশ্যক। আর তাই হযরত তৃণমূল পর্যায় থেকে ব্যাপকভাবে আরবী শিক্ষার প্রচলনের পক্ষে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করেন।

মানুষের আত্ম পরিচয় লাভ তথা মুক্তির জন্য ধর্মের নিগুঢ় সত্যকে জানা ও উপলব্ধি করার প্রতি সকল যুগের প্রখ্যাত মনীষীগণই গুরুত্ব দিয়েছেন। হযরতও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনি দেশের বিভিন্ন থানায় ও স্থানে ধর্মের বাহ্যিক শিক্ষার পাশাপাশি নিগুঢ় সত্যের পরিচয় দেওয়ার জন্য খানকা স্থাপন করেন।

হযরতের বায়াত করন

বিভিন্ন জায়গা থেকে অগণিত মানুষ হযরতের চরিত্র মাধুর্যে ও আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর দোয়া প্রার্থী হতে লাগলেন। অনেকে তাঁর বায়াত গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। হুজুর কাউকে বায়াত দিতে রাজি হলেন না। অনেকেই কান্নাকাটি করেও বিফল হয়েছেন। একদিন হুজুর তাঁর পীর হযরত হাফেজ শাহ আবদুল্লা ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর নির্দেশ পেলেন। পীর তাঁকে বললেন "মানুষকে তুমি বঞ্চিত করোনা, যেই-ই তোমার হাত ধরবে সেই-ই বেহেস্তী হবে।" এরপর হযরত ক্বেবলাহ পবিত্র ক্বাদেরীয়া তরিকার নিসবত অনুযায়ী মুরীদ করতে থাকেন। হযরতের নিকট সর্বপ্রথম যিনি বায়াত গ্রহণ করেন তিনি এই চাঁনপুর গ্রামেরই একজন অধিবাসী- জনাব লাল মিয়া ওস্তাগার। তিনি হযরতের প্রথম মুরীদ ছিলেন। লাল মিয়া ওস্তাগারের বায়াত গ্রহনের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে আগ্রহী লোকজন দলে দলে এসে হযরতের নিকট বায়াত গ্রহণ শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর মুরীদ সংখ্যা বাড়তে থাকে।

হযরতের দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) যখন সফরে বের হলেন তখন তিনি বিষয় সম্পত্তি সবকিছু ছোট ভাই মৌলভি আবদুল ওহাব এর নামে ব্যবস্থা করে দিয়ে যান। সফর থেকে যেদিন বাড়ি ফিরেন তখন গভীর রাত ছিল। বাড়িতে ঢুকেই তিনি ছোট ভাইয়ের নাম ধরে ডাকলেন। বড় ভাইয়ের ডাক শুনে ছোট ভাই দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসে বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। হযরত বললেন," কাঁদিস কেন আমি তো ফিরে এসেছি।" ছোট ভাই তখন বড় ভাইকে ঘরে যাওয়ার জন্য বললে হযরত বললেন, "তুই ঘরে যা আমি নাজির মসজিদের হুজরায় থাকবো।" এ বলে তিনি হুজরায় চলে গেলেন। শাহ্পুর দরবার শরীফে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ হুজরা খানাতেই অবস্থান করেছিলেন।

নাজির মসজিদে অবস্থানকালে হযরতের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে লোকজন বিভিন্ন বিষয়ে দোয়া চাইতে আসতে লাগলেন। একদিন কুমিল্লার নবাব ফারুকী তার বিশেষ প্রয়োজনে হযরত কেবলাহর সাথে দেখা করার জন্য লোক পাঠিয়ে সময় চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত এ ব্যপারে নিরব ছিলেন। বার বার চেষ্টা করেও কোন ফল না পেয়ে নবাব সাহেব একদিন নিজেই আসর নামাযের পূর্বে হযরতের হুজরার সামনে গিয়ে বসে রইলেন। উদ্দেশ্য হযরত বের হলেই তাঁকে তার প্রয়োজনীয় কথা বলবেন। জামায়াতের সময়ের একটু আগে হযরত হুজরার দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নবাব সাহেব হযরতের পায়ে ধরে সালাম করলেন এবং বললেন," হুজুর আমি এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যদি পাশ করি তাহলে আপনার যা কিছু প্রয়োজন আমি তার সবকিছুর ব্যবস্থা করে দিব।" হযরত জবাব দিলেন, " তুমি যদি পাশ করো তবে জীবনে কোনদিন আর আমার সামনে আসবে না" এ বলে হযরত মসজিদে ঢুকে গেলেন।

হযরত চাঁনপুর হুজরায় থাকা কালীন একদিন একজন আগন্তক তার হুজরায় আসলেন। তাকে একজন মজ্জুব দরবেশের মতো মনে হচ্ছিল। আগন্তক হযরতের নিকট খাবার চাইলেন। হযরত অত্যন্ত পেরেশান হয়ে গেলেন কারণ তাঁর নিকট অতি সামান্য খাবারই ছিল। তাই বাধ্য হয়ে এ খাবারই তিনি আগন্তক কে পরিবেশন করলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর আগন্তক চলে গেলেন। কি কথা হলো তা গোপনই রয়ে গেছে। আগন্তক বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন গ্রামবাসী কিছু ভাল ভাল খাবার হুজুরের জন্য নিয়ে আসলো। হুজুর সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আগন্তককে খুঁজতে লাগলেন এবং চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আগন্তককে আর পাওয়া গেল না। পরবর্তীতে হযরত জানিয়েছিলেন যে এই আগন্তক ব্যক্তি ছিলেন হযরত বন্দীশাহ (রাঃ)।

হযরত প্রথম যখন নাজির মসজিদে আসলেন তখন জ্বীনেরা যথেষ্ট উৎপাত করতো কিন্তু হযরত এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপও করতেন না। জ্বীনেরা পরবর্তীতে হযরতকে বুঝতে পেরে হযরতের নিকট বায়াত গ্রহণ করলো। তারা বিভিন্নভাবে হযরতের খেদমত করতে চাইলো কিন্তু হযরত জ্বীনদের কোন খেদমত গ্রহণ করেন নাই। হযরত দৈনন্দিন আহারের জন্য অল্প পরিমাণ ডাল ও চাল মিশিয়ে লবণ মসলা ছাড়া খিচুড়ি পাক করে খেতেন। তিনি সকল জায়গায় দাওয়াত গ্রহণ করতেন না। দাওয়াত গ্রহণ করলেও বিশেষ ক্ষেত্রে পরিবেশনকৃত খাবার উন্নতমানের হলে সবগুলো থেকে একটু একটু নিতেন এবং সবগুলি একত্র করে তাতে পানি দিয়ে লবন ছাড়া খেতেন। খাবারের বিষয়ে তিনি তাঁর ভক্ত ও মুরীদগণকে বলতেন, "তোমরা ক্ষুধা নিবারনের জন্য যতটুকু খাবার দরকার ততটুকু খাবে, লজ্জতপরস্থি হয়ে খেয়ো না।" একজন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর লজ্জতপরস্তি কি?" জবাবে হুজুর বললেন, "লবণ ছাড়া যতটুকু খাওয়া যায় তটুকুই জীবনধারনের জন্য প্রয়োজন। লোভ জনিত কারনে স্বাদ ও তৃপ্তির সাথে খাওয়াকেই লজ্জতপরস্তি বলে।"

হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযার সনাক্তকরণ

উচ্চ মার্গের সুফি, তাপস, গাউসে জামান হযরত শাহ্ নুরুদ্দীন (আল্লাহর দ্বীনের উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা) আল ক্বাদেরী (রাঃ) প্রায় দুইশত বছর আগে ভারতের বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জেলা হতে এখানে আসেন। তাঁর পিতার নাম হযরত আফতাব আহমেদ আল ক্বাদেরী (রাঃ)। তিনি ক্বাদেরীয়া তরিকার একজন বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব। হযরত শাহ্ ছুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এক রাতে স্বপ্ন দেখেন তাঁকে শাহপুর আসতে বলা হচ্ছে। স্বপ্নে বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর আস্তানাটি সহ সেখানে যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরদিন হযরত শাহপুরের দিকে রওয়ানা হলেন। জালুয়াপাড়া মসজিদের পাশে কবরস্থান দেখে তিনি স্বপ্নে দেখা কবরস্থানের সাথে মিলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সঠিক ভাবে মিল খুজে পাচ্ছিলেন না। তাই তিনি চিন্তিত মনে ফিরে গেলেন। ঐ রাতে আবার হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর আস্তানাটি স্বপ্নে দেখিয়ে বললেন,"তোমাকে আরো পূর্বদিকে আসতে হবে।" পরদিন হযরত আবার রওয়ানা হলেন। জালুয়াপাড়া এসে তিনি পূর্ব দিকে হাঁটতে শুরু করলেন সেখান থেকে প্রায় ২ মাইল আসার পর স্বপ্নে দেখা হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) আস্তানাটি নজরে পড়ল। এলাকাটি তিনি ঘুরে ফিরে দেখলেন। পরে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে কয়েকদিন পর আবার শাহপুরে আসলেন এবং বন্দীশাহ্ (রাঃ) মাযারের কাছাকাছি জায়গায় তাবু গাড়লেন। জায়গাটি ছিল খুব জঙ্গলাকীর্ণ। মাযারের উত্তর পাশে ছোট একটি টিনের মসজিদ ছিল। আশে পাশের লোকজন

রাতের বেলায় এখানে আসতো না। কারণ এ জায়গায় রাতের বেলায় বাঘ বন্য হাতিসহ অন্যান্য হিংস্র প্রাণী বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো-

শাহপুর পশ্চিম পাড়ার মাওলানা আবদুল হামিদের পিতা এলাকায় জনাব আবদুল ব্যপারী নামে পরিচিত ব্যক্তি হযরত শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর একজন প্রবীণ মুরীদ ছিলেন। বয়সের প্রভাবে তার দৃষ্টি শক্তি কিছুটা ক্ষীণ ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযার জেয়ারত শেষ করে বাড়ির দিকে যাবেন এমন সময় ঝাপসা ভাবে তিনি একটি প্রাণিকে বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযারের নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি ভাবলেন তার প্রতিবেশীর গরুর বাছুরটিকে হয়তো বাড়িতে নিয়ে যায়নি। তিনি হাতের লাঠি দিয়ে সেটাকে সামনে রেখে খেদিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। মাযার শরীফ থেকে বাড়ি প্রায় আধা কিলোমিটার দুরে। এতটা পথ সেটিকে খেদিয়ে যখন বাড়ির সামনে পর্যন্ত এলেন সেটি আর সামনে যেতে চাচ্ছে না। তিনি হাতের লাঠি দিয়ে সেটিকে ধমকের সাথে কয়েকবার হালকা আঘাত করলেও সেটি কিছু করলোনা। এক পর্যায়ে কিছুটা জোরের সাথে আঘাত করলে সেটি ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। গর্জন শুনেই আবদুল ব্যপারী বুঝতে পারলেন এতক্ষণ যে প্রাণীটিকে গরুর বাছুর মনে করে এতটা পথ খেদিয়ে এনেছেন সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি বাঘ। দৃষ্টি ঝাপসা হওয়ার কারনে যা তিনি ঠাহর করতে ভুল করেছেন। তিনি সাথে সাথে সেখান থেকে সরে পড়লেন। বাঘটিও তার কোন ক্ষতি না করে নিজের পথে চলে গেল।

হযরত কেবলাহ এখানেই তাবু গেড়ে থাকতেন। হিংস্র প্রাণীদের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না এবং কোন হিংস্র প্রাণী তাঁর কোন ক্ষতি করতনা। উল্লেখ্য হযরত বন্দী শাহ (রাঃ) এঁর খেদমতে বিভিন্ন সময়ে অনেক লোক এসেছিলেন। কিন্তু কোন লোকই এখানে এক সপ্তাহ, দুই সপ্তাহ বা এক মাসের বেশি থাকতে পারেন নাই। এই তথ্য এলাকার বয়োবৃদ্ধদের নিকট জানা গেছে। হযরত শাহ ছুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এখানে আসার পর এলাকাবাসীর মধ্যে আলোচনা হতে লাগল যে কত ফকির আসল কেউই থাকতে পারলো না, এখন যিনি এসেছেন তাঁর অবস্থা একই হবে। কিন্তু তারা যখন দেখল যে এই লোক অনেকদিন যাবৎ অবস্থান করছেন তখন তাদের বিশ্বাস হলো যে নিশ্চয়ই এই লোক এই জায়গার উপযুক্ত। নতুবা এতদিন থাকা সম্ভব হতো না। তাই তারা আস্তে আস্তে হযরতের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং এক পর্যায়ে তারা হযরতকে অনুরোধ করে বললেন যে হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) এঁর আস্তানার যত্ন নেওয়ার মত কোন লোক এখানে এসে থাকতে পারেনি। আপনি নিশ্চয়ই এই জায়গার উপযুক্ত

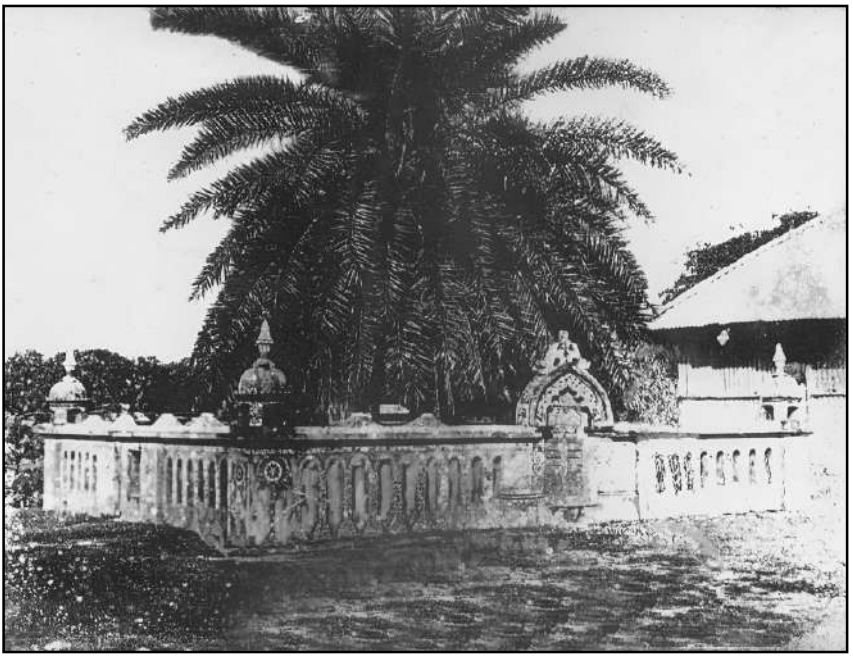

হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) এঁর মাযারের পুরানো ছবি। ছবিতে তাঁর মাযারের উপর সেই ঐতিহাসিক খেজুর গাছটি যাতে দানাবিহীন খেজুর হত। পাশেই টিনের মসজিদ।

হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) এঁর মাযারের বর্তমান ছবি।

লোক নতুবা আপনি এতদিন থাকতে পারতেন না। এলাকাবাসী হযরতকে অনুরোধ জানালো তিনি যেন কখনো এই জায়গা ছেড়ে না যান এবং হযরত এখানে থাকার জন্য যাতে কেউ কোন ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে এ জন্য এলাকার সর্দার মাতবর গণ সম্মিলিত ভাবে হযরতের নিকট একটি অনুরোধ পত্র লিখে জানালেন তিনি যেন এই দরবার ছেড়ে কোথাও না যান। অনুরোধপত্রে প্রায় ২৪ জন সর্দার মাতবর দস্তখত করেন। সেই অনুরোধ পত্র আজো দরবারে সংরক্ষিত আছে।

হযরত এখানে আসার কয়েক দিনের মধ্যেই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাটি পরিষ্কার করে ফেলেন। মাযারের নির্দিষ্ট জায়গাটি চিহ্নিত করলেন। হযরতের কিছু ঘনিষ্ট মুরিদ এই সকল কাজে হযরতকে সাহায্য করেছেন। কিছুদিনপর কবরটি পাকা করার জন্য হযরতের প্রথম মুরীদ লাল মিয়া ওস্তাগারকে নিয়ে আসা হলো। লাল মিয়া ওস্তাগারকে তিনি মাজারটি চিহ্নিত করে পাকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কাজ চলা কালিন সময়ে হযরত হুজরায় অবস্থান করছিলেন। ওস্তাগার সাহেব কাজ আরম্ভ করলেন। দুই এক জায়গায় ভুল হলে সঙ্গে সঙ্গে হযরতের নির্দেশ তার কানে আসতো এবং একটু ডানে বা একটু বামে এভাবে তিনি নির্দেশ করতেন। ওস্তাগার সাহেব হযরতের আওয়াজ পেয়ে প্রথমে ডানে বায়ে তাকিয়ে তাকে দেখতে না পেয়ে বুঝলেন তিনি তাঁর হুজরা থেকে তার অন্তর দৃষ্টি দ্বারা সবকিছু দেখছেন এবং তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) বাবার নামে এই স্থানে একটি মাদ্রাসা চালু করলেন। কালক্রমে এই মাদ্রাসা হাই স্কুলে পরিণত হয়। বর্তমানে হাই স্কুলটি শাহপুর গ্রামের উত্তরাংশে অবস্থিত। হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর আস্তানায় হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) তার মুরীদগণ কে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিদ্যাতেই বিভিন্ন কৌশলে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে তাদেরকে রহস্য জগতের দিক নিদের্শনা দিতে থাকলেন। "আল্লাহর একান্ত অনুগত হওয়ার পর আল্লাহ যাদেরকে বন্ধু হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, ঐশি ক্ষমতায় ক্ষমতাবান হয়ে তারা যে অলৌকিক কারিশমার অধিকারী হন তদদ্বারা আকাশের চলমান তীরকে নিমেষের মধ্যে দৃষ্টি শক্তি দ্বারা স্ত দ্ধ করে দিতে পারেন।" বলেছেন হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রহঃ)।

গোমতির গোঁয়ার্তুমিকে সুমতিতে পরিণত করে এর শলীল বিধৌত মনমুগ্ধকর মনোরম পরিবেশে গড়ে ওঠা অনেক তিতীক্ষা ও ত্যাগের ফলশ্রুতি আজ এই শাহপুর দরবার শরীফের 'খানেকায়ে সোবহানীয়া' ক্বাদেরীয়া। দরবারের মসজিদের পূর্বদিকে একটি আমগাছের নিচে হযরত একটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করলেন। এখানে তিনি অসংখ্য হামদ, নাতিয়া, গাউছিয়া, মুরশীদি এবং অন্যান্য অনেক কাসিদা আরবী, উর্দূ ও বাংলায় রচনা করেছেন।

হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) এঁর কবরের মাঝখানে একটি খেজুরের গাছ ছিল। এই গাছের খেজুরের কোন বিচি ছিল না। হযরত ঐ খেজুর গাছ কে উপলক্ষ্য করেই 'দরদে দেল' নামক কাব্য গ্রন্থে 'হেরিব খেজুর ডালা' নামক কবিতাটি লিখেছেন। যার প্রথম দুইটি পংক্তি-

"আমতরু-তলে বসিয়া নিরলে,
হেরিব খেজুর ডালা।
মনেরি বেদন, কব বন্দীশারে [গাজিপুরে]
বাগদাদে জানাব জ্বালা"।।

দরবারের উন্নয়ন কল্পে কুমিল্লা শহরের মুন্সি আলতাফ আলী মগফুরের দ্বিতীয় পুত্র মরহুম মুকছুদ আহম্মদ সাহেব দরবারে নিবেদন পূর্বক টিনের মসজিদটি ভেঙ্গে একটি সুন্দর পাকা মসজিদ তৈরী করেন। দরবারে সারা বছর বিভিন্ন ছোট বড় মাহফিল হতে থাকে। হযরত শাহ্ নুরুদ্দিন আল ক্বাদেরী (রাঃ) প্রকাশ্যে হযরত বন্দী শাহ্ বাবার বাৎসরিক ওরছ মোবারক পালনের জন্য হুজুর একটি তারিখ নির্দিষ্ট করে দেন। উক্ত তারিখ হলো মাঘ মাসের ৩য় শুক্রবারের পরের দিন শনিবার দিবাগত সারা রাত। হযরত ক্বেবলার জীবদ্দশায় ওরসের মাহফিলে সারা রাত শোগলে ক্বাদেরীর নিয়মানুসারে জিকির আজকার তালিম ও কাসিদায়ে সোবহান পাঠের মাধ্যমে রাত অতিবাহিত হতো। মধ্য রাতের পর থেকে সালাম পাঠ করার রেওয়াজটিও প্রবর্তন করেন। এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ তরীক্বতের কোন কথা থাকলে তা কিছুটা আলোচনা হতো। দেশের অন্যান্য স্থানের মতো ওরছের রাতে সারারাত ওয়াজ মাহফিলের কোন ব্যবস্থা রাখেননি। হযরতের কাছিদা ও গজলের তাৎপর্য ও উচ্চ মার্গের ভাবধারা এ সকলের চর্চা সত্যিকারেই পরকাল সম্পর্কে আল্লাহ্ ভীরুদেরকে দিক নির্দেশনা দান করে। হযরতের অনবদ্য রচনাবলির মধ্যে ব্যবসায়ী আম্বিয়া, শোগলে ক্বাদেরী, মহা সমর, দরদে দিল, কাসিদায়ে সোবহান উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষের নিকট গবেষণার দাবি রাখে।

আলা হযরত কেবলাহর বিবাহ

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বিবাহের বিষয়টিও ছিল অন্যান্য অনেক ঘটনার মতো আধ্যাত্মিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। প্রায় ৪৪ বছর বয়সে তিনি বিয়ে করার জন্য ঐশীভাবে নির্দেশিত হয়েছিলেন। হযরত তার ঘনিষ্ট বয়স্ক মুরীদগণকে বিষয়টি জানালেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগলো। লাকসামের দেশ বরেণ্য নবাব পরিবারের সাথেও বিয়ের আলোচনা চলছিল। হযরত অপেক্ষা করছিলেন ঐশী নির্দেশের জন্য। শাহপুরের পশ্চিমের

গ্রাম ছাওয়ালপুর। এ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবার ছিল। সে পরিবারে সৈয়দ এমদাদ সাহেবের পুত্র সৈয়দ আব্দুল ওয়াহাব ওরফে গেদন মীরের মেয়ে সৈয়দা রোকেয়া খাতুনের সাথে বিয়ের প্রস্তাব আসলো। হযরত ঐশী ভাবে নির্দেশিত হয়ে এই বিয়েতে মত দিলেন। এ দিকে মেয়ের বাবা কোন কারনে সিদ্ধান্ত হীনতায় ভুগছিলেন। কিন্তু মেয়ের মা এখানেই বিয়ে দেবার জন্য অটল ছিলেন এবং তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন যেন এখানেই বিয়েটা হয়। এক পর্যায়ে তিনি যখন দেখলেন বিয়ের কোন সিদ্ধান্ত হচ্ছে না তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ্‌ তুমি আমার একটি চক্ষু নিয়ে যাও তবুও যেন এই বিয়েটি হয়।" কারন তিনি হযরতের অনেক ঐশী গুণাবলী লক্ষ্য করেছিলেন। বিয়ে যখন ঠিক হয়ে গেল তখন দেখা গেল মেয়ের মায়ের একটি চোখ খারাপ হতে থাকে। এ সংবাদ যখন হযরত কেবলাহর নিকট পৌঁছলো তখন তিনি ফরিয়াদ করলেন, "হে আল্লাহ্‌ আমি তো কানা শাশুড়ি চাই না।" পরবর্তীতে দেখা গেল শাশুড়ির চোখ ভালো হয়ে আসছে।

এদিকে ছাওয়ালপুর মীর বাড়িতে বিয়ে ঠিক হওয়ার পর বিভিন্ন জনের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা ও মতভেদ হল। কারো কারো মতে লাকসামের নবাব বাড়ীর প্রস্তাবিত বিয়েটা হলেই ভাল হত। একদিন আসরের নামাযের পর মসজিদের বারান্দায় বসে আলা হযরত কেবলাহ (রাঃ) ও তাঁর মুরীদ জুলফিকার আহমদ সাহেবের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। এক পর্যায়ে মুরীদ জুলফিকার আহমদ সবিনয়ে বললেন,"হুজুর, লাকসাম নবাব পরিবারে আপনার বিবাহের প্রস্তাবটি আপনি গ্রহন না করায় সাধারন লোকেরা আপনি ঠকেছেন বলে মন্তব্য করে।" হুজুর বললেন, "তোর কি মনে হয়?" উত্তরে মুরীদ বললেন,"হুজুর আমারও মনে হয় যে নবাব পরিবারে বিয়ে করলে মান-সম্মান, প্রতিপত্তি সব বাড়তো।"

হুজুর আবার এরশাদ করলেন,"জুলফু, বিয়ের দুই প্রস্তাবের মধ্যে কোনটি উত্তম,লোকের কথা না শুনে আল্লাহ্‌কে দিয়ে ফয়সালা করালে ভাল নয়কি?"

মুরীদ বললেন,"জী হুজুর।" হুজুর কেবলাহ মসজিদে রক্ষিত তাক থেকে একটি কোরান শরীফ নিয়ে আসতে বললেন এবং মুরীদ হুকুম অনুসারে তাই করলেন। হুজুর কেবলাহ জুলফিকার আহমদকে চোখ বন্ধ রেখে কোরান পাক একটানে খুলতে বললে তিনি খুললেন। হযরতজী ডান দিকের পাতাটি তেলাওয়াত করতে বলায় তিনি তেলাওয়াত শুরু করলেন। হযরত এক জায়গায় থামতে বলে অর্থ বুঝলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় জনাব জুলফিকার আহমদ অর্থ বুঝেননি বলে জানালেন।

হুজুর আয়াত সমুহের ব্যাখ্যায় বললেন, আয়াতের অর্থ হলো : "তাদেরকে বলা হবে, হে আমার বান্দারা আজ তোমাদের না কোন ভয় আছে না তোমাদের কোন দুঃখ। যে সব লোক আমার নিদর্শন গুলোর উপর ঈমান এনেছে এবং মুসলমান ছিল ! প্রবেশ করো জান্নাতে তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের সমাদর করা হবে।" (সুরা যুখরুফ, আয়াত: ৬৮-৭৩)

পুনরায় হযরত বললেন,"পাক কোরানের ফয়সালা অনুসারে দেখা গেল নবাব বাড়ীর প্রস্তাবের পরিবর্তে সাইয়্যেদ বংশের এ প্রস্তাব গরীব হলেও সব চাইতে উত্তম। এখন বুঝলিনি জুলফু ?" পবিত্র কোরানের মাধ্যমে সত্যদ্রষ্টার ফয়সালার এ গুপ্ত বিষয়টি চিন্তনীয় ব্যাপার।

বিয়ে ঠিক হওয়ার পরে হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বিয়ের পূর্বেই মুরুব্বিগণের মাধ্যমে মোহতারেমা আম্মা সাহেবাকে একাধিক চিল্লা করিয়ে আত্মিক উন্নতি সাধন করেছিলেন।

এই মহান তাপস প্রবরের পবিত্র বিবাহ অনুষ্ঠান এক অনাড়ম্বর অথচ ভাবগম্ভীর পরিবেশে সমাপ্ত হয় বলে বর্ণিত আছে। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর যামানায় তাঁর আত্মিয়-স্বজনের বিবাহ অনুষ্ঠান তিনি যে ভাবে উদযাপন করিয়েছিলেন যা আরশের অধিপতি আল্লাহ্ তায়ালার পছন্দের সাথে পূর্ণ সম্পৃক্ত ছিল। সেই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই আলা হযরত কেবলার বিবাহ অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়।

একজন ইংরেজী শিক্ষিত প্রবীণ মুরীদ যিনি আমার পিতামহ তাঁর মুখে আমি যা শুনেছি তা হল,"The wedding ceremony of Hudjur Keblah was accomplished and done in such a typical manner which invites our concept to matrimonial events of Ummul Mumenina and Sahaba -e- kiram (R.)."

পরিণয় সূত্রে তিনি আবদ্ধ হওয়ার পর আদর্শ স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর চরম আদর্শ পথে পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। বিয়ের পর হযরত কয়েক মাস ছাওয়ালপুর অবস্থান করেন। তখন এ কারনেই তাঁর নাম হয়ে যায় ছাওয়ালপুরের পীর সাহেব।

এখানে উল্লেখ্য যে, সৈয়দা রোকেয়া খাতুন যখন ছোট ছিলেন তখন একদিন তিনি সন্ধ্যার পর ঘরের দরজায় বসে ছিলেন। সে রাত্রটি ছিল লাইলাতুল ক্বদরের রাত্র। তিনি দেখলেন হঠাৎ সমস্ত গাছ পশ্চিম দিকে সেজদা দিয়ে পড়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর মা তাঁকে ভয়ের কারন জিজ্ঞাসা করলে তিনি গাছ পালার সেজদা দেওয়ার কথাটি বললেন।

এ ঘটনা শুনে মা অত্যন্ত খুশি হলেন এবং বললেন আল্লাহ তোমাকে অনেক বড় করবে। তিনি মেয়েকে ব্যাখ্যা করে বুঝালেন এটা ক্বদরের রাত্র। এ অবস্থাটি দেখা সবার ভাগ্যে জুটে না। যাই হোক পরবর্তী পর্যায়ে সবাই দেখতে পেল একজন অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের অলী আল্লাহর সাথে তাঁর বিয়ে হয়েছে এবং পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে যে তাঁর মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের অলী আল্লাহর স্বভাব রয়েছে ও তাঁর কাছ থেকে অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে যার দুইটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো:

ঘটনা-১: হযরত শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বড় সাহেবজাদা শেখ শাহজাদা মোহাম্মদ পিয়ারা আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর বড় ছেলে রেজা-এ মুরসালীন এর যখন পাঁচ বছর বয়স (১৯৭৫খ্রিঃ) তখন একদিন তাদের ঢাকাস্থ মোহাম্মদপুর কলোনির বাসার সামনে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে বাচ্চাদের খেলা দেখছিল। একটি জীপ হঠাৎ করে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে ড্রেনে ফেলে দিল। নিকটস্থ ফায়ার ব্রিগেডের লোকজন ঘটনাটি লক্ষ্য করে দ্রুত এসে বাচ্চাটিকে তাদের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। রেজা-এ মুরসালীনকে দোয়া করার জন্য আম্মা সাহেবানীর নিকট সংবাদ পাঠানো হল। আম্মা সাহেবানী যেন পেরেশান না হন সেই খেয়ালে সংবাদদাতা খুব সাধারণভাবে রেজা-এ মুরসালীন এর দুর্ঘটনার কথা আম্মা সাহেবানীকে জানিয়ে দোয়া চাইলেন। সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আম্মা সাহেবানী বলে উঠলেন, "তোরা কি বলসিছ? আমি দেখছি রেজার সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে আছে।" বলেই আম্মা সাহেবানী চুপ করে গেলেন এবং হাত তুলে তাকে দোয়া করলেন।

রেজা-এ মুরসালীন এর বাস্তব অবস্থা ছিল-দূর্ঘটনায় তার ডান পা হাঁটুর ওপরে ভেঙ্গেছে, পাঁচটি দাঁত পরে গেছে, বুকের ছয়টি হার ভেঙ্গেছে এবং মাথার পেছনে আঘাত লেগে কান দিয়ে পানি পড়ছে। দূর্ঘটনার সংবাদটি আম্মা সাহেবানীর নিকট সাধারণভাবে পৌঁছলেও তিনি কিন্তু অন্তরদৃষ্টিতে রেজা-এ মুরসালীনের পূর্ণ অবস্থা দেখে ফেললেন। যাই হোক ডাক্তাররা যদিও সবাই বলেছিল যে বাচ্চাটির বাচাঁর কোন সম্ভবনাই নেই। কিন্তু আম্মা সাহেবানীর দোয়ায় আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতে রেজা-এ মুরসালীন বেঁচে উঠেছে।

ঘটনা-২: হযরত শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর দ্বিতীয় সাহেবজাদা ড. শেখ শাহজাদা আহমদ পেয়ারা আল ক্বাদেরী (রা:) বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৭৪ খ্রি: তিনি ইরাকের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির জবাবে ইরাকে শিক্ষকতা করার ইচ্ছা পোষণ

করে এই বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে দরখাস্ত করেন। ইরাকে যেন তাঁর যেন চাকুরী হয় সে আশায় তিনি আম্মা সাহেবানীর নিকট দোয়া চাওয়ার জন্য শাহপুরে আসেন। আম্মা সাহেবানী তাঁকে দোয়া করে বললেন, "তোমার চাকুরী বসরাতে হবে।" শেখ আহমেদ পেয়ারা (রাঃ) তাঁর চাকুরী স্থান ময়মনসিংহে চলে যান। কিছুদিন পর ইরাক সরকার থেকে তাঁর নিয়োগপত্র আসে। তাঁর নিয়োগ হয় সোলায়মানিয়া ইউনিভার্সিটিতে। নিয়োগ পত্র হাতে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে দোয়া নিয়ে বিদায় নিতে বাড়িতে আসেন। তিনি আম্মা সাহেবানীকে জানালেন যে, ইরাকের সোলায়মানিয়া ইউনিভার্সিটিতে তাঁর চাকুরী হয়েছে, বসরাতে নয়। আম্মা সাহেবানী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে তাঁকে দোয়া করে বিদায় দিলেন।

শেখ আহমদ পেয়ারা আল ক্বাদেরী (রাঃ) ইরাকের সোলায়মানিয়া ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে কৃর্তপক্ষের সঙ্গে দেখা করলেন। কৃর্তপক্ষ তাকে দেখে হয়রান হয়ে গেল। কারণ তারা দেখল অন্যান্য নিয়োগ প্রাপ্তদের মত তিনি দ্রুত কোন যোগাযোগ করেন নাই। তাই তাদের ধারণা হয়েছিল যে তিনি হয়ত আসবেন না। এ পরিস্থিতিতে তারা একজন মিশরীকে আলোচিত পদে নিয়োগ দিয়ে দেয়। কিন্তু শেখ পেয়ারা নিয়োগপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে মন্ত্রনালয়ের সাহায্য চেয়ে অনুরোধ করে যে অন্য কোন ইউনিভার্সিটিতে শেখ আহমেদ পেয়ারা আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর উপযুক্ত কোন পদ খালি আছে কিনা তা দেখার জন্য। অনেকক্ষণ পর মন্ত্রনালয় থেকে সংবাদ আসে যে শেখ আহমেদ পেয়ারা আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর জন্য বসরা ইউনিভার্সিটিতে একটি পদ খালি আছে। তাঁকে সেখানে নিয়োগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি শেখ পেয়ারাকে জানালে তাঁর মনে পড়ে গেল আম্মা সাহেবানী তাঁকে বলেছিলেন যে বসরা ইউনিভার্সিটিতে চাকুরী হবে এবং তখন তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর মায়ের অন্ত দৃষ্টি কতটা প্রখর ছিল।

আলা হযরত কেবলাহর ঔরসে চার পুত্র ও ছয় কন্যা জন্ম নেন। সংসার লালন-পালনের ভুমিকায় হযরতজী অত্যন্ত প্রজ্ঞাশীল দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলে সন্তানগণকে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক আক্ষরিক জ্ঞানের শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার প্রতি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। দ্বীনি শিক্ষার সত্য জ্ঞান দানে হযরত কেবলাহই ছিলেন সন্তানদের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাথে সাথে তিনি যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত তাঁর সন্তানগণকে শিক্ষার্জন করতে নিরুৎসাহিত করেননি। তিনি গোঁড়া বা অর্ধ শিক্ষিত ছিলেননা বিধায় তাঁর ছেলে সন্তানগণকে সমাজ সংসারের আধুনিক প্রযুক্তিগত

শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে প্রত্যেককে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করান। হযরত কেবলার চার পুত্রই যথাক্রমে-মাস্টার্স (কৃষি বিজ্ঞান), ডক্টরেট (রেডিয়েশন বায়য়োলজি), মাস্টার্স (কৃষি বিজ্ঞান), ডাক্তার (দন্ত বিজ্ঞান বি ডি এস, স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভ করেন।

আলা হযরত কেবলাহ আল্লাহ্‌র অপার মেহেরবানীতে তাঁর কন্যা সন্তানগণকেও ইসলামি 'শরীয়তে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম' এঁর নিয়মানুসারে কঠোর পর্দার মধ্যে রেখে নিজেই ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। দয়াময় আল্লাহ্‌র কৃপায় হযরত কেবলাহ (রাঃ) তাঁর প্রত্যেক কন্যাকে প্রখ্যাত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের সুযোগ্য পাত্রেই কন্যা দান করে যান। পুত্র সন্তানগণও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বিবাহ করে 'শরীয়তে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম' এঁর নির্দেশ মোতাবেক 'কুফু কুফু' রক্ষা করেন।

তরিকতে হযরতের উর্ধ্বারোহণ

তরিকতে উর্ধ্বারোহণ, এ কাজটি যেমন কঠিন রেয়াজতের দাবি রাখে তেমনি এটা অন্যের পক্ষে বুঝাও এক জটিল ব্যাপার। এ রাস্তায় কে কোথায় আছে, কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা জানা বা বুঝা উচ্চ পর্যায়ের অলী আল্লাহ্‌গণ ছাড়া সাধারণের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। তবে এ পথের সন্ধানীরা অলী আল্লাহ্‌গণের কথা, কাজ-কর্ম, আমল ইত্যাদির দ্বারা কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। তাদের আন্দাজ আরো সঠিক হয় যখন তারা কারো মাঝে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি প্রেম ভালবাসার গভীরতা দেখেন। হযরত মুর্শীদ কেবলাহ পূর্বে উল্লেখিত তাঁর জীবনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কঠিন সাধনা রেয়াজত ছাড়াও তরীকতের সুলুকের প্রত্যেকটি মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন দক্ষ একজন সাঁতারু হয়ে। তিনি তাঁর মহান মুর্শীদ কুতুবে জামান মাওলানা শায়খ শাহ্ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ) (কুমিল্লাস্থ দরোগা বাড়ীতে যাঁর মাজার শরীফ) এঁর সবচাইতে বেশী নিকটের ভক্ত ছিলেন। যা অত্র গ্রন্থের প্রথমাংশে বলা হয়েছে। তিনি তাঁর মুর্শীদকে কেন্দ্র করে লিখেছেন:

আমার প্রাণ প্রিয়ে কই ওগো গাজিপুরী সই।
কোথা গেলে পাব তারে, শীঘ্র বলে দেগো সই।।
সখী গো তোর ধরি পায়, প্রাণে বাঁচা হল দায়।
প্রিয়া দেশে লয়ে চল, আর কত জ্বালা সই।।
এমন বিপদকালে, সই গো তুমি কোথা রলে।
মুছিবে নয়ন জলে, তুমি বিনে কে গো সই।।

তিনি একটি উর্দূ কাসিদায় আরও বলেন:-

পেলাকার জামে ওয়াহ্‌দাত কা
মুঝে মস্তানা তু করদে ।
মেরা আবাদ আয় মোর্শেদ
দিলে বিরানা তু করদে ।।
জো উলফাত দে তু এয়ছি দে
তাওয়াজ্জুহ দে তু এয়ছি দে ।
শামা বন বায়ঠে মাফেল মেঁ
মুঝে পরওয়ানা তু করদে ।।

মুর্শীদ কেবলাহকে কুতুবে জামান হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল্লাহ আল ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর রূহানী জ্যোতির হাতের পরশে অল্প সময়ের মধ্যে মাকামের কর্নধার হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী শাইয়্যানলিল্লাহ (রাঃ) এঁর জ্যোতির্ময় মহান হাতে সোপর্দ করেন। এভাবেই আমার শায়খ্ উর্ধ্ব জগতের দিকে উত্তীর্ণ হতে থাকেন।

'মুকাশিফাতে আয়নিয়া' নামক কিতাবে হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ) বলেছেন, "আফরাদ অলীগণ, যাঁদের সংখ্যা নিতান্তই বিরল এবং কয়েক শতাব্দী বা হাজার বছর পর আল্লাহ্ পাক সোবহানু তা'য়ালা এই ধরার ধরনীতে দয়া পরবশ হয়ে প্রেরণ করেন। তারা হেদায়াতের কাজে অতি সিদ্ধ হস্ত এবং ক্ষমতাবাণ। এই আফরাদ অলীগনের মধ্যে বাছাই করা উচ্চ মাকামের অতি নগণ্য সংখ্যক অলী এই ক্ষমতার অধিকারী হন। এই মাকামের নাম হলো 'এরশাদে পুরমাদার।' বস্তুত আহলে বাইতের প্রখ্যাত বারজন ইমাম এই শানের অধিকারী।" আর 'এরশাদে পুরমাদার' মাকামের খাস্ শানের মালিক হলেন মাহবুবে সোবহানী গাউসুল আজম সাইয়্যেদেনা শায়খ মহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ)। এ জন্যই তিনি বলেছেন, "ক্বাদামী হাজিহি আলা রাকাবাতে কুল্লে আউলিয়া আল্লাহ্।"

গাউসুল আজম হযরত বড়পীর ক্বেবলাহ (রাঃ) এঁর মহব্বতের মাকামে হযরত শায়খ্ আবদুস সোবহান ক্বাদেরী (রাঃ) সায়ের পূর্বক ইশ্‌কে মাহবুবে সোবহানীর 'শওকে- ফানার' জামভর্তি পূর্ণ পেয়ালা পান করেছেন। 'ক্বাসিদায়ে সোবহানীয়ার গাউসিয়া' এবং 'দরদে দিল' কাব্য গ্রন্থ এর পূর্ণ পরিচয়। তাঁর 'দরদে দিল' নামক বাংলা কাব্যগ্রন্থে গাউসিয়াতে উল্লেখ করেন:

"মদদ ইয়া গাউছে রাব্বানি,
মদদ ইয়া কুতুবে ছামদানি,
মদদ ইয়া পীরে হক্কানী;
মহিউদ্দীন জিলানী।।

সাধনায় করেছিলে, বিশ্বভব পদতলে ।
অলী শিরে পদ তব, তুমি হে পীরে লাছানি ।।
নবী পদ তব শিরে, পদ তব অলী শিরে ।
নতশিরে পদ চুমি, রাখ শিরে পা দুখানি ।।
কত পাপী মুক্তি দিলে, কত মরা বাঁচাইলে ।
বিষম বিপদে আছি, করনা মেহেরবানী ।
তুমি হে সারথি যার, ভয় কিছু নাহি তার ।
স্বর্গপুরে তব ধ্বজা, হে মাহবুবে সোবহানী ।।
শুনেছি হে অলী বর, প্রভু রাজ্য অধিশ্বর ।
মুরিদান নাহি ডর, বলেছ এ সুধাবাণী ।।
তাই চাহি পাপাত্মনে, কর ভর্তি মুরিদানে ।
যোগ্যতা যদিও নাহি, হে শিষ্য মনমোহিনী ।।
ক্বোতব করেছ চোরে, ওহে পীর দয়া করে ।
সেই কৃপা চাহি আমি, পাপমতি বিষাদিনী ।
দানব মানব পীর, দস্যুদল নতশীর ।
নূরার্ণবে ফুটিয়াছ, তুমি মাত্র সরোজিনী ।।
মরাকে জীয়াতে পার, জীবাকে মারিতে পার ।
এমন শকতি কারে, দিয়েছে কাদের গনী ।
তব পদ সোবহান, চাহে চুমে অবিরাম ।
তুমি হে প্রভুর বাণী, জহুরে জাতে রহমানী ।।

হযরত মুর্শীদ কেবলাহর আত্ম আহবানকারী গাউসিয়া সমূহের আরেকটিতে তিনি অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন:-

"জু দম সে গুজরে তু গাউসে পেয়ারে
নেজামে শরবত পেলাকে জানা,
বদস্তে রহমত পেলাকে শরবত
পেয়াসা মেরা বুজাকে জানা ।।
না মুঝকো গোসল ও কাফন কি হাজত
না মুঝকো হাজাত গোলাব ও খুশবু,
দরিদা তহবন বানাকে খেরকা
পাসিনা আপনা লাগাকে জানা ।।
জবতক না দেখোঁ জামাল তেরা
কভি না জায়ে ইয়ে জান মেরা,
দেখাকে সুরত পেলাকে শরবত
ইয়ে দিলকি হাসরাত মিটাকে জানা ।।

অর্থাৎ:- "যখন আমার প্রাণ পাখিটি
উড়ে যাবে খাঁচা ছেড়ে
একটুখানি প্রেম শরাব
পান করাইও হে গাউস পেয়ারে,
তাঁর হাতের ঐ একটু শরাব
পাই যদি গো আপন করে
তৃষ্ণা আমার যাবে চলে
পান করিলে প্রাণ ভরে ।।
আতর সুবাস গোলাপ জলে
গোসল দিওনা কেউ ভুলে,
পিয়া তহবনে দিয়া কাফন
ঘাম দিও তাঁর আতর স্থলে ।।
যাবৎ না দেখিব মোর প্রিয়ারে
না যাবে প্রাণপাখি এ পিঞ্জর ছেড়ে,
পুরায়ে বাসনা করিও শান্তনা
যাবার বেলায় দেখা দিয়ে মোরে ।।

তিনি আরেকটি কাসিদায় বলেন-

'মোবতালায়ে দর্‌দ ও গম্‌কো গাউসে জিলাঁ চাহিয়ে
না আফলাতুঁ চাহিয়ে না হোব্বে দেরমা চাহিয়ে ।।
বুলবুলকো কফছে সিমিঁ শির ও শিরিঁ হ্যায় আবাছ
গুলশান ও গুল কা তামাসা বুয়ে রায়হাঁ চাহিয়ে ।।
হায় পরীওঁ কো তামান্না বিসতরেহ গুল আতরে মাআব
হামতো আশেক হ্যায় হামে খারে মাগিলা চাহিয়ে ।।
ওয়ায়েজো হামকো মালামাত না করো বাহরে খোদা
হাম ফেদা গাউসে খোদা কি সো জান কোরবাঁ চাহিয়ে ।।
জাহেদো তসবিহ ও মসজিদ তোমকো দায়েম শাদবাদ
হাম ছা রেন্দো কো শরাব ও রোঁয়ে জানা চাহিয়ে ।।
দাশ্‌ত কি আহু গোরেজা তীর সে সৈয়্যাদ কি
দাশ্‌তে হা হু কে হোঁ আহু তীরে মিযগাঁ চাহিয়ে ।।
হায় তু সোবহাঁ চাহতা গর ওয়াসলে জানা যুদতর
গাউসে জিলাঁ চাহিয়ে মাহবুবে সোবহাঁ চাহিয়ে ।।"

অর্থাৎ- চাই যে আমি গাউসে পাকের পরশ পেতে
মোর ব্যথা বেদনার অক্টোপাশে,
চাইনা বিমার হোক উপশম আফলাতুনের চিকিৎসাতে
এই ব্যাথা ঘুচবে শুধু গাউস জিলানের প্রেম পরশে।
শিরীন গানে বুলবুলিরা উঠুক মেতে বাগানে
জান্নাতেরই রায়হান ফুলের সুবাস চাই মোর মনেরই অঙ্গনে।।
থাক পরীরা আতর গোলাপ পুষ্প শয্যার বিছানায়
আমি প্রেমিক তৃপ্ত শুধু মগিলা কাঁটার শত খোঁচায়।।
বন্ধ কর ভয় দেখানো হে মৌলভী বিশ্ব প্রভুর খাতিরে
গাউস পাকের প্রেমানলে জান যে আমার চৌচিরে।।
সাধক তুমি ব্যস্ত থাক তসবিহ, মসজিদ, জায়েনামাজে
আমি মাতাল গাউস পিয়ার প্রেম মদিরার শরাবে।।
যেমনে হয় বনের হরিণ পলায়ন পারা শিকারির ঐ হাত হতে,
আমিত চাই মোর পিয়াসী মনের তৃপ্তি মিটুক মহাজনের
প্রেম বিষমাখা তীরের ফলাতে।।
সোবহান তোমার মাঝে চাওকি আসুক ঐ সারথীর আসল রূপ
তোমার মাঝে পোড়াও তবে গাউস নামেরই ধূপ।।"

আলা হযরত কেবলাহ তাঁর একটি গাউসিয়ায় বলেন, "বানাদে সাগ দারে আকদাস জনাবে গাউসে আযম কা।" অর্থাৎ- "আমাকে জনাবে গাউসে আযমের দরবারের কুকুর বানিয়ে দাও।" আবার অন্য জায়গায় বলেন, "সাগ তেরে দরগাহ কা আব মুঝকো শাহা কিজিয়ে।" অর্থাৎ "তোমার দরবারের এই কুকুরকে আজ বাদশাহ্ বানিয়ে দাও।" তিনি এভাবে গাউস পাক (রাঃ) এঁর অথৈ প্রেম সমুদ্রে সন্তর্পনে সাঁতরিয়ে একপার হতে অন্য পারে যেয়ে এস্কে রাসূলের আঙ্গিনায় উঠেন। এভাবে আলা হররত কেবলাহর উত্তরণ ঘটতে থাকে।

আল-কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা, "কুল ইন কুতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্বিব কুমুল্লাহ, ওয়াইয়াগ ফিরলাকুম জুনুবাকুম ওয়াল্লাহু গাফুরুর রাহিম।" অর্থাৎ "হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি ঘোষণা করে দিন যে, যদি আমার কোন বান্দা তাদের অপরাধ বা গুনাহ্ সমেত চায় যে আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালবাসুক এবং তাদের সকল পাপরাশি সমুহ ক্ষমা করে দিক তবে তারা যেন আপনার তাবেদারীতে লেগে যায়। তবে আল্লাহ তাদের সকল অপরাধ সমূহ ক্ষমা করে দিবেন ও ভালবাসবেন।" কোরআনুল কারীমের উক্ত অমোঘ বাণীটি সাধারণের নিকট বহুল উচ্চারিত ও শ্রুত। বস্তুত পক্ষে 'ফাত্তাবিউনি'র যে ব্যাপক অর্থ সাধারণ মুসলমান চরিত্রে তা পরিলক্ষিত হয় না। অথচ আয়াতের এই শব্দটি

সবচেয়ে বেশি তাৎপর্য ও অর্থ বহন করে ইহা সাধারণ মুসলমান চরিত্রে কার্যকর দেখা না যাওয়ার পেছনে যে কারণ রয়েছে তার সম্বন্ধে সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রাঃ) বলেছেন, "কোরানুল কারীমের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও তা প্রয়োগ কোন আলেমে জাহের কর্তৃক হয় না। আলেমে জাহের কর্তৃক যা হয় তা গোমরা সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েতের আলো বয়ে নিয়ে আসে না। তার কারণ আলেমে জাহেরগণ কোরানের ঐশী আলো নিজেদের জীবন চরিত্রে প্রতিফলন বা বাস্তবায়ন ঘটায় না।" তিনি আরো বলেন, "যে সকল আহলুল্লাহগণ তাদের মানবীয় জীবনের সামান্যকাল টুকুতে পলে পলে চরিত্রে বিশ্বাসে ও পালনে জাহের এর চেয়ে বাতেন ভাবে পালন করেছেন বেশি এবং কোরআনকে তাদের রগে ও রেশায় মিশ্রিত করে ফেলেছেন বিধায় তারাই প্রকৃত তফসীর।"

এ প্রসঙ্গে হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রাঃ) (যিনি বিশ্ববিখ্যাত তাজকেরাতুল আউলিয়া'র লিখক) বলেছেন, "কোরআনের তফসীর 'কুয়তে ছামা'র (শ্রবণেন্দ্রিয়) দ্বারা ইন্দ্রিয় গোচর না করে অলীআল্লাহগণের চাল-চলন কথা বার্তা, আহার-বিহার, আচার- আচরণ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হৃদয় নামক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারলে সে ব্যক্তি হেদায়েত ও রুশদের অধিকারী হয় এবং একদিন না একদিন সে অলীও হয়ে যায়।" যেমন: হযরত আবু ওসমান সাঈদ ইবনে সাম্মাক মাগরিবী (রাঃ) বলেন, "যে ব্যাক্তি আউলিয়া কেরামকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে একদিন সেও আউলিয়া শ্রেণী ভুক্ত হয়।"

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হযরত শায়খ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) কাঁটাবিল নিবাসী মরহুম মুন্সী আলতাফ আলী মগফুর সাহেবের দ্বিতীয় তনয় মরহুম মকছুদ আহমেদ মগফুর কে একদা বলেছিলেন, "মকছুদ তোর মধ্যে যেহেতু কোরআন, হাদীস, ফেকাহ, শরীয়ত এসবের এলেম নেই, আর এগুলি তুই না পড়তে জানস, না আমল জানছ। আমার কথা ও হুকুম গুলি যদি পালন করতে পারছ তাহলে তোর কোরআন হাদীস, ফেকাহ, শরীয়ত সব পালন হইয়া যাইব।" হযরত আবুল হাসান আলী খারকানী (রাঃ) বলেছেন, "এলেমের দুটি দিক আছে। একটি হল বাহিরের দিক এবং অপরটি হল অন্তরের দিক। বাহিরের দিক যা আলেমদের আলোচনা ও ওয়াজের বস্তু এবং অন্তরের দিক যার রহস্য তরিকত পন্থিদের অন্তরে সুরক্ষিত আছে। সাধারণ লোকদের সেখানে পৌঁছা সম্ভব নয়।" এখানে সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমা সম্পর্কে সুলতানুল আরেফীন হযরত বায়েজীদ বুস্তামী (রাঃ), হযরত আবুল হাসান আলী খারকানী (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ ইবনে সাম্মাক মাগরিবী (রাঃ), হযরত শায়খ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁদের সংশ্লিষ্ট উক্তিগুলো সন্নিবিষ্ট করলাম। আল কোরআনুল করীমের এ আয়াতে বিশ্বাস আনয়নকারী বান্দাগণকে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি মোতাওয়াজ্জুহ হওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হচ্ছে এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর পূর্ণ তাবেদারীর কথা বলা হয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর তাবেদারী করতে হলে প্রথম শর্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর উপর বিশ্বাস ও ভালবাসা একান্ত প্রয়োজন। চরম বিশ্বাস ও ভক্তি ব্যতিরেকে চরম ভালবাসা সম্ভব নয়। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে যিনি চরমভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করতে পেরেছেন, তিনি সাধারণ পর্যায়ে থাকেন না। তিনি আল্লাহর মাহবুব হয়ে যান। হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) রাসূল প্রেমে অত্যন্ত বিভোর থাকতেন। বলতে গেলে রাসূল প্রেম প্রদীপের উজ্জ্বল জ্যোতি হযরতকে এত বিমোহিত করে তুলতো যে মনে হতো তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রেমে পোড়া একটি পতঙ্গ। তাঁর বাংলা 'দরদে দিল' ও উর্দূ 'কাসিদায়ে সোবহান' এর প্রমাণ। তার দরদে দিল কাব্যগ্রন্থ হতে একটি কাসিদা নিম্নে উল্লেখ করলাম-

"মদদকুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।
মুহাম্মাদ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।

রাখ পদ তরী অঙ্গে, পড়েছি মোহ তরঙ্গে।
ডুবিল তরণী গঙ্গে, কাঁদিছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
হে চালক নুহমতি, তোমা বিনে নাহি গতি।
তোমাকে কান্ডারী রথী, করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
ত্বরাও এ পাপাচারে, পথভ্রষ্ট কামাচারে।
এই পাপ পারাবারে, ডুবেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
অকুল পাথারে পরি, টলমল করে তরী।
উপায় নাহিক হেরি, স্মরিছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
মদীনার স্বর্ণপুরী, হেরিতে বাসনা করি।
সর্ব দুনিয়া পরিহরি, বসেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
কি করি কাঞ্চন গিরি, কি করি মৃগ কস্তুরী।
হুরপরী তুচ্ছ করি, দিয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
তব প্রেমে যেই দিন, মজিয়াছে এই মন।
শোকে নিশি অবসান, করেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
অসার সংসার মাঝে, সন্যাসীর বেশ সেজে।
কত রাজ্য পদব্রজে, ভ্রমেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
কভু মোছলেম কারাগারে, কভু কাফের যমাগারে।
জিঞ্জির পায়েতে পরে, সয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।
মরুভূমে বালুরাশি, মত্তহাল উপবাসী।
কখনও শিবির বাসী, হয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ)।।

ফিরিয়াছি দ্বারে দ্বারে, কখনও পর্বত-শিরে ।
লতাপাতা অনাহারে, খেয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
তোমার মিলন আশে, এলোকেশে ভিক্ষুবেশে ।
কতজ্বালা দেশে দেশে, ভুগিছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
মরুভুমে বালুতাপে, কভু শীতে হিয়া কাঁপে ।
কাঁটা শয্যায় অনুতাপে, শুয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
মিটিলনা কোনখানে, মনসাধ আজীবনে ।
জানিনা কি লোভে বনে, ঘুরেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
আশা তরু শুষ্ক হয়ে, পড়িল পুষ্প ঝরিয়ে ।
শুধু কৃপা পানে চেয়ে, রয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
ভস্ম হল তন মন, কর বারি বিতরণ ।
তব পদে আবেদন, করিছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
নাহি শান্তি আজনমে, হতভাগা নরাধমে ।
অহঃরহঃ এ মরমে, জ্বলেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
জ্বালাইওনা ওহে পেয়ারে, সহে না আর অন্তরে ।
বহু জ্বালা জন্মভরে, সয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
তব আশে বনে বনে, পথে ঘাটে ও কাননে ।
বিরহ বেদন মনে, কেঁদেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
কেন যে লুকিয়ে রলে, কেন যে বিমুখ হলে ।
হায়! মোর পাপফলে, বুঝেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
ছবর আকল যারা, ছিল মোর সঙ্গী তারা ।
তোমা বিনে সর্বহারা হয়েছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
তুচ্ছ সুখে কায়মনে, ভজিব তোমারে ধ্যানে ।
মরে যাব প্রেমবাণে, এঁটেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।
তব ইচ্ছা ছোবহানে, দয়া কিংবা হান বাণে ।
তোমাকে জীবন প্রাণ, সঁপেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (দঃ) ।।"

হযরত কেবলাহর 'ক্বাসিদায়ে সোবহান এঁর আরেকটি ক্বাসিদার কয়েকটি লাইন উদৃতি দিচ্ছি-

"আয় সাল্লে আলা মাক্কী মাদানি আয় সাল্লে আলা মাক্কী মাদানী
পরওয়ানা বনি হায় মা ও মনি আয় শাময়ে শবে হার আঞ্জুমনি ।।
তোমহি সে হুয়া গুলশান কা যিয়া জাদু নযরি নারগিস নে সিখা
বুলবুল নে সিখা শিরিঁ সুখনি ফুলোনে সিখা নাজুক বদনি ।।

জব নাজ ও আদা তাকসিম হুয়া সব হুঁ সে পেয়ারা তোমকো দিয়া
ফের উদনু বোলা আল্লাহু গনি মুসা কো পুকারা লানতারানি।
একরার তেরা ঈমান হুয়া এনকার তেরা কুফরান হুয়া
ইযহার তেরা হায় পুর ফেতানি আয় কুফরে মনি ঈমান মনি।।"

অর্থাৎ- "হে মক্কা ও মদীনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আপনার সৌন্দর্যের উজ্জ্বল প্রদীপে সবাই পতঙ্গের ন্যায় দলে দলে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত। হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আপনার সৌন্দর্য বিভার বিকাশ থেকে সকল পুষ্পোদ্যানগুলো প্রাণ শক্তি আহরণ করে। আপনার অনবদ্য সৌন্দর্যময় জ্যোতি থেকে নারগিস ফুল ঐন্দ্রজালীয় রূপমাধূর্য অর্জন করে। বুলবুলি পাখিরা সুললিত সুখকর কণ্ঠস্বর আপনা হতে আহরণ করে। পুষ্পেরা আপনা হতেই কোমলমতি স্বভাব অর্জন করে। যখন প্রেমের ছলনা বন্টন করা হলো সকলের চাইতে প্রিয় ও আকর্ষনীয় গুণ আপনাকে দান করেছেন। পুনঃ আল্লাহ্ পাক আপনাকে কাছে ডাকলেন মুসা (আঃ) কে বললেন আমাকে দেখতে পাবে না। আপনাকে চরমভাবে ভক্তি করলে ঈমানদার হওয়া যায়। আর আপনাকে বে তাজিম করলে কাফের হয়ে যায়। সুতরাং আপনি ঈমানেরও কারণ কুফরেরও কারণ।"

হযরতের 'কাসিদায়ে সোবহানী'র মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রেমের আতিশয্য সহজেই ধরা পড়ে। তিনি আরও লিখেছেন-

হামারে দরদে কি দারমাঁ মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে
জিগার কা জখমে কা মারহাম মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে
ম্যায়ঁ তু নুরে নাবী ঠায়রে নাবী নূরে খোদা ঠায়রে
তোফায়েলে সরওয়ারে আলম ম্যায়ঁ ভি নূরে খোদা ঠায়রে।
কুঈ বান্দা নেহিঁ হক কা তোফায়েলি বান্দা হ্যায়ঁ হাম সব
খোদা কি এক বান্দা বাস মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে।।
ম্যায় তু বান্দা নেহিঁ আসলান হাকীকত মেঁ ওয়হ বান্দা হ্যায়ঁ।
হামারে বান্দা হোনেকা ওসিলা মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে।।
হুয়া জো আশেকে আহমদ বনে মাশুক আল্লাহ্ ওয়হ
খোদাখোদ উনপা হায় শায়দা ওয়হ মাহবুবে খোদা ঠায়রে।
নাযারাহ হো খোদা কি কব মুহাম্মাদ কি সেওয়া তোমকো
জু আয়িনা খোদা বিঁ বাস মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে।।
হোঁ উনকি নূরসে পয়দা বাতা জাহেদ তো কেয়া হোঁ ম্যায়
হামারি হার রগ ও রেশা মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে।
তোফায়েলি হোঁ মুহাম্মাদ কি সেওয়া উনকি নেহিঁ চারাহ
সাহারা তেরা আয় সোবহাঁ মুহাম্মাদ মোস্তফা ঠায়রে।।"

অর্থাৎ- আমার কলিজার ব্যথার প্রশমনে মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই অবলম্বন করি। আমার কলিজার জখমের মলম মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমেই আমি খোদাকে অবলম্বন করি।

খোদা তায়ালার একমাত্র প্রত্যক্ষ বান্দাহ মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেই অবলম্বন করি।।

আমি নূর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই অবলম্বন করি, নূর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমেই আমি খোদাকে অবলম্বন করি। সুতারাং নূর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমেই আমি খোদাকে অবলম্বন করি।

হক সোবহানু তায়ালার প্রত্যক্ষ বান্দাহ কেহই নহে, আমরা সকলে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পরোক্ষ বান্দাহ। খোদা তায়ালার একমাত্র প্রত্যক্ষ বান্দাহ মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই অবলম্বন করি।

খোদা তায়ালাই একমাত্র মাবুদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ই একমাত্র আব্‌দ। সুতরাং উভয় জগতে নবী মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেই নীরবে অবলম্বন করি।।

যিনি আহমদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রিয়ভাজন হতে পেরেছেন, তিনিই আল্লাহ্‌ আহাদের প্রেমিক হতে পেরেছেন। খোদা তায়ালা স্বয়ং যাঁর হয়ে গিয়েছেন, খোদা তায়ালার সেই বন্ধুকেই অবলম্বন করি।।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে ব্যতীত খোদাকে কি কেউ কখনও দেখেছে। অতএব, খোদাকে দেখতে হলে খোদার আয়না মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর দিকে তাকাতে হবে।।

তাঁর জ্যোতির অস্তিত্বে অস্তিত্ববান বা পয়দা হয়ে হে সাধক বলতো আমি কে হই? সুতারাং আমার সমস্ত শিরা উপশিরায় শুধু মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেই অবলম্বন করি।।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মাধ্যমে অস্তিত্ব ব্যতীত কেউ স্বতন্ত্র নয়। হে সোবহান মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ই তোমার সব কিছুর আশ্রয়স্থল।।

তিনি আবার আরেক জায়গায় বলেন:

"ফেদা হো মেরা দিল ব শওকে মুহাম্মাদ
না দিলসে জুদা হো ইয়ে যওকে মুহাম্মাদ (দঃ)।
আসিরে জানাবে হাবিবে খোদা হো
না টুটে গলোসে ইয়ে তওকে মুহাম্মাদ (দঃ)।

খোদা ইয়া এহি হ্যায় তামান্না হামারা
না হো ফের শেফা মরযে এস্কে মুহাম্মাদ (দঃ) ।
ব দীদারে হক হোগা দিলশাদ তেরা
করেগা তু সোবহাঁ জু মুশ্‌কে মুহাম্মাদ (দঃ) ।"

অর্থাৎ:- "মুহাম্মাদ (দঃ) নামের প্রীতি ব্যথা
মোর হৃদয় হতে যায় না ছুটে ।
আরতি মোর হে খোদার প্রিয় তোমার দারে
তোমার নামের ঐ ফলক যেন মোর গলা থেকে না টুটে ।
এই অভিলাষ তোমার নিকট হয় যে আমার হে খোদা
আমার হৃদির প্রেম ব্যাধি যেন লেগে থাকে সর্বদা ।
হক তায়ালার দেখা পেয়ে তৃপ্ত হবে তোমার মন
কর যদি হে সোবহান মুহাম্মাদ (দ:) নামের রোমন্থন ।

হযরত কুতুবে রাব্বানী শায়খ-উশ-শুয়ুখ সাইয়্যেদেনা মহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) যেমন সুন্দর করে বলেছেন, "মহাবীর সাহসী ছাড়া যেন ভীরুগণ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর সীমাহীন রসহ্যঘেরা পরম সুন্দর চির অম্লান, পবিত্র, অনাদি-অনন্ত প্রেমলীলা ভুমে অগ্রসর হওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস না করে ।" আমার প্রাণ প্রিয় সাহসী সাঁতারু মুর্শীদ পাক প্রথমে তাঁর পরম ভক্তি শুষমায়িত মুর্শীদ প্রবরের আঙ্গিনা পূর্ণ পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে কুতুবুল এরশাদের খাস্‌শানের মালিক গাউসূল আকবর (রাঃ) এঁর প্রেম মদিরার অর্ণবে অবগাহন করেন। এই অলীকুল শিরোমনীর পূর্ণ সম্মতি ও সহায়তায় মাকামে সাইয়্যেদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর অচিন্তনীয় অপরূপ রূপ মহাজলধির কিনারায় তাঁর তরী নোঙ্গর করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। আমার মুর্শীদ পাক, রাসূলে হক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রেম সৌন্দর্যের অকূল সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পরম তৃপ্তি সহকারে পান করেন শারাবান তহুরা এবং রাসূলে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মর্জি ও সাহায্যে 'সায়েরে আফাকী' উত্তোরণ, তারপর 'তওহীদে অজুদী'র সায়ের এবং উত্তোরণের পর 'সায়েরে আনফুসী' অতিক্রমণ। যার ব্যাখ্যা করা হয় 'ফানা'র দ্বারা অর্থাৎ 'আত্মনির্বান' দ্বারা। এরপর বাকা লাভের পর সাহেবে মাকাম নিজেকে 'আয়নে হক' হিসেবে দেখেন ও প্রাপ্ত হন। এ মর্মে হযরত শায়খ্ শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর কয়েকটি উক্তি তাঁর রচিত 'দরদে দেল' থেকে উদ্ধৃতি দিলাম-

"আমিত তোমার তুমিত আমার
তোমা হতে আমি জুদা কই ।
আমিত তোমাতে তুমিত আমাতে
আশে পাশে মিশামিশি রই ।।
আছ হে আমাতে আছি হে তোমাতে
জল বিম্বে বিম্বে জল হই ।
থাক হে আমাতে থাকি হে তোমাতে
সিন্ধু বিন্দে বিন্দু সিন্ধে হই ।।
প্রকাশে তোমার নশ্বর সংসার
ব্যক্ত প্রেম অভিলাষি হই ।
তুমি ব্যক্তে আমি আমি গুপ্তে তুমি
ব্যক্তে গুপ্তে তুমি আমি নই । ।
তুমিই আছিলে তুমিই হইলে
কে থাকিবে আর তুমি বই ।
অন্তিম হইতে অনন্ত ভরিয়া ।
একা তুমি বিদ্যমান সই ।।
এথা সোবহান হেথা তুমি জান
নাহি জানি আমি কিবা কই ।
কর বিতরণ প্রখর কিরণ
সূর্য্য মূখে রহি জ্যোতি হই ।।"

আলা হযরত কেবলাহ (রাঃ) উপরিউক্ত হাল বা অবস্থায় এসে উর্দু একটি শায়েরে বর্ণনা করে বলেন-

"মাইঁ তেরা জাঁ বনো
তু মেরা তন বনে ।
শাম্মায়ে মাহফিল বনো
গর তু রওগন বনে ।।"

অর্থাৎ- আমি হই যদি প্রিয়ের প্রাণ
সে যদি হয় মোর দেহ ।
জলসায় জ্বলবো প্রদীপ হয়ে
তৈল যদি হয় মোর প্রিয় ।

তিনি আর একটি উর্দু কাসিদায় বলেন-

নিকলে দম ইয়া রব হামারে আল্লাহ্ আল্লাহ্ কাহতে কাহতে ।
আল্লাহ্ আল্লাহ্ কাহতে কাহতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ কাহতে কাহতে ।।
মাইঁ তু সোবহাঁ চাহতা হুঁ সুলি পে জা চড়হো ইসদম ।
নাহনু আকরাব পড়তে পড়তে আল্লাহ্ আল্লাহ্ কাহতে কাহতে ।।

অর্থাৎ- হে প্রভু, যখন আমার প্রাণ বায়ু দেহ ছেড়ে বের করা হবে তখন শুধু আল্লাহ্ আল্লাহ্ উচ্চারণ করতে করতে যেন হয় ।

আমি সোবহান 'নাহনু আকরাব' পড়তে পড়তে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলতে বলতে নিজেই এখন শূলে গিয়ে চড়তে চাই ।

আলা হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এশকে এলাহীতে এত বিভোর থাকতেন যার প্রমাণ আমরা 'দরদে দেল' এর নিম্নোক্ত ক'টি লাইন থেকেও সহজে পাই । যেমন:

তিনি বলেন-

"আসন ধরে মন তলে ছেদন করে হা হা মূলে ।
হি হি বীজ রোপন কর হু হু বৃক্ষ উঠবে ফলে ।।
হু হু বৃক্ষ উঁচু হলে স্বর্গ যাবে মহীতলে ।
মর্ত্যবাসী ধ্বংস হবে তুমি যাবে আপন ভুলে ।।"

তিনি আরেকটি ক্বাসিদায় বলেন-

"তুমি আমি ভিন্ন নই যদ্যপি প্রভেদ এই ।
তুমি হে অসীম সিন্ধু আমি বিন্দু তব নীড়ে ।।"

তিনি আরেক জায়গায় বলেন,

"শোন সোবহান কই আমি এবে আমি নই ।
নিজ হতে মরে গিয়ে প্রিয়া সনে জীতা রই ।।"

হুজুর শাহ্ শেখ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর জান ও তন সোপর্দকরে রেয়াজত ও কসরতের ফলশ্রুতি সম্পর্কে আমরা হযরতের মাকামে উরূজের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত বক্তব্য পাই- 'মুকাশিফাতে আয়নিয়া' নামক কিতাবে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ) বলেন, "কামালতে নবুয়তের অধিকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টি যখন পরিপূর্ণ ভাবে সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জু হয় অর্থাৎ তাহারা এমন কি তাহাদের বাতেন হক সোবহানু তায়ালাকে দর্শন করতে থাকে এবং জাহের সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জু হয় অর্থাৎ তাহারা যখন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে সৃষ্টি জগতকে অবলোকন করেন, এমন কি তাহাদের বাতেন হক্ সোবহানু তায়ালাকে দর্শন করতে থাকে এবং জাহের সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জু থাকে, তাহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাতের সময়, তাদের দৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার প্রতি

নিবদ্ধ থাকে। আর সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টিপাতের সময় তাদের দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টিবস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এ সমস্ত বুজুর্গদের জন্য তাদের দৃষ্টি এভাবে দুই দিকে আবদ্ধ থাকে। অপর পক্ষে কামালতে বেলায়েতের অধিকারী ব্যক্তিদের অবস্থা ইহার ভিন্ন রূপ। কেননা তাদের বাতেন ও স্ব স্ব গোপন অবস্থার দিকে নিবদ্ধ থাকে, আর তাদের জাহের সৃষ্টি জগতের দিকে মোতায়াজ্জু থাকে। আর এই অবস্থাকে 'মাকামে তাকমীল' বলা হয়। আর এই শহুদ কে 'শহুদে হক' ও 'শহুদে খালকে'র একত্রকারী শহুদ বলা হয়। আর এই মাকাম হলো 'মাকামাতে বেলায়েত' ও দাওয়াতের পূর্ণ রূপ। যারা যে অবস্থার অধিকারী তাঁরা উহাতেই সন্তুষ্ট।"

হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ) আরো বলেন, "আল্লাহ্‌র ভাষায় এই অগ্রবর্তিদের মধ্যে হাজার হাজার আম্বিয়া (আঃ) ছিলেন আর ছিলেন তাদের লক্ষ লক্ষ আসহাব বা সাথী। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রিয় আসহাবগণও ইহাদের মধ্যে সামিল। যাদের সংখ্যা অনেক। আর পরবর্তী কম সংখ্যক লোকদের মধ্যে হযরত মেহেদী (আঃ) ও তার সাথী সঙ্গীগণ হইবেন, যারা আখেরী উম্মত হিসেবে এই দৌলতের অধিকারী হইবেন। এই সম্পর্কে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমি জানি না যে, আমার উম্মতের প্রথম অংশ উত্তম না শেষ অংশ।" নৈকট্য বা কোরবত প্রেমানলের অগ্নি পরীক্ষায় স্থাপিত। মাকামিয়াত অর্জন বা প্রদান কাজটি যোগ্যতা ভিত্তিক হয়ে থাকে যার স্বার্থে থাকে পরমদাতা দয়ালু আল্লাহর বিশেষ নাজ ও নেয়াজ।"

তিনি আরো বলেছেন, "সাইয়্যেদেনা রাসূলুর রাহমাত হযরত মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর রেসালতের উরূজ (ঊর্ধ্বগমনাগমন) করে তাকমীলের মাকামের নেহায়াতুন নেহায়ায় (সর্বশেষ সীমা) যিনি পৌঁছেছেন অর্থাৎ রেছালাতে নেহায়ায় পরিভ্রমণ দ্বারা মাকামা মাহমুদ থেকে হিস্‌সা লাভ করে বেলায়েতে খাসসা (আসল) পর্যন্ত পৌঁছে যান তারাই তৌহিদে অজুদী (সৃষ্ট জগত সূমহের একক বিকাশ) প্রাপ্ত হয়ে তৌহিদে শহুদির (অজড় জগত দর্শন) মাকাম ইনায়েত (কৃপাদান) প্রাপ্ত হন। আর এই দুই মাকামের জ্ঞান ও মারেফাত সম্পর্কে অভিহিত হন। আর তাওহীদে অজুদীর স্থান হলো সায়েরে (পরিভ্রমণ) আফাকী। ইহার সর্বশেষ সীমা হলো তওহীদে শহুদী। যার ব্যাখ্যা করা হয় ফানাহ'র দ্বারা। আর বাকা লাভের পর শুরু সায়েরে আনফুসী (প্রতি মুহূর্তে স্বীয় নফসের হিসাব কড়ায় গন্ডায় লওয়া)। যা তাজকিয়ায়ে নফস্‌ এর মাধ্যমে আরম্ভ হয়। সে অলী তখন নিজেকে 'আয়নে হক' হিসেবে প্রাপ্ত হন। এ ধরনের বুজর্গগণ কুতুবে ইরশাদ যিনি ফারদীয়াতের মাকামে কামালিয়াতের অধিকারী। এ ধরনের বুজুর্গগণ কোন মুরীদের প্রতি আন্তরিকতার সাথে দৃষ্টিপাত করলে সেই তাওয়াজ্জুহর দ্বারা মুরীদের

স্বীয় বিশুদ্ধতার উদ্দেশ্য ও মনোযোগ অনুযায়ী মহা সমুদ্রতুল্য বুর্জুগ এঁর কাছ থেকে ফায়েজ আহরণ করে পরিতৃপ্ত হন। এ ধরণের বুজুর্গ অলীগণের সঙ্গে যারা এখলাস ও মুহাব্বত রাখে তারা যদি আল্লাহ তালার জিকিরে সবসময় মশগুল নাও থাকে, তবুও তাদের প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বত থাকার কারনে রুশদ ও হেদায়েতের নূর প্রাপ্ত হন। সাইয়্যেদেনা খাতামুন্ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর উপর অবিরত দরূদ এবং অসংখ্য সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র বংশধরদের উপর।"

তাজকিয়ায়ে নফসের জন্য পূর্ব বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত শাহ্ সোবহান (রাঃ) রচিত 'মহাসমর' এবং আল্লাহ্ সোবাহানু তায়ালার প্রতি ফানা ও বাকার নিদর্শন স্বরূপ 'কাসিদায়ে সোবহান' ও 'দরদে দেল' নামক পুস্তক দ্বয় বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। উপরিউক্ত আয়িনায় হযরতের মাকামিয়াত সহজেই নির্ধারণযোগ্য। 'তাজকিয়ায়ে নফস' ও মাকামে উরূজ সম্পর্কে হযরত শাহ্ সোবহান (রাঃ) এঁর অবস্থা নিম্নোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুমেয়-

"শুন সোবহান কই আমি এবে আমি নই,
নিজ হতে মরে গিয়ে প্রিয়া সনে জীতা রই।।
নিজ হতে মরে গেনু তার সঙ্গে জীতা হনু,
মৃত্যু নাহি মোর আর অনন্তে অমর হই।।
মানবীয় প্রবৃত্তাদি করিলাম ত্যাগ যদি,
হক মোর চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ গেল হই।।
আমি যবে আমি নই এই দম হয় সেই,
এই দমের বিরোধী যে বিধর্মীতে গণ্য সেই।।
শৃগালের আবরণে সিংহ আছে এই বনে,
যাও নাহি তার পানে প্রাণে মারা যাবি তুই।।
প্রকাশ্যে শৃগাল সাজ অন্তরেতে পশুরাজ,
এই বেশে যাহা ঘোষে সিংহ ধ্বনি জান সেই।।"

তালেবে সুলুকের 'উরূজ' নিহায়া পযর্ন্ত গায়েবে জাতের সাথে বাকাপ্রাপ্ত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (রাঃ) এঁর মন্তব্য "জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্য হৃদয়ঙ্গম করা খুব দুরূহ বিষয়। সাধারণ মানুষের জন্য তো কথাই উঠে না"। হযরত শায়খ মখদুম শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) তাজকিয়ায়ে নফসের মালামিয়াত সম্পর্কে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি 'মহাসমর' গ্রন্থে লিখেছেন-

"পৃথিবীতে থাক যদি নফসের অধীন।
উঠিবে নফসের সঙ্গে হাশরের দিন।।
দোজখে যাইতে হইবে তাহার সহিত।
সময় থাকিতে কর ইহার বিহিত।।"

অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হয় যে, তার এ কথা 'মহাসমর' নামক অনন্য কিতাবে লিখা থাকলেও তা কতজন মুরীদ আমল এখতেয়ার করেন তা বিচার্য বিষয়। তিনি আরো বলেছেন-

"নিজ বুদ্ধি বলে মোরা চলিয়াছি বলে।
নিজের অস্তিত্ব পূজা করিছি সকলে।।
মোশরেক হয়েছি মোরা নিজেকে পূজিয়া।
আমিত্বের হার গলে রয়েছি পরিয়া।।"

আমাদের ধর্ম-কর্ম কি ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক আর সমষ্টিগত পর্যায়ে, আনুষ্ঠানিক ভাবেই হোক মনের গহিন কোণে, কোন বাহবা, প্রশংসা যাতে কারো প্রতি হিংসা বা অহংবোধ লুকিয়ে রেখে পোষণ করেছি কিনা তা খতিয়ে দেখার হুকুম কি আল্লাহ্ পাক কালামে বলে দেন নি? এ বিষয়ে স্রোতা বর্গের শতকরা এক ভাগের দায়িত্ব থাকলে বাকি ৯৯ ভাগ কিন্তু ধর্মীয় বক্তাগণের উপরই চরমভাবে বর্তায়। আমি এও জানি যে এ কথাগুলি অদৃশ্যভাবে লুকায়িত অহংকার যে সকল আদম সন্তানদের আছে তাদের নিকট একেবারে জহরবৎ মনে হবে। তাতে আমাদের করার কিছুই নেই। কারণ পাক কালামের নির্দিষ্ট ও সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমায় এবং আঁ-হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মধ্যে সত্য গোপন করা সম্পর্কে যা বক্তব্য আছে তা সর্বজন বিদীত। হযরত ইয়াহিয়া মায়াজ (রাঃ) বলেছেন, "সত্য কথা বলিতে যে জিহবাকে সংকুচিত করে সে বোবা দানব।"অহংকার, গর্ব, জেদ, রাগ, এ সকল 'রগবত' (কুস্বভাব) গুলি মানবের রগে রেশায় এমনভাবে থাকে যে তাকে ধরা বড়ই কঠিন। আলা হযরত কেবলাহ (রাঃ) 'মহাসমরে' এ সম্পর্কিত আরো লিখেছেন-

"কাল পিপীলীকা যেন কাল পাথরেতে।
তেমনি রিয়া শিং আসিল রণেতে।।"

আরেক জায়গায় তিনি বলেন-

"শেখ ইসলাম গুরু বহু গুণ ধরে
তাঁহার নিকটে যাও কর জোড় করে।।"

তিনি আরো বলেন-

"এ দেহ মন্দিরে বড় শত্রু আমিত্বের।
লুকিয়ে রয়েছে মোরা না রাখি খবর।।

আমিত্বের রোগ অতি হয় ভয়ঙ্কর ।
গুরু বৈদ্যরাজে তুমি ডাকহ সত্বর ।।
অনুসরণ করিলে সেই গুরুপদ ।
বিদূরিত হবে রোগ ঘুচিবে বিপদ ।।"

হযরত তাঁর 'মহাসমর' নামক গ্রন্থে স্বীয় নফস বা রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যেতে রণাঙ্গণের শেষ প্রান্তে এসে বলেন-

"ধরিব নফছকে কিম্বা, মরে যাব প্রাণে ।
কিরূপে দেখাব মুখ, রূহের ছামনে ।।
যথায় পলায় দুষ্টু, পিছে পিছে যাব ।
যাবৎ ধরিতে নারি, ঘরে না ফিরিব ।।
শুনিয়া ধার্ম্মিক সৈন্য, সিংহের গর্জ্জনে ।
ঘিরিয়া ফেলিল গিয়া, রিপু সৈন্যগণে ।।
নাশিবে সমূলে দস্যু, ভাবে মনে মনে ।
কোস্তার কতক পোস্তা, পড়িল জমিনে ।।
দেখিয়া নফছের সৈন্য ফাঁফর হইল ।
আত্ম সমর্পণ নফস্ কাতরে করিল ।।
বান্ধিয়া নফছকে আর তাহার লস্করে ।
পাঠাইয়া দিল সবে রূহ দরবারে ।।
শরা কারাগারে তারে করিল বন্ধন ।
গলদেশে তৌক দিল সাধন ভজন ।।
ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রস্তরাদি বুকেতে চাপিয়া ।
বন্দেগীর কম্বলেতে রাখে আবরিয়া ।।
সোবহান এ যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর ।
পীর পদে প্রাণ সঁপি সদা যুদ্ধ কর ।
যুদ্ধে জয়ী হলে পরে মাহবুব দীদার ।
নহেত সংসারে আসা হইল অসার ।।
চাও যদি নিজ মন দর্পণ করিতে ।
দশ চীজ দূর কর আপন হইতে ।।
লোভ, হিংসা, ক্রোধ, মিথ্যা, কীনা, অহংকার ।
বখিলি, গীবত, রীয়া, দুরাশাদি আর ।।"

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমি দেখতে পাই যে হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) রিপুর সাথে মহাযুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদে আকবরে একজন বিজয়ী বীর এবং তিনি তাঁর মাহবুব অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'য়ালার দিদার প্রাপ্ত একজন মহান অলী ।

দার্শনিক পর্যালোচনায় হযরতের কাবেলিয়াত

হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) একজন কুতুব- উন-নকীব মোকাম্মেল পীর। একজন কামেলে মোকাম্মেল পীর হওয়ার পেছনে বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকে। যেমনি কারণ নিহীত রয়েছে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের বেলায়। পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে, এর বয়স প্রায় নয় শত কোটি বৎসর। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায়, হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এই পৃথিবীতে মানব জাতির আগমনের সময় প্রায় বারো হাজার বছর। হযরত আদম (আঃ) হতে মানব সভ্যতার সমগ্রকালে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিশ্বাসের মান দন্ডে যে মহা মানবকে সবচেয়ে বেশি করুনাময়, ক্ষমতাশীল, প্রজ্ঞাময়, বিচক্ষণ ও সত্যদ্রষ্টা হিসেবে দেখতে পাই তিনি হলেন, ধুধু মরুর বুকে আগমন কারী চরম সুন্দর "মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম" নাম ওয়ালা অস্তিত্বকে। সৃষ্টির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষ সম্পদ্রায়। যা আজ সব দিক দিয়ে চরম সত্য। ধর্ম-দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতার দিশারী জ্যোতির্ময় মহামানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর আগমন এই পৃথিবীতে হওয়ার পরই এ সত্যটি সার্থক প্রমাণিত হয়েছে এবং সৃষ্টি ব্যাপি দেখতে পাই, তাঁর(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ক্ষমতার আধিপত্য। তাঁর পরবর্তী 'আল', 'আহাল' ও তাঁদের অনুসারীগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং ক্ষমতার কারণও তাঁরই প্রকাশ। ইতিহাস চষলে এই সত্যের জয়গান শুনা যায়।

পীরানেপীর দস্তেগীর, কুতুবে রাব্বানী, গাউসে সামদানী, গাউসুল আযম হযরত সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী শাইয়্যানলিল্লাহ (রাঃ) এঁর সম্ভ্রান্ত বংশধারা এবং দীক্ষাগুরু মুর্শিদের উর্ধ্বতন ব্যক্তিত্বের শক্তিশালী ধারার কারণে গাউসে যামান হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফি শায়খ-উল-ক্বোররা গাজী আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)ও স্বকীয়তায় জাজ্জ্বল্যমান। জন্মধারা, দীক্ষাগুরু মুর্শিদের উর্ধ্বতন ধারা এবং ব্যক্তিগত কঠোর সাধনা জীবন তাঁর সামগ্রীক ব্যক্তিসত্বাকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছে। আল্লাহ্ তাঁর ঐশী কার্যাবলির ঘোষনা এবং পরিচালনার জন্য 'নকীব' প্রেরণ করেন। 'নকীব' শব্দের আভিধানিক অর্থ- ঘোষনাকারী বা প্রধান দলপতি আল্লাহ্ তাঁদের উপর বিভিন্ন অঞ্চলের দায়িত্ব দিয়ে, অলিগণের পদমর্যাদার ঘোষনা, দায়িত্বের বন্টন ইত্যাদি সম্পাদন করান। মুর্শিদ কেবলাহও একজন আধ্যাত্মিক মহামানব হয়ে অন্যদেরকেও অলীর পদমর্যাদা দান করেছেন । যা পুস্তকের পরবর্তীতে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নকীব' এর আভিধানিক অর্থ ছাড়াও আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা, দায়-দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে হযরতের জীবন পর্যালোচনা করা হলে প্রতিয়মান হয় যে, তিনি ও একজন 'কুতুব উন্ নকীব' কামেলে মুকাম্মেল পীর।

এ মহান সাধক শাহ সুফী আবদুস সোবহান (রাঃ) এর পরিচয় প্রকাশের দিন-কাল- ক্ষণ বিশ্ব বিধাতা যেভাবে নির্ধারণ করেছেন, ঠিক সে ভাবেই হবে। পূর্ণ সন্তুষ্টি সহকারে আমরা সেই নির্ধারনের প্রতি রাজি আছি। ফলে আমাদের উদগ্রীব হওয়ার কোন কারণ নেই। যে কাজ যে কালে যে স্থানে যার দ্বারা সংগঠিত হবে তা মহাপরিকল্পনার পরিচালক পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এটা ঈমান-বিল-গায়েব। যা ব্যতীত মোমেন দাবি করা লজ্জাকর ও দাবিদার নিজ দাবিতে মিথ্যুক।

হযরতের গুণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর একজন ভক্ত ও আশেক জনাব লায়েক আলী খান (দীপক) কতইনা সুন্দরভাবে সত্য বলেছেন-

"হাতের তালুতে মাখলুক ছিল
পদতলে ছিল বসুন্ধরা,
পদ সেবায় লালায়িত ছিল
হুর গেলমান ও অপ্সরা।
আপন বিভায় আপনি অতুল
গাউসে পাকের নূরী কায়া,
জগত মাঝে সেই কায়ারই
তুমি ছিলে জ্যান্ত ছায়া।
খাজেগাঁ ও দস্তগীরীর
ক্ষমতায় ছিলে ক্ষমতাবান,
আবির্ভাব ও তিরোধানে
কেউ ছিলনা তব সমান।
মহাসমরের মহানায়ক
জেহাদ মাঝে গাজী অমর,
প্রেম কাননের হে বুলবুলি
কভু সেজেছ রসিক ভ্রমর।
'দরদে দিলের' বিমারীদের
তুমি যে মহাকবিরাজ,
দিলের যাতনা বুঝে শুনে
দিয়ে গেছ তার এলাজ।
প্রেম সাগরে হেসেছ খেলেছ
ভেসে চলেছ অবিরত,
ইচ্ছা হলেই ডুব সাঁতার
পানকৌড়ি পাখির মত।

বিরহে জ্বলেছ মিলনে মজেছ
থেকে প্রেমের কুঞ্জবনে,
দু'জনে দোঁহারে পেলে এক করে
সেথা নিভৃত আলাপনে।
ভাগলপুরের বন্দীশাহ আর
গাজীপুরের মহান গাজী,
দুয়ের একক রূপ হেরিনু
তোমার মাঝে আজি।
শাহে জিলানের সাধনার প্রতীক
আল-গাজ্জালীর জ্ঞান,
আবদের লেবাছ পরে
কে তুমি সোবহান?"

'গুরু' শব্দের ব্যাখ্যা

'গুরু' শব্দটি বাংলা শব্দ। ইংরেজীতে ইহাকে **ভারনাকুলার** বলে। মাতৃভাষা বাংলা প্রচলিত অঞ্চলে জাতীয় ভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এটা একটি ধর্মীয় পরিভাষার শব্দও বটে। আমার পরম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রণিপাতের মুর্শীদ প্রবর শায়খ্ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) 'গুরু' শব্দটি তাঁর রচিত 'দরদে দিল' ও 'মহাসমর' নামক অনবদ্য গ্রন্থদ্বয়ে ব্যবহার করেছেন বহু বার। 'দরদে দিল' হল হযরতের প্রেম গাঁথা বাংলা রচনা। আর 'মহাসমর' হল রিপু বা নফসের সাথে যুদ্ধ করার প্রক্রিয়া সম্বলিত পুস্তিকা। এই পুস্তিকা গুলিতে 'গুরু', 'গুরু বৈদ্যরাজ', 'প্রভু' 'হৃদয় মন্দির', 'দেহ মন্দির', 'গঙ্গাজল', 'গুরু মহামতি' এ ধরনের বহু শব্দরাজি তিনি ব্যবহার করেছেন। এ শব্দগুলি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণের ব্যবহৃত বিধায় প্রজ্ঞাশীল কোন মুসলমান মনীষী সাধক ব্যবহার করলে কেহ কিছু না বললেও (যেহেতু সেখানে কোন খেই পাওয়া যাবে না) কোন মুর্শীদভক্ত অনুসারী এ ভাষা ব্যবহার করলে স্বধর্মীয় অন্যান্যগণ চায়ের পেয়ালায় ঝড় তুলতে কাল বিলম্ব করেননা। সত্য জ্ঞানের অপ্রতুলতা এর জন্য দায়ী। সঠিক ধারণা না থাকার কারণে এ ধরণের স্পর্শকাতরতার আবেগে ধরাশায়ী হয়ে না বুঝে ঘটনার অপব্যাখ্যা দিয়ে অথবা মনগড়া অর্থ করে শুদ্ধ পরিবেশকে যেন বিকৃত না করেন এ মর্মে সংশ্লিষ্টদের প্রতি অনুরোধ রইল। এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারিমা ও হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মওজুদ আছে যা সকলেই জানেন বলে আমাদের ধারণা। এ ধরনের শব্দাবলী কেউ কোনদিন ব্যবহার করলে তা দেখে কারো চোখ কপালে তোলার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ইসলামে

অযৌক্তিক স্পর্শকাতরতার কোন স্থান নেই। কারণ গোলাপ জলকে গোলাপ পানি বললে এর গন্ধ, রং, রূপ ও কর্মগুণ একই থাকে।

গুরু বললে সম্যক গুরুকে বোঝায়। সম্যক অর্থাৎ স-ম্-ম-ক।

সম্যক এর আক্ষরিক ব্যাখ্যা হলো-

স- সর্বদা

ম- মন

ম- মস্তিস্ক

ক- কলুষমুক্ত, কালিমামুক্ত, কলঙ্কমুক্ত।

আর 'গুরু' শব্দের আক্ষরিক ব্যাখ্যা হলো গুণের রক্ষক। অতএব সবমিলে 'সম্মক (সম্যক) গুরু'র অর্থ দাঁড়ালো সর্বদা মন, মগজ বা মস্তিষ্ককে দুনিয়ার সৃষ্ট বস্তুর প্রতি(স্রষ্টাকে ভূলে গিয়ে) মোহাবিষ্টতার কলুষতা, কালিমা, কলঙ্ক থেকে মুক্ত রেখে এ সকল গুণকে যিনি রক্ষা করে চলেন তাঁকেই 'সম্যক গুরু' বলে।

'সম্যক গুরু' একজন সত্যদ্রষ্টা। যে কেউই সত্য দ্রষ্টা নন। মানুষ সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত-

প্রথম শ্রেণী: সাধারণ পর্যায়ের লোক যারা সত্য সম্পর্কে জ্ঞানহীন। অর্থাৎ এদের জ্ঞান চক্ষু নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণী: যারা সত্যকে চিনেন, জানেন, দেখেন কিন্তু এতটুকু পর্যন্তই শেষ।

তৃতীয় শ্রেণী: যারা সত্যকে চিনেন, জানেন, দেখেন ও অন্যকে দেখিয়ে দিতে পারেন এবং তাঁদেরকেই 'সম্যক গুরু' অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা বলে। যাকে আমরা কামেল মুর্শিদ বলি।

একজন সত্যদ্রষ্টা সম্যক গুরুর চরণযুগলে ভক্ত তার সকল কিছু উৎসর্গ করে দিয়ে 'গুরুর' (মুর্শীদের) সকল রীতিনীতি সর্বান্তকরণ করে চললেই চরম ভক্ত হওয়া যায়। হযরত মুর্শীদ কেবলাহ যেহেতু ঐ সকল শব্দাবলী চয়ন করেছেন এবং ব্যবহার করেছেন, তাই আমরাও কখনও কখনও কোন কোন স্থানে প্রয়োজনে এ সকল বাংলা শব্দাবলী ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হলাম এবং এটাই আমাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতাবে প্রথম দায়িত্ব।

লেখকের হৃদয় চোখে মুর্শীদ

হযরত শায়খ্ মখদুম শাহ্ আবদুস সোবহান আল-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর ন্যায় জামানার একজন উৎকৃষ্ট হাদী ও তরিকতের আলোক বর্তিকার গুণ মুগ্ধতায় আমার বলতে ইচ্ছে হয়- "কে এই মহান তাপস প্রবর 'আরেফে রাব্বানী'?

তিনি আর কেহ নন, তিনি আমার প্রেম, ধ্যাণের সনম (প্রতিমূর্তি), তিনিই আমার হৃদিপদ্মের রাজাধিরাজ, তিনিই তো আমার দৃষ্টিশক্তি, তিনি যে আমার অন্তরের

অমানিশায় ষোলকলার পূর্ণ শশী, তিনি আমার নিরাশার নিঝুম নাগমার (সঙ্গীত) আশার সুর দানকারী, আমার এত নিকটের যে, কোরানুল করিমের ভাষায়, "নাহনু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলিল ওয়ারিদ।" তিনি আমার নূরে নজর, তিনি আমার অচেনা পথের আলোক বর্তিকা, তিনি আমার বিপদ ঘেরা পথ চলার সাথী, তিনি আমার ভয়ের অঙ্গনে দুর্দম সাহস। তিনি আমার সুখ কিংবা দুঃখ, হাসি কিংবা কান্না। তিনি আমার মুছা-ঈসা-আইয়ুব নবীর নামের সঙ্গীতের সুরকার, তিনি পরম ও চরম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মোহ্তারমের অথৈ নূরের প্রেম বহ্নি শিখার একটি পোড়াপতঙ্গ। তিনি আল্লাহ্ অসীমের প্রেম সমুদ্রের একজন সুদক্ষ সাঁতারু, তিনি খোলাফায়ে চাহরানের সত্য সাক্ষী, তিনি মাওলা আলীর অতি প্রিতম, তিনি সাইয়্যেদা তাহেরা জোহরা হুমায়রার (রাঃ) সোহাগের পুতুলী। তিনি হাসনাইনের (রাঃ) শোক গাঁথার নূহ (অতিশয় ক্রন্দনকারী)। তিনি মা খাদিজা-সিদ্দিকার (রাঃ) যোগ্য তসলিমকারী। তিনি আহলে বাইতের পরিচয় দানকারী। তিনি মাহবুবে সোবহানী, কুতুবে রাব্বানী, গাউসুল ওয়ারাহ, গাউসুল আজমুচ্ছাকালাইন (রাঃ) এঁর আলোক পুত্র ও তাঁর কদম পাকে আমাকে সমর্পনকারী ও স্বীকারোক্তি আদায়কারী। তিনি আমার বাহরুল উলুম আল গাজ্জালির জ্ঞান ভান্ডার। তিনি আমার খাজেগার খাজিনা, তিনি আমার শাহ্ জালালের প্রতিনিধি, তিনি যে আমার ভাগলপুরের এবং গাজীপুরের গুপ্ত মহারথী। ইনিই তিনি যিনি আমার মুর্শীদ মাওলা অলীয়ে কামেল গাউসে যামান, দরবেশে হাক্কানী পীরে মুহাক্কেকিন, ফানাহ-কানায়াত-ইয়াকীন-রাজার ফকির, শায়খুল মাশায়েখ, হাজীউল হারামায়েনাশ শারীফাইন, শায়খুল ক্বোররাহ, সানাদেনা, কেবলাহতানা শাহ্ সুফী আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)।

একজন ভক্তের প্রণতিপত্র

একজন মুরীদ যখন তার মহামতি মুর্শীদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্য দেখার পর বিমোহিত হয়ে মুরীদের তনু-মন মুর্শীদের প্রতি নৈবদ্য হয়, অর্থাৎ- ফিদা হয়ে যায়। তখন স্বল্প বিচ্ছেদও ভক্তি নিষিক্ত মুরীদকে ব্যতিব্যস্ত করে ফেলে। তখন মুরীদ তার মুর্শীদের বরাবর মানসিক অবস্থা লিখে হৃদয়ের আনচান প্রশমিত করতে চায়।

অতএব, আমি (লিখক) এমতাবস্থায় আমার মুর্শীদে বরহক হযরত শাহ সুফি শায়খ উল ক্বোররা গাউসে যামান আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কে স্মরণ করে 'ভক্তের' পত্র হিসাবে উপস্থাপন করলাম। এ থেকে মানবের আত্মিক অবস্থার কিঞ্চিত সম্পর্ক কেউ স্থাপন করতে পারলে আমার এ শ্রম কাজে এসেছে মনে করব।

পত্র

'কাহাফ'
গুহা নং-১
অনন্তপুর, ঢাকা।
১২-১২-৭৮৬ ঈসায়ী

শ্রীচরণেষু,

আমার ভক্তি নিষিক্ত বিনীত শ্রদ্ধা তোমার শ্রীচরণে দিলাম। তোমাকে অশান্তপুর থেকে এর পূর্বে গত ১৬-৬-৭৭৫ খ্রিঃ একটি পত্র লিখেছিলাম। মনে হয় মানসিক ইথার বিভাগের যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে তোমার উত্তর আমার নিকট পৌঁছেনি। তোমার দেয়া নির্দেশ মতো আমি বসুন্ধরার সকল স্থানে চরম সুন্দর পরমকে তালাশ করেছি। কিন্তু কোথাও না পেয়ে সুদীর্ঘ আঠারো মাস পথে পথে ঘুরে আহারে অর্ধাহারে পরিশেষে অনাহারে কাহারও কোন নিরাশ্রয়ে উন্মুক্ত পথে-প্রান্তরে কালাতিপাত করেছি। কিন্তু তাঁকে পাইনি। এ ঘুরাফেরার মধ্যে ব্রহ্মান্ডে যা দেখলাম তা শুধু স্রষ্টার সৃষ্টি বান্দাহদের চাতুরী নৈপুন্য হরেক রকমের খেলা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে মানুষ যে কাজ কারবার চালাচ্ছে তা দেখে মনে হলো অনেক সময় কোন কোন বিষয়ে জগতের পশুকেও এরা হার মানিয়েছে। এ সকল মানুষ নামের লেবেলধারীগণ একই জাত-গোত্রীয় হয়েও সারাক্ষণ শুধু বৈরিতার বিশৃংখলায় মেতে আছে। স্বার্থান্ধতা, চরিত্রহীনতা, হত্যাযজ্ঞ, ঝগড়া, ফ্যাসাদ, নির্মম নিষ্ঠুরতায় অহর্নিশ মেতে আছে। এক স্থানে দেখলাম ভয়ঙ্কর কৃষ্ণ বিষধর ফণীরা এই মানবনামীয় লেবেলধারীদের সাক্ষাতে আসলেই মাথা নিচু করে আপন গর্তে ঢুকে যায়। এসব অঞ্চলে বাসুকীরাও অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চলাফেরা করে। এতদর্শনে আমি বিচলিত হয়ে ভাবতে শুরু করি যে, বিধাতা এদের একটি দাঁতের মধ্যেইতো বিষ নামক চরম মারনাস্ত্রে সুসজ্জিত করে রেখেছেন। তবে কেন এরা অস্ত্রের সদ্ব্যবহার করে না। আমি সাহস সহকারে একটি বাসুকীকে এ ভয় বিহবলতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা বলল, "এ মানুষ নামধারীগণ একটু থুথু ফেললে এবং থুথু আমাদের গায়ে পড়লে আমাদেরকেও বিষে ধরবে।" এ সকল জগতবাসীদের অধিকাংশকেই দেখলাম, তারা কেউই কোন কিছুতেই পরিতৃপ্ত নয়, কোন কিছুতেই বিশ্বস্ত নয়, কারো প্রতি সশ্রদ্ধ নয়, কোন কিছুতেই সহিষ্ণু নয়, কোন অবস্থাতেই শান্ত নয়, কোন ক্ষণেই সুন্দর নয়, কোন কালের প্রতিও অভিজ্ঞ নয়। সৃষ্টির অন্য কেউ এদের নিকট এসে একটু সমাদর সহানুভূতি পায় না বলে অভিযোগ করেছিল আমার নিকট। তখন আমি একটি মহাসমুদ্রের পাড়ে অবস্থিত একটি পর্বত শিখড়ে অবস্থান করছিলাম। বসুন্ধরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত

পর্যন্ত বাদশা জুলকারনাইনের ন্যায় ভ্রমেছি। অতিব সাহস করে জনৈক লেবেলধারীকে বিনম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম- ভাই আপনারা কারা? কোত্থেকে এসেছেন এবং কেই বা পাঠিয়েছেন আপনাদেরকে। কি জন্যইবা এসেছেন এখানে এবং যে কর্তা আপনাদেরকে বিশেষ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন তা সমাপ্ত করেছেন কি? পুন: বললাম-ভাই আপনাদের কথানুসারে যে কর্তা এখানে সবকিছু দিয়ে পাঠিয়েছেন বলে বললেন তার নিকট ফিরে গিয়ে কাজ উদ্ধার করতে না পারলে তার নিকট থেকে বয়ে নিয়ে আসা ১৬ আনা কি করে ফেরত দিবেন? এ কথা কি একবারও ভেবেছেন? স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে তার সৃষ্টি বস্তুর প্রতি যেভাবে মোহাবিষ্ট হয়ে মন ও মস্তিষ্ককে সার্বক্ষণিক স্মরণে মেতে আছেন এটাই তো গাইরুল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার শিরক বা অংশীবাদীতা করে চলছেন। মন ও মগজ থেকে জড় সৃষ্টির যাবতীয় সকল কিছু ঝেড়ে মুছে ফেলে দেয়ার নামই তো তাওহীদ বা একত্ববাদ। এ সম্পর্কে আপনারা ভেবেছেন কি? আমার প্রশ্ন কটি শুনে জনৈক লেবেলধারী তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম।

শ্রীভাজণেষু, তোমার দেয়া পথ নির্দেশ অনুযায়ী ক্লান্ত শ্রান্ত, অর্ধাহারে- অনাহারে, কখনো বৃষ্টি আবার কখনো প্রবল তপন তাপে, আবার কভু প্রচন্ড হিয়া কাঁপানো শীতে, কখনো মরু প্রান্তরে, আবার কখনো পর্বত শীখরে ঘুরতে ঘুরতে নদী-সমুদ্রের দ্বীপাঞ্চলে আবার কখনো ঘনকালো তমশায় এবং চোখ ঝলসানো দিবাকরে শুধু তোমার পথ নির্দেশনায় সনাক্ত করা স্থানের সন্ধানে এবং সে এলাকার অতি বিরল সংখ্যক ভাগ্যবান মানুষের সুন্দর মনো মুগ্ধকর পরিবেশের সন্ধান পেতে পদব্রাজনা করে চলেছিলাম আমি এ সুদীর্ঘ আঠারো মাস। বসুন্ধরার বিশ্রামাগার নামক আমার জড় জগতের বাড়ি থেকে এই আঠারো মাসের যাত্রার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে আংগুলে গোনা কিছু সংখ্যক লোক সহ সৃষ্টির জড় পদার্থ এবং অন্যান্য জীব জানোয়ার সকলেই আমার প্রতি বিধাতার দ্বীনি নিয়মে যার পর নাই সুহৃদ আচরণ দ্বারা আমাকে বড়ই দুর্বল করে ফেলেছে। শুধু কোটি কোটি সংখ্যক মানুষ নামের তথা কথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদারগণ ব্যতীত। সুহৃদ আচরণ প্রদর্শনকারীদেরকে আমি শুভেচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বিনিময় দিতে পারিনি নিঃস্ব পথিক হিসেবে। আমার ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার কারণে তোমার আশির্বাদকে সম্বল করে চিরসুন্দর ও চিরসত্যের পরম চিরঞ্জীবকে খুঁজতে খুঁজতে হাঠৎ এমন এক স্থানের সন্নিকটে যেতেই আমার তনু-মন সুশীতল অনুভব করলাম। স্বর্গীয় সুবাসে এলাকাটি মোহিত। দিবা-রজনীর অবস্থা সেখানে কোনটাই না চোখ ঝলসানো না তিমিরাচ্ছন্ন। সোনালী ও রূপালী রঙ্গের সংমিশ্রণের

আভায় যেন পূর্ণ গোধুলি লগ্ন। কোলাহল, স্বার্থান্ধতা, পাষাণ প্রবণতা, জরা-ব্যাধি, মৃত্যু, অভিযোগ সর্বোপরি জ্ঞানহীনতার কালো গহবরের বীভৎস দৃশ্য এসকল আবিলতা থেকে এলাকাটি সম্পূর্ন মুক্ত, চির সুসংরক্ষিত। এখানের মানুষগুলোকে আবিষ্কার করলাম দুর্ভেদ্য পাহাড় ঘেরা গুহার ন্যায় অবস্থায়। গুহা বা এলাকার অধিবাসীদের সাথে আমার পরিচয় হয়ে গেল। আত্মায় আত্মায় মিল ঘটে গেল। আমার হৃদয় রঙ্গের সঙ্গে তাঁদের হৃদয় রঙ্গের পূর্ণ মিলন ঘটে গেল। শত্রুতা, স্বার্থান্ধতা, আত্মদাম্ভিকতা অহংপূজার কোনটাই নেই। এদের দেখলাম চির সত্য সুন্দরকে পাবার সাধনাই এখানে চলছে নিরবে-নিভৃতে সঙ্গোপনে। জড় জগতের কোটি মানুষের সঙ্গে এদের অহর্নিশ চলাফেরা হলেও এ অল্প সংখ্যক কে দুনিয়াবাসীরা সনাক্ত করতে পারছে না যে এদের কর্ম ও লক্ষ্য কোথায় নিবদ্ধ? আমি রিপুর মোহ মাৎসর্য্য গুলো অতি কষ্টে পরিত্যাগ করে কোটি কোটি সংখ্যক বস্তু নির্ভরশীল দুনিয়াবাসী তথা আহলে দুনিয়াদারদের পরিবর্তে এই অল্প সংখ্যকের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করেছি। 'আহলে দুনিয়া' দের পরিত্যাগ করে পরিশেষে দেখলাম আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। দৃষ্টি আমার খুলে গেছে। নিঃশব্দের জগতের আনাগোনা, কর্মকান্ড, চলাফেরা আমি যেন অবলোকন করছি। ইথার জগত থেকে সংবাদাদি আদান প্রদান করা হচ্ছে আমার নিকট। এ এলাকার অধিবাসীদের পরিচয় সংগ্রহে জানলাম এঁরা 'চরম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ' এঁর আদর্শ অনুযায়ী জ্যোতি বা আলোর সন্তান। আরবিতে যাকে 'আলে মীম' বলা হয়। আমার এ দীর্ঘ পদব্রাজনার আঠারো মাসের পুঞ্জিভুত অভিজ্ঞতায় এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে এক কথায় সৃষ্টিজগতে তোমার চেয়ে অধিক সুন্দর, অতি প্রিতম, সত্যের ধ্বজাধারী, সকল বিপদ ও সকল আনন্দের সাথী হিসেবে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে পাইনি। তুমি ছাড়া আমার হৃদিনগরের আর কে ই বা আছে। আমার সকল সফলতা ও সুখ্যাতি, গুণমুগ্ধতার সকল ভেরীনিনাদ একমাত্র তোমার ন্যায় সুযোগ্য পথিকৃতেরই প্রাপ্য। সকল সুন্দর, সকল প্রশংসার সংজ্ঞা সহ এ জড়জগতে অবস্থানরত থেকে আমি যা আহরণ করছি সবকিছু তোমার বেদীমূলে ঢেলে দিচ্ছি, এগুলি তোমারই প্রাপ্য। সত্যিই তুমিই তুমি!

তোমার পূত চরণ সেবাদাস,
'আলমুনকিয মিনাজজালাল'
(অর্থ-একটি সন্ধানী আত্মার স্বীকাররোক্তি)

মুরীদগণকে নফস দমনের শিক্ষা দান

একদিন হযরত শাহ্ সুফি আবদুস সোবহান (রাঃ) তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট মুরীদ মৌলভী আব্দুল মান্নান সাহেবের আবেদনক্রমে তার বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করেন। জনাব মান্নান সাহেব তার সাধ্য মতো বিভিন্ন প্রকারের সু-স্বাদু খাদ্যের ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন আলোচনা করার পর সবার সম্মুখে খাদ্য পরিবেশন করা হল। সবাই সু-স্বাদু খাদ্যগুলো সামনে রেখে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছিলেন, মুর্শীদ কেবলাহ পাত্র থেকে নিয়ে খাওয়া শুরু করলে তারাও মজা করে খেতে পারবেন। বর্ণনাকারীর ভাষায়-

"সে পরিস্থিতিতে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পাচক রস অত্যন্ত নাচানাচি করতেছিলো।" খাবারগুলি সব এনে সাজিয়ে রাখার পরও হযরত মুর্শীদ কেবলাহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মজাদার খাবারগুলো সামনে, পেটে ক্ষুধা অথচ হুজুর খাবার শুরু না করলে যে কেউ খাবার আরম্ভ করতে পারছে না। হযরত পরিস্থিতি বুঝে খাবার শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং ঠান্ডা পানি চাইলেন। হযরত কেবলাহ পানি হাতে নিয়ে প্রত্যেকটি সু-স্বাদু খাদ্যের মধ্যে কিছু কিছু করে পানি ঢেলে দিলেন। অপেক্ষারত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা মুর্শীদ কেবলাহর এই ঘটনার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। ভেবেছিলাম মজা করে খাব, তাকিয়ে দেখি পানিতে ঘি এ ভাজা বড় বড় কৈ মাছ, গলদা চিংড়ি, বড় মাছের টুকরা, মুরগী ভুনা ইত্যাদির উপর ঘি টলমল করে ভাসছে। হযরত কেবলাহ কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে, নিজে কিছু খাবার নিলেন এবং মুরীদগণকেও খাবার খেতে বললেন। খাওয়ার শেষে একজন মুরীদ বিনীতভাবে নিবেদন করে খাবারে পানি ঢালার কারণটা জানতে চাইলো। হযরত কেবলাহ উত্তরে বললেন, "মিয়া খাদ্যের স্বাদ কমানোর জন্য এটা করেছি। তোমাদের খাওয়াটা হলো কথা, লজ্জতপরস্থি (রিপুকে তুষ্ট) করে খেতে হবে এমনতো কোন কথা নেই। তাছাড়া সমস্ত সুফিগণের সাধনার উল্লেখযোগ্য বিশেষ দিক হল জীবন রক্ষার জন্য খাদ্য খেতে হবে, রিপুর আস্বাদনের জন্য নয়। তোমরা এ ক্ষণিক সময়ে রিপুর সাথে যে যুদ্ধ করেছো এর ফলে তোমরা পুলসিরাতের হাজার বছরের রাস্তা অতিক্রম করেছ।" উক্ত ঘটনা থেকে হযরত কেবলাহর সুক্ষ্ম দার্শনিক জ্ঞানের সামান্য পরিচয়ের অংশ বিশেষ স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেছে। মানবের নরকের বন্ধন মুক্তির জন্য প্রথম শর্তই হলো 'নফস বা রিপুর উপর বিজয় অর্জন' অর্থাৎ 'তাযকিয়ায়ে নফস' যা অত্যন্ত কঠিন ও দূরূহ কাজ। হযরত কেবলাহ তাঁর দর্শন ও প্রজ্ঞার জ্যোতি থেকে অত্যন্ত সহজভাবে উপরোক্ত ঘটনায় তাঁর মুরীদগণকে 'তাযকিয়ায়ে নফস' এর আংশিক পালন ও শিক্ষায় আলোকিত করলেন। একজন সত্য দ্রষ্টা মুর্শীদ (মুর্শীদে বরহক) এর বৈশিষ্ট কি এটা নয়?

১১ শরীফে উপস্থিত হওয়ার গুরুত্ব

শায়খ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর মুরীদগণকে সুলতানুল আউলিয়া সাইয়্যেদেনা হুজুর গাউসে পাক (রাঃ) এঁর ১১ শরীফের মর্যাদা ও মর্তবার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপের তাগিদ দিতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "মহাপবিত্র গেয়ারভী শরীফের বরকত ওরছ শরীফ হইতেও অনেক বেশী।"

ছাওয়ালপুর নিবাসি হযরত কেবলাহর মুরীদ জনাব আহমাদুল হক প্রকাশ্যে চুন্নু মামু পুলিশে চাকরি করতেন। তিনি একবার আরবী রবিউসসানী মাসের ১১ শরীফের (ফাতেহায়ে ইয়াযদহম) কিছুদিন পর বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ওরস শরীফে উপস্থিত হলেন। হযরত কেবলাহর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," তুই গত ১১ শরীফের মাহফিলে আসলিনা কেন?" চুন্নু মামু উত্তরে বললেন," হুজুর, পুলিশের চাকরি বৎসরে একবারই ছুটি নিতে পারি। সেই ছুটিটা আমি বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ওরসে আসার জন্য নিয়েছি।" শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বললেন," যেহেতু একবারই ছুটি নিতে পারস, তোর ওরস শরীফে আসার দরকার নাই। ছুটি নিয়া ১১ শরীফের মাহফিলে আসবি।"

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কর্তৃক ১১ শরীফের প্রতি এরূপ গুরুত্বারোপের ফলে তাঁর অনেক মুরীদই শাহপুর দরবাওে ১১ শরীফের মাহফিলে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য হলেন কচুয়ার মুড়াগাঁও নিবাসি জনাব হাবিবুল্লাহ খলিফা। তিনি হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট মুরীদ হওয়ার পর থেকে দীর্ঘ ৬৫ (পয়ষট্টি) বৎসরেরও বেশী শাহপুর দরবারে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম ও মাসিক ১১ শরীফের মাহফিলে কখনই অনুপস্থিত থাকেননি। ঝড়, বৃষ্টি, ঠান্ডা, প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক দুর্যোগ, রোগ-শোক, পারিবারিক অসুবিধা ইত্যাদি তাঁর বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। প্রাকৃতিক, রাজনেতিক বা অন্য কোন কারনে যান বাহন না পেলেও অনেক বার তিনি তাঁর বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে ১১ শরীফের মাহফিলে হাজির হয়েছেন।

মুরীদ হওয়ার উদ্দেশ্যে পীরকে পরীক্ষা

কুমিল্লা শহরতলিস্থ ডুমুরিয়া চাঁনপুর গ্রামের খন্দকার বাড়ীর স্বনামধন্য হযরত আবিদ আলী খন্দকার (রাঃ) হযরত আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট মুরীদ হবেন কিনা এ নিয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন। কারন তিনি হযরতের সমসাময়িক এবং একই গ্রামের বাসিন্দা। তাছাড়া তার মধ্যে কিছুটা আত্মম্ভরীতাও ছিল। তিনি দেখলেন বিভিন্ন দুর দূরান্ত থেকে এবং গ্রাম থেকে

অনেক লোক তাঁর কাছে মুরীদ হচ্ছে। এটা তাকে মুরীদ হওয়ার জন্য অনুপ্রানিত করছিল। আবার উপরোক্ত কারনে মুরীদ হতে পারছিলেন না। তার এই মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, শাহ্ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ), শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এবং তিনি ছাওয়ালপুর পুকুরের পারে উপস্থিত আছেন। তারা সবাই কোন এক জায়গায় সফরে যাচ্ছিলেন। শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ), হযরত গাজীপুরী (রাঃ) এঁর সফর সামান কাঁধে নিলেন এবং হযরত শাহ্ সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর সফর সামান খন্দকার সাহেব নিজ কাঁধে নিলেন। এরপর তাঁরা মসজিদে যেয়ে হযরত গাজীপুরী (রাঃ) এঁর ইমামতিতে নামায আদায় করেন। এ অবস্থায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি খুব চিন্তায় পড়লেন যে এটা কি দেখলেন। তার পেরেশানি আরো বেড়ে গেল। এর পর তিনি ভাবলেন যে মুরীদ হওয়ার আগে হযরতকে একটু পরীক্ষা করা দরকার। তাই এক জুম্মার দিনে মনে মনে ঠিক করলেন আজ জুম্মার নামাযের সময় যদি হরযত শেষ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল কাউসার পড়েন তাহলে বুঝবো তিনি একজন কামেল পীর। জুম্মার নামাযের সময় খন্দকার সাহেব মসজিদে গেলেন। যথাসময়ে খুতবা পাঠের পর নামায আরম্ভ হল। প্রথম রাকাত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় রাকাত যখন শুরু হলো তখন খন্দকার সাহেবের বুক দুরু দুরু করছে। কি জানি কি হয়। তারপর যখন সূরা ফাতিহার পর সূরা কাউসার পড়া হলো তখন খন্দকার সাহেবের পেরেশানি দূর হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন হযরত সত্যিই একজন সত্য দ্রষ্টা কামেল মুর্শিদ। নামায শেষ করার পর হযরত কেবলাহ আবিদ আলী খন্দকার সাহেব কে ডেকে বললেন,"কি আবিদ আলী মিঞা পাইছনি তুমি যা চাইছ?" তিনি বললেন," জ্বি হুজুর।" হযরত আরো বললেন, "আবিদ মিয়া আমি যদি এই সূরাটি না পড়তাম তাহলে তোমার মনের অবস্থা কি হত ?" তারপর বললেন, "আল্লাহ্র অলিরা যদি ধরা দিতে না চান তাহলে তাদেরকে ধরা এত সহজ নয়।" যাই হোক এরপর খন্দকার সাহেব হযরত কেবলার নিকট মুরীদ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলে হযরত কেবলা তাঁকে মুরীদ করে নেন।

জনৈক অলীয়ে কামেলকে আব্রুআয়ন ও কুতুবীয়াত প্রদান

আত্মনির্বাণ পর্যায়ে এসে তৌহিদের সাগরে সালেক হাবুডুবু খেতে থাকে, তখন তাঁদের হাল 'মস্তে মনসুরী'র পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তখন কোন কোন সালেক নিজের সত্বার দিকে একেবারে উদাসীন হয়ে যান। আহার-বিহার, ভাল-মন্দ, ভুত-ভবিষ্যৎ

কোন কিছুর প্রয়োজন অনুভূত হয় না। তাঁদের অনেকেই এমতাবস্থায় বিবস্ত্র থাকেন যা অতি স্বাভাবিক।

এমন মত্তহাল বিবস্ত্রাবস্থায় একজন মহান অলীয়ে কামেল যার মহান নাম সুখ্যাতি সমগ্র দেশে-বিদেশে খ্যাত। এই অলি যখন বিবস্ত্র ও মত্তহাল, তাঁর অর্জিত মারেফতের পরম সৌভাগ্যকে শরীয়তের জাহের বস্ত্র দ্বারা সুরক্ষণ করার জন্য এবং মারেফতের সঙ্গে শরীয়তের সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে হযরত শায়খ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বিশিষ্ট এগার জন মুরীদ বাছাই করে নিয়ে একটি বিশেষ কাফেলা গঠন করেন। সেই এগার জনের মধ্যে ছিলেন হযরত মাওলানা সেরাজ আহম্মদ (বালুতুপা), মৌলভি মকবুল আহম্মদ (কাঁটাবিল) , মৌলভি খন্দকার আবিদুর রহমান (চানপুর), মৌলভি মোহাম্মদ ইউনুস (কুচাইতলি), ডাঃ সৈয়দ ফয়জুল হক (ছাওয়ালপুর), মাওলানা আব্দুল মান্নান (কুচাইতলি), জনাব হাবিবুর রহমান (কাঁটাবিল), এ্যাডভোকেট সেরাজুল হক (জেল রোড), জনাব মফিজুল ইসলাম ওরফে কেনু মিয়া (চানপুর), মাওলানা জুলফিকার আহমদ (কাঁটাবিল)।

কাফেলাকে হযরত কেবলাহ যে অলী আল্লাহর দরবারে পাঠিয়েছিলেন, তিনি একজন মত্তহাল এবং বিবস্ত্র অবস্থায় থাকতেন। কাফেলা দরবারের কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি হঠাৎ শোয়া থেকে ওঠে বসলেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বললেন, "আমাকে কাপড় পড়াও, মেহমান আসতেছে, তাদেরকে ভালো খাবার তৈরী করে আপ্যায়ণ করবা।" হযরত কেবলাহ কাফেলাকে একটি উর্দু শায়ের শিখিয়ে দিয়েছিলেন যার মাধ্যামে কুতুবীয়ত প্রদানের সু-সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। কাফেলা দরবারে পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় এস্তেঞ্জা, অজু, জেয়ারত ইত্যাদি সেরে আলোচিত অলীর হুজরায় উপস্থিত হলেন এবং হালকা নাস্তা দ্বারা আপ্যায়িত হলেন। হুজরার মধ্যে তারা বাগদাদী কোন (উত্তর পশ্চিম কোন) খালি রেখে গোল হয়ে বসলেন। সেই ওলিয়ে মোকাম্মেল তখন পশ্চিম দিক দিয়ে তাঁর হুজরায় উপস্থিত হয়ে বোগদাদি কোনে এসে বসলেন। তখন তিনি হাসি মাখা মুখে খুশির হালে ছিলেন। কাফেলার প্রধান মাওলানা সেরাজ আহম্মদ এঁর নেতৃত্বে মুর্শিদের শিখানো শায়েরটি সুর করে সকলে একত্রে অলীর উদ্দেশ্যে পড়তে লাগলেন। শায়েরটি ছিল নিম্নরূপ-

বান্দায়ে রাহমান তুম হি হো,
কুতুবে সোবহান তোমকো কিয়া
ইয়ে মুয্‌দা তাজা সুনানে,
পায়েকে পাইকা হামকো কিয়া

অর্থাৎ- রহমান তায়ালা'র হে বান্দা তোমাকে তিনি কুতুব করেছেন। সৌভাগ্যের এই সুসংবাদ সোবহান তায়ালার এই আবদকে তরতাজা শুনানোর জন্য দায়িত্ব

দিয়েছেন। এই শায়ের অলীয়ে কামেলকে শুনানোর সময় তিনি অত্যন্ত মুহাব্বতের নযরে কাফেলার সদস্যগণের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি চরম ভাবে ওয়াজদ হয়ে পড়েন। তখন কাফেলা দরুদ শরীফ শুরু করলে তিনি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন। এরপর কাফেলা দেরী না করে জোহরের আগেই ফিরে আসেন। দরবারের লোকজন বললেন," হুজুরের নির্দেশ মতো আমরা আপনাদের জন্য খাবার তৈরী করে রেখেছি, মেহেরবানী করে খাবার খেয়ে যান।" কিন্তু বার বার অনুরোধের পরও কাফেলার প্রধান মাওলানা সেরাজ আহমদ অনুনয় বিনয় করে না খেয়ে চলে আসেন।

কাফেলার সবাই ক্ষুধার্ত ছিলেন। কাফেলা প্রধানের এভাবে না খেয়ে চলে আসা কারো কাছে বোধগম্য ছিলনা। দরবার থেকে কিছু দুর আসার পর কাফেলার প্রধান জোহর নামায শেষ করে সকলকে নিয়ে একটি মসজিদের বারান্দায় খেতে বসলেন। তিনি তার পোটলা থেকে চিড়া আর নারিকেল বের করে সকলকে খেতে দিলেন। মাওলানা সেরাজ আহমদের সফর সঙ্গি একজন সদস্য বলে ওঠলেন, "এত ভালো ভালো খাবার ছেড়ে সেরাজ মিয়া (মাওলানা সেরাজ আহমদ) আমাদেরকে চিড়া আর নারিকেল খাওয়াচ্ছে।" মাওলানা সেরাজ আহমদ কোন শব্দ করলেন না। কারণ তাঁর প্রতি এরকমই নির্দেশ ছিলো এবং এই নির্দেশ কাফেলার সদস্যদের কাছে গোপন রাখতে হবে। এর কারন প্রকাশ করা হয়নি। প্রকাশ থাকে যে সেই বিশিষ্ট অলীয়ে কামেল ওফাত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আর কোন দিন বিবস্ত্র হন নাই।

ইন্তেকালের পর কুতুবীয়াতের মর্যাদা দান

হযরত মোহতারেমা আম্মা সাহেবানী (রাঃ) তাঁর পিতার (হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর শশুর।) ইন্তেকালের পর তাঁকে একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি মাথায় খুব সুন্দর একটি স্বর্ণের মকুট পরিহিত। আম্মা সাহেবানী হযরত কেবলাহ (রাঃ) কে এ স্বপ্নের কথা জানালে হযরত কেবলাহ উত্তরে বললেন, "আমি ওনাকে একজন কুতুবের মর্যাদা দান করেছি যার ফলে তিনি এ সম্মান লাভ করেছেন।"

মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ) কে জালালাবাদ প্রেরণ

হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ট মুরীদ হযরত মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ) কে একদিন বললেন, "তোকে জালালাবাদের (বর্তমান আফগানিস্তানের একটি প্রদেশ) কুতুবীয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

তোকে সেখানে যেতে হবে। এ কথাটি শোনার পর পরই সেরাজ আহমদ সাহেব হযরত কেবলাহর কদমে পড়ে গেলেন এবং বললেন, "হুজুর, আপনার কদম ছেড়ে কোথাও যেতে আমার মন চায় না। আমাকে আপনার কদমেই রাখুন।" হযরত বললেন, "তোকে দায়িত্ব যেহেতু দেওয়া হয়েছে সেহেতু তোকে সেখানে রিপোর্ট (Report) করতে হবে, তুই রিপোর্ট করে আয়।" এ প্রসঙ্গে মাওলানা সেরাজ আহমদ সাহেব আলহাজ্ব শাহজাদা মাহবুব ইলাহ আল ক্বাদেরী সাহেবের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জালালাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে এক সময় কোয়েটায় (বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত আফগান সীমান্তবর্তী এলাকা) উপস্থিত হন। তখন সেখানকার আবহাওয়া ঠান্ডা ছিল। মাওলানা সেরাজ আহমদ সাহেব এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি (টাঙ্গা) ভাড়া করে পরবর্তী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে ঠান্ডার প্রকোপ অত্যন্ত বেড়ে যায়। অধিক শীত নিবারণের মতো প্রয়োজনীয় কাপড় তখন তাঁর নিকট ছিল না। এ অবস্থায় গাড়ির চালকও কোন সাহায্য করতে পারলো না। ফলে সেরাজ আহমদ সাহেব প্রচন্ড ঠান্ডায় ক্রমেই একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাঁর বন্ধ চোখ একটুখানি খুলতেই হঠাৎ দেখতে পান তাঁর সামনে তাঁর পীর হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) উপস্থিত আছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন, " হুজুর কেবলাহকে আমার সম্মুখে উপস্থিত দেখতে পেয়ে আমি হচকিত হয়ে পড়ি।এর পর আমার শরীর আস্তে আস্তে উষ্ণ হয়ে উঠে। আমি আবার পূর্ণ সজিবতা ফিরে পাই।" পরবর্তীতে মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ) সাহেব জালালাবাদ পৌঁছে তাঁর কাজ সেরে দেশে ফিরে আসেন। তাঁর এ সফর সম্পর্কে আর কিছু বলেননি।

মাছের ভুনা কলিজা আহার

কুমিল্লা কুচাইতলীর হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মান্নান (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে শাহপুর দরবার শরীফে খানেকা স্থাপনের পর হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর ঘনিষ্ট মুরীদ কচুয়া থানার অন্তর্গত ডুমুরিয়া নিবাসী হযরত মাওলানা আব্দুল করিম (রাঃ) সহকারে একবার হজ্বে গমন করেন। জাহাজ থেকে জেদ্দায় নেমে তাঁরা সাইয়্যেদেনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর রওজা মোবারক জেয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা শরীফ যাত্রা করেন। সেখানে অবস্থানের পর হজ্বের সময় ঘনিয়ে আসলে মক্কার উদ্দেশ্যে কাফেলাবদ্ধ হয়ে যাত্রা শুরু করেন। তাঁরা চলতে চলতে নির্দিষ্ট মঞ্জিলে পৌঁছার পর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়ে পরবর্তী মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতেন। এভাবে যাত্রার কোন এক মঞ্জিলে হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"হুজুরের কি কিছু খেতে ইচ্ছে করে?" হযরত কেবলাহ উত্তরে বললেন, "মিঞা, মাছের ভূনা কলিজা খেতে মন চায় ।" মাওলানা করিম সাহেবের যদিও মনে হলো এখানে এ জিনিস পাওয়া সম্ভব না। তবুও হুজুরের ইচ্ছার কারনে মাছের ভুনা কলিজার তালাশে বের হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ তালাশের পর ফিরে এসে হুজুরকে বললেন, "হুজুর কোথাও মাছের ভুনা কলিজা পেলামনা।" হযরত ক্বেবলাহ কিছু না বলে চুপ থাকলেন। পরের মঞ্জিলে অবস্থানকালে হযরতের জ্বর আরো বেড়ে যায়। এক সময় হযরত কেবলাহ মাওলানাকে ডেকে বললেন, "কি মাওলানা মাছের ভুনা কলিজা পাওয়া গেলনা?" করিম সাহেব মাছের কলিজার তালাশে দ্রুত বের হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তালাশের পর মাওলানা আব্দুল করিম (রাঃ) হঠাৎ শুনতে পেলেন কেউ একজন ডেকে ডেকে বলছে "মাছের ভূনা কলিজা কে খাবে?"। তিনি কাছে গিয়ে দেখলেন আহবানকারি ব্যক্তি সুন্দর একটি থালায় মাছের ভূনা কলিজা নিয়ে আহবান করছে। তিনি লোকটিকে মাছের ভুনা কলিজা সহ হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর সামনে নিয়ে আসলেন। হযরত ক্বেবলাহ তখন ভুনা কলিজা নিয়ে উপস্থিত লোকজনকে দিলেন এবং নিজেও তা আহার করলেন। মাছের কলিজার মূল্য পরিশোধ করার জন্য মাওলনা সাহেব লোকটিকে দেখতে পেলেননা এবং তালাশ করেও কোথাও পেলেন না লোকটি কোন রূপ টাকা পয়সা না নিয়েই চলে গিয়েছেন। পরবর্তি মঞ্জিলে পৌঁছার পর হযরত কেবলাহ মাওলানা করিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাছের ভূনা কলিজা যিনি আনলেন তাঁকে চিনতে পেরেছো কিনা?" তিনি উত্তরে 'না' বললেন। হযরত কেবলাহ বললেন, "তোমরা বেহেস্তি খানা খেয়েছ। যিনি এনেছেন তিনি ছিলেন হযরত মিকাঈল (আঃ)।" এখানে উল্লেখ্য যে বেহেস্তবাসীগণকে সর্ব প্রথম মাছের ভূনা কলিজা দ্বারা আপ্যায়ন করা হবে।

খাজা বাবাকে শিকার

একবার হযরত মুর্শীদ কেবলাহ তাঁর কতিপয় বিশিষ্ট শ্রেণীর মুরীদ সহকারে খাজা বাবা (রাঃ) এঁর মাজার জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে আজমীর শরীফ রওয়ানা হলেন। আসামের পাহাড় এলাকায় অসংখ্য হরিণ বিচরণ করতে দেখে অনুগামী মরহুম মকবুল আহমদ মগফুরকে লক্ষ্য করে হযরত কেবলাহ বললেন, "মকবুল মিয়া তোমার বন্দুকটি আনলে হরিণ শিকার করা যেত।" উত্তরে তিনি বললেন, "হুজুর বন্দুক আমার সঙ্গে আছে।" হযরত কেবলাহ বন্দুক কোথায় জানতে চাইলে মকবুল আহমদ সাহেব হযরতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "আপনি আমার বন্দুক, খাজা বাবা আমার শিকার ।" আজমির পৌঁছার পর জনাব মকবুল আহমদ খাজা বাবার মাজারে একাগ্রচিত্তে জেয়ারত করছিলেন। এমন সময়

তিনি অনুভব করলেন কে যেন তার হাতের ফাঁকে একটি জিনিস গুজে দিলেন। তিনি জেয়ারত শেষে যখন মোনাজাতের জন্য হাত উঠালেন তখন একটি এক টাকার মুদ্রা মাটিতে পড়ল। তিনি মুদ্রাটি দেখে কিছুটা বিব্রতবোধ করলেন। এভাবে কেউ ওনাকে কেন টাকা দিয়ে যাবে। এ প্রশ্ন মনে রেখে মুদ্রাটি হাতে নিয়ে মুর্শীদ কেবলাহর নিকট গেলেন। ঘটনাটি মুর্শীদ কেবলাহকে বলে বললেন, "হুজুর আমি কি খাজা বাবার কাছে টাকা চেয়েছি?" হযরত মুর্শীদ কেবলাহ একটু মুচকি হেসে বললেন, "মিয়া তুমি বুঝতে পারোনি, খাজা বাবা তোমাকে ১৬ আনাই দিয়ে দিয়েছেন।"

পদব্রজে সিলেট যাওয়ার আদেশ

কুমিল্লা সদর কোতয়ালী থানাধীন কাঁটাবিল গ্রাম নিবাসী জনাব মরহুম মগফুর মুন্সী আলতাফ আলীর পৌত্র ও মাওলানা মকবুল আহমদ মগফুর সাহেবের পুত্র মাওলানা জুলফিকার আহমদ মগফুরকে হযরত মুর্শীদ কেবলাহ (রাঃ) একদা সিলেট যাওয়ার জন্য আদেশ করলেন। সেখানে গিয়ে সুলতানুল বাংলা হযরত শাহজালাল মুজাররদ ইয়ামেনী (রাঃ) এঁর মাজার জেয়ারত করার জন্য। সেখানে যাওয়ার শর্ত বেঁধে দিলেন তাঁর পীর কেবলাহ। যেতে হবে খালি মাথায়, মাথামুন্ডন করে, খালি পায়ে এবং কুমিল্লা থেকে পদব্রজে। কোথাও কোন যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না, পথিমধ্যে কারো নিকট থেকে কিছু চেয়ে খেতে পারবে না এবং কারো কাছ থেকে টাকা পয়সাও চাইতে পারবে না, এমনকি সাথে কোন টাকা পয়সা নিতে পারবে না। একটি তহবন পরনে থাকবে এবং আরেকটি তহবন কোর্তার পরিবর্তে গায়ে ব্যবহার করবে। তবে কেউ যদি যেচে খেতে দেয় তাহলে খেতে পারবে। পরম গুরু বা মুর্শীদ মাওলার যেমন আদেশ ঠিক তেমন কাজ। ভক্ত তো সে-ই যে তার নিজের আসক্তি উৎসর্গ করে দেয় মুর্শীদের চরণ যুগলে, তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে।

জনাব জুলফিকার আহমদ কুমিল্লা থেকে রওয়ানা হলেন যেমনি ভাবে হুকুম ছিল ঠিক তেমনি ভাবে। পদব্রাজক জুলফিকার আহমদ সাহেব আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে-

এই দীর্ঘ পথে কোন মসজিদ বা সরকারী রেল অথবা বাস ষ্টেশন যা যেখানে যেমনটি পেয়ে যান সেখানে রাত্রি যাপন করেন। এভাবে তিনি চলতে চলতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। হাঁটেন পাহাড়ের পাদদেশের দুর্গম পথ দিয়ে। প্রয়োজনে কিছুটা বিশ্রাম নেন। তারপর জঙ্গলে-বনের পাশে সরু রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ পায়ে পথ চলতে থাকেন। এদিকে পথের পাথেয় বলতে কিছুই নেই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে বন্য কুকুর ও শৃগালের সাথে স্বাভাবিক সাক্ষাৎ হয়ে

যায়। চিড়িয়াখানার প্রয়োজন নেই এদেরকে দেখার জন্য। মুর্শীদের আদেশ, শুধু আদেশ পালনের খাতিরেই নয়। মুর্শীদধন সংগেই আছেন বিদেহী কায়ায়। ভক্তের বিপদে কামেল মুর্শীদ নিজেও স্থির থাকতে পারেন না। তাই কখনো দেহ ধারণ পূর্বক নয়তো দূর থেকে ইয়াদুল্লাহর দ্বারা উদ্ধার করেন ভক্তকে। সাহস সর্বদা সাথি। ভয় যে কখনও আসেনি তাও নয়। এ যেন একটি মিশ্র অনুভূতি একজন নিষ্ঠাবান মুরীদের অন্তরে। কয়েকদিন গত হলো হাঁটার মধ্য দিয়ে দেহ মোটামুটি ভাবে ক্লান্ত। ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটা। এদিকে জঠর (পেট) জ্বালা। কিন্তু মনোরাজ্যে বিরাজিছে একান্ত মুর্শীদ, শুধু মুর্শীদ। তাই সকল ভৌতিক ক্লান্তি আত্মিক শক্তির পদাঘাতে বিদূরিত। এভাবে কেটে যায় দিন। একদিন হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে উঠেন তিনি। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে লাল বর্ণ ধারণ করেছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ভূ- পৃষ্ঠের পশ্চিম গোলার্ধের অপর পারে সূর্য ডুব দিয়ে বার ঘন্টার জন্য লুকিয়ে যাবে। রাতের ঘন কালো অন্ধকার পৃথিবীর একাংশকে আচ্ছন্ন করতে আর অল্প কিছুক্ষণ বাকী। পদব্রাজকের মনেও একটু আশংকা ঘনীভূত হল এই মর্মে যে রাত কোথায় কাটবে। পানি ব্যতীত আর কিছুই পেটে যায়নি এ কয়দিন। হঠাৎ সামনে একটি টিনের চালের ঘরের মধ্যে মিটি মিটি আলো দৃশ্যমান হলো হাঁটতে হাঁটতে। সন্ধ্যা হলো। ঘরের নিকটবর্তী হতেই দেখা গেল এটা একটি ছোট রেল ষ্টেশন। তিনি ষ্টেশনে ঢুকলেন। তারপর বারান্দায় যেয়ে মাগরিবের নামায আদায় করলেন যথারীতি। বারান্দায় যাত্রীদের জন্য রাখা সিমেন্টের টুলের উপর বসে এলিয়ে দিলেন শরীর। বার ঘন্টার জন্য হাঁটা বন্ধ এবং ক্ষুধার জ্বালা পানি পানে নিবারণ করে নিলেন। বিশ্রামের এক পর্যায়ে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

একটি কেরোসিনের হারিকেন জ্বলতে জ্বলতে চিমনীর উপরিভাগটি কালোয় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা হাতে করে নিয়ে একজন অপরিচিত মধ্যম বয়সের ব্যক্তি আসলেন। গ্রাম্য রেল ষ্টেশনের বারান্দায় যাত্রীদের টুলের উপর ঘুমন্ত মুসাফির জুলফিকার আহমদ কে জাগিয়ে হারিকেন হাতে ঐ ব্যক্তি বলতে লাগলেন, "হুজুর চলুন আমার সাথে আমাদের দরবার শরীফে। আমাদের দরবারের পীর কেবলা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনার জন্য খাবার প্রস্তুত করে রেখেছেন। দরবারের কেউই আপনার অপেক্ষায় এখনো খাওয়া খাননি। আমার সাথে চলুন।" তিনি গেলেন এবং দরবারের সকলের সাথে খাদ্য খেলেন। সে দরবারে রাত কাটাবার পর বিদায়ের প্রাককালে তাঁকে (জুলফিকার আহমদ) কিছু টাকাও দিয়ে দেয়া হল। (উল্লেখ্য যে সে দরবারটি ছিল ক্বাদেরিয়া তরিকার সিলসিলা ভুক্ত প্রখ্যাত পীর হযরত মাসাকিন (রাঃ) এঁর দরবার। তাঁর বড় সাহেব যাদা পরবর্তিতে লিখকের সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি উল্লেখ করেছিলেন।) আল্লাহ্‌র হুকুম ও তার তরফ থেকে দয়া স্বরূপ মুর্শীদের খেয়ালের কারণে এ ভাগ্য দেয়ায়

তার সৎ ব্যবহার করা নেহায়েত উচিৎ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পথে ৭ দিন চলার মধ্যে জনাব জুলফিকার আহমদ সাহেবকে অনুরূপভাবে দুইবার মেহমানদারি করা হয়। মুসাফির জুলফিকার আহমদ সাহেবের বুঝতে কষ্ট হলো না যে এটা হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম রাজ্যের একটি লিলা খেলা যা তার মুর্শীদ কেবলাহর কেরামত। এভাবে কুমিল্লা শহর থেকে খালি পায়ে হেঁটে সিলেট পর্যন্ত পৌঁছতে তার ৭দিন সময় লেগেছে। অষ্টম দিনে তিনি সিলেট পৌঁছেন এবং বাংলার সুলতানুল আউলিয়া হযরত মাওলানা শাহ জালাল মুজাররদ ইয়েমেনী (রাঃ) এঁর দরবার শরীফে পৌঁছেন। পথিমধ্যে মুসাফির জুলফিকার আহমদ তার প্রেমিক মনের ভাব বিহবলতা থেকে পীরকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। মাজার শরীফ সমূহে জেয়ারত কার্য সমাধা করতে কয়েকদিন সময় লেগে যায়। পীর মুর্শীদের আদেশে জীবনের তোয়াক্কা না করে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পর তিনি ফিরলেন নিজ মুর্শীদের দরবারে এবং সফরের প্রতিবেদন পেশ করলেন। সিলেটে মাজার জিয়ারতে পাঠানোর পেছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা বা সেখানে অবস্থানকালে অন্য কোন ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল কিনা তা জিজ্ঞাসা করায় মাওলানা জুলফিকার আহমদ উপরোক্ত ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই বলেননি।

হযরত শামস্ তাবরীজ (রাঃ) এঁর দরবারে কাফেলা প্রেরণ

হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বিশেষ উদ্দেশ্যে শীর্ষস্থানীয় মুরীদানগণের মধ্যে ১১ জনকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দলকে মাওলানা সেরাজ আহমদ এঁর নেতৃত্বে পাকিস্তানের মুলতান শহরে অবস্থিত হযরত শামস্ তাবরীজ (রাঃ) এঁর মাজার শরীফে প্রেরণ করেন।

প্রতিনিধি দলের মধ্যে মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ) এঁর সঙ্গে হযরত সেরাজুল হক (উকিল), হযরত হাবিবুর রহমান, হযরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ সহ আরো সাতজন ছিলেন। তারা যখন পাকিস্তানের মুলতান রেল ষ্টেশনে পৌঁছলেন তখন একজন অপরিচিত ব্যাক্তি- মধ্যম আকৃতি, সুস্বাস্থ্যবান, সুন্নতী বাবরি চুল, পরনে তহবন এ বেশ ভুষায় তাদের নিকট অগ্রসর হয়েই বললেন, "চলো এই গাড়িতে ওঠ।" সেখানে একটি ঘোড়ার গাড়ি তাদের জন্য প্রস্তুত ছিলো। অপরিচিত কোচোয়ান গাড়ীর ঘোড়াকে হাঁকিয়ে নিয়ে চললেন। একটু পর শাহী অথচ ভগ্নপ্রায় একটি বাড়ীর সম্মুখে গাড়ি এসে থামলো। তিনি সকলকে বললেন, "নাম"। একটি দালান ঘরে নিয়ে বসার চৌকি স্থাপন করে বিশ্রাম নিতে বললেন ও অজুর পানির ব্যবস্থা করে দিয়ে অজু সেরে নিয়ে নামাজ আদায় করতে

বললেন। কিছুক্ষণ পর ঘিয়ে ভাজা গরম পরটা ও মুরগীভুনা এনে সকলের সামনে দিয়ে খেতে বললেন।

খাওয়া শেষ হলে সামান্য বিশ্রামের সময় দিলেন। তারপর গাড়িতে উঠিয়ে আবার চললেন। কিছুক্ষণ পর শামস্ তাবরীজ (রাঃ) এঁর শাহী মাজার কমপ্লেক্সে গাড়ি এসে পৌঁছলো। সকলে নামার পর কোচোয়ান ওযু করে নিতে বললেন। ওযু শেষ হলে তিনি সকলকে পাহাড়ের উপরের দিকে দেখিয়ে বললেন "যাও জেয়ারত করে আসো।" তিনি নিচে দাঁড়িয়ে মাজার শরীফের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ম্যায়ঁ ইনলোগো কো লেকার আয়া।" অর্থাৎ- আমি এদেরকে নিয়ে এসেছি।

জেয়ারত শেষ করে আবার ঐ গাড়িতে উঠিয়ে তিনি ষ্টেশনে নিয়ে আসার পর বিদায় দিবেন এমন সময় সকলের তাৎক্ষিক পরামর্শে জনাব জুলফিকার আহমদের হাতে ১১ টি টাকা দিয়ে কোচোয়ানকে নজরানা দিতে তাকে নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি কোচোয়ানকে তা পেশ করলেন। কোচোয়ান তখন ভীষণ রাগ হয়ে বলে উঠলেন, "তোমহারা রূপিয়া পর থুক, রূপিয়া-দুনিয়া পর থুক।" আবার বললেন, দিয়া তো দিয়া গিয়ারা দিয়া, দিয়া তো দিয়া গিয়ারা দিয়া, না হাম ফেক্ সাক্তে না হাম রাখ সাকতে।" অর্থাৎ "তোমাদের টাকার উপর থুথু, টাকা ও দুনিয়ার উপর থুথু। আর দিলে তো দিলে এগার দিলে, দিলে তো দিলে এগার দিলে, এটা না আমি ফেলতে পারি না রাখতে পারি।" এগার সদস্যের এই মিশন সম্মন্ধে আর কিছু জানা যায়নি। হযরত মুর্শীদ কেবলাহকে ঐ কোচোয়ান সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, "ঐ কোচোয়ান মুলতানের শহর কুতুব।"

আগরতলার মহারাজার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ

হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) জানতে পারলেন যে, আগরতলার মহারাজার রাজপ্রাসাদে হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর একটি তৈল চিত্র টাঙ্গানো আছে। হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ছবিটি দেখে আসার জন্য হযরত কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রেণীর মুরীদ- মরহুম মকবুল আহমদ, মরহুম হাবীবুর রহমান, মরহুম মোহাম্মদ সেরাজুল হক উকিল সহ এগার জনের একটি কাফেলা মরহুম মাওলানা সেরাজ আহমদ এঁর নেতৃত্বে আগরতলার মহারাজার নিকট পাঠান। এ কাফেলাকে পাঠাবার প্রধান কারনই ছিল হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর ছবিটি দেখে আসা। আরেকটি কারন ছিল এ দরবারের হেফাজতে যে হযরত শাহ সুফি আবদুস সোবহান (রাঃ) আছেন তা মহারাজাকে জানানো। কারণ মহারাজা হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর দরবারের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। যাই হোক প্রতিনিধি দল আগরতলা পৌঁছে মহারাজাকে সংবাদ জানালো যে তাঁরা হযরত বন্দীশাহর (রাঃ) এঁর দরবার

থেকে এসেছেন। সংবাদ পেয়ে প্রতিনিধি দলকে রাজা তাঁর খাস কামড়ায় নিয়ে গেলেন। অলি আল্লাহর দরবার থেকে আগত বিধায় কাফেলার প্রতি রাজকীয় সম্মান ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়। কাফেলা প্রধান মহারাজাকে দরবারের বর্তমান অবস্থা জানালেন এবং এর তত্ত্বাবধানে যে মুর্শীদ কেবলাহ আছেন তাও জানালেন। আলোচনার এক পর্যায়ে মহারাজা মন্তব্য করলেন, "ইচ্ছাময়ের দরবারে মহা সাধকগণ [বন্দীশাহ (রাঃ) ও মুর্শীদ কেবলাহ (রাঃ)] সদস্য বিধায় তাঁরা ইচ্ছা করলেই যে কোন অসাধ্য সাধন করতে পারেন। কিছুদিন পর মহারাজার নায়েব বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর দরবারে মুর্শীদ কেবলাহর সাথে দেখা করতে এসে ভক্তি সহকারে সেজদা করে ফেলল। এ দরবারে তার আসার কারণ হিসেবে সে দরবারের কয়েকজন বিশিষ্ট মুরীদ এর সাথে আলাপ করে বললেন যে হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর নামে যে সব সম্পত্তি লাখেরাজ হিসেবে ছিল এগুলি সব মহারাজা হরযত মুর্শীদ কেবলাহর নামে বন্দোবস্থ করে দিতে চান এবং এ বিষয়ে যদি দরবার থেকে কাহাকেও রাজ দরবারে পাঠানো হয় তবে সম্পত্তি গুলি হযরতের নামে বন্দোবস্ত করতে সুবিধা হতো। নায়েবের কাছ এ সংবাদ জানার পরবর্তী সময়ে বিশিষ্ট মুরীদগণ অত্যন্ত খুশী মনে মহারাজার দরবাওে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে দরবারের মসজিদে একত্রিত হলেন। তাঁরা শুধু হযরত কেবলাহর অনুমতির অপেক্ষা করছিলেন। অনুমতি পেলেই রওয়ানা হবেন।

বিষয়টি হযরতকে জানানো হলে হযরত বললেন," বর্তমানে এই জায়গাগুলি নেয়াজ আলী সহ আরো কয়েকটি পরিবারের ভরণ পোষণের কাজ চলে। এ অবস্থায় যদি জায়গা গুলি আমার নামে দিয়ে দেয় তাহলে এরা কিভাবে বাঁচবে। সুতরাং এগুলো বন্দোবস্ত আনার কোন প্রয়োজন নেই।

তুলসি গাছের চেয়েও কি নিকৃষ্ট?

আলা হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য পাঠক বৃন্দের নিকট একটি ঘটনা উল্লেখ করছি-

একদিন এক হিন্দু লোক আলা হযরতের সাথে দেখা করতে এসে প্রথম দর্শণেই ভক্তি সহকারে সিজদা করে ফেলে। এ দিকে লোকটি হযরতকে যখন সিজদা করল তখন বিষয়টি দেখে শরীয়তের বাহ্যিক এলেম প্রাপ্ত একজন মৌলভী নিজের সীমিত জ্ঞানের অহমিকায় বলে উঠলেন, "হুজুর আপনি একজন শরীয়তের কামেল পীর। অথচ এই লোকটি আপনাকে এসে সিজদা করল আপনি তাকে কিছুই বললেন না?"

হযরত মৌলভী সাহেবের এরূপ প্রশ্নের জবাবে বললেন, "মৌলভী সাহেব আমি কি এই লোককে সিজদাহ করতে বলেছিলাম? আর সে যে আমাকে সিজদাহ করেছে তা কি আমি গ্রহণ করেছি? তাছাড়া আপনি যাকে সিজদাহ বলছেন শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কিন্তু সিজদাহ নয়, শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে সিজদাহ হলো- কোন মুসলমান যখন পাক পবিত্রতা সহকারে নিয়ত করে ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে স্মরণ রেখে দুই জানু একত্রিত করে দুই হাতের তালু মাটিতে রেখে কপাল ও নাক মাটিতে নত অবস্থায় রাখে তাকে সিজদাহ বলে।" হযরত আরো বললেন, "মৌলভী সাহেব এ লোকটি হিন্দু ধর্মের অনুসারী। প্রত্যেক হিন্দু ধর্ম অনুসারীরা নিজ নিজ বাড়িতে তুলসি গাছকে প্রণাম করে। তুলসি গাছকে প্রণাম ও ভক্তি করলেও তার বিরুদ্ধে কোন কথা ওঠে না। আর আমাকে প্রণাম ও ভক্তি করাতে এতো দোষ হয়ে গেল, আমি কি তুলসি গাছের চেয়েও খারাপ হয়ে গেলাম?"

মৌলভী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মুর্শীদ কেবলাহ যে উত্তর দিলেন তাতে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। চিন্তাশীল ব্যাক্তির নিকট সেগুলো গভীর চিন্তা শেষে সত্য উৎঘাটনের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। বিষয়গুলো হলো:

১। আমি কি এই লোকটিকে সিজদাহ করার কথা বলেছিলাম ?

২। সে যে আমাকে সিজদাহ করেছে তা কি আমি গ্রহণ করেছি?

৩। আপনি যাকে সিজদাহ বলছেন তা আসলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সিজদাহ নয়। কারণ শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গিতে সিজদাহ হলো কোন মুসলমান যখন পাক পবিত্রতা সহকারে নিয়ত করে ধ্যান খেয়ালে অদ্বিতীয় আল্লাহকে স্মরন রেখে দুই জানু একত্রে করে দুই হাতের তালু মাটিতে রেখে কপাল ও নাক মাটিতে ঠেকানো অবস্থায় রাখাকে সিজদাহ বলে। সিজদাহ কথাটি মূলত মুসলমানের বেলায় প্রযোজ্য।

৪। প্রত্যেক হিন্দু ধর্মের অনুসারীরা নিজ বাড়িতে তুলসি গাছকে ভক্তি করে থাকে। তুলসি গাছকে প্রণাম ও ভক্তি করলেও তার বিরুদ্ধে কোন প্রকার কথা ওঠে না। আর আমাকে ভক্তি ও প্রণাম করাতে এতো দোষ হয়ে গেল আমি কি তুলসি গাছের চেয়েও খারাপ হয়ে গেলাম?

উপরোক্ত বিষয় থেকে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আলা হযরত উক্ত হিন্দুর প্রণিপাত করাকে ইসলামি শরীয়তের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বরং তিনি ঐ মৌলভী সাহেবের আত্মদাম্ভিকতার অংকুরোৎপাটন করার জন্যই উপরোক্ত উত্তর দিয়েছেন। তাছাড়া হুশিয়ার ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষা হল আমরা যখন নামাযের সময় সিজদা করি তখন ৩ নং বিষয়ে বর্ণিত নিয়মগুলি ঠিক মতো না মানলে সিজদা হবে না এবং নামাযও হবে না।

চাটগাঁও বদলি

হযরত যখন চাঁনপুর নাজির মসজিদের হুজরায় থাকতেন তখন তার এক ওস্ত াদের ছেলে মাওলানা সেরাজ আহমদ প্রায় প্রতিদিন হযরতের সাথে দেখা করতে আসতেন। মাওলানা সাহেব (যিনি দরবারে চেলাভাই নামে পরিচিত ছিলেন) তিনি চাঁপাপুরের প্রকাশ্যে বালুতুপার অধিবাসী ছিলেন। বালুতুপা থেকে চাঁনপুর নাজির মসজিদে আসার জন্য তিনি সাহাপাড়া ও রথখোলার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতেন। রথখোলার রাস্তার পাশে রথ যাত্রীদের জন্য একটি বিশ্রামাগার ছিল যা আজও বর্তমান। এখানে একজন মজ্জুব অলী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বসে বসে সতরঞ্জ খেলতেন। কোন লোক তাঁর কাছে আসতে দেখলে যদি তার পছন্দ না হতো তবে তাকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দিতেন। লোকে তাকে মন্দিরী ফকির বলতো। এ পথে মাওলানা সেরাজ আহমদ কে যেতে দেখলে উক্ত মন্দিরী ফকির তাকে বলতেন, "তুই কোথায় যাস, তুই আমার কাছে আয়।" আবার বলতেন, "তোকে এই রঙ দিল কে ? তোকে বড় সুন্দর লাগে।" মাওলানা সাহেবকে প্রতিদিন এগুলি বলতে থাকলে মাওলানা সাহেব খুব বিরক্তবোধ করতেন। তাই তিনি রাস্তা বদলিয়ে অন্য রাস্তা ব্যবহার করা শুরু করলেন। কিন্তু এ রাস্তা অনেক ঘুরা হতো। এতে ওনি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তাই তিনি একদিন বিষয়টি হযরতকে জানালেন। হযরত তখন মাওলানাকে বললেন তাকে বলে দিস, "আমাকে একজন রঙ দিয়ে সুন্দর করেছে, তুমিও একজনকে রঙ দিয়ে সুন্দর করে নাও। একথা বলে সেখানে দেরী করবি না। তোকে তাড়িয়ে আসতে পারে"। মাওলানা সাহেব পরদিন আবার যাওয়ার পথে মন্দিরী ফকির যখন তার দিকে তাকালো তখন তিনি হুজুর এর শিখানো কথাটি বললেন। বলে দ্রুত চলে গেলেন। পরদিন আবার যখন এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। মন্দিরী ফকির আবার একই কথা বলল মাওলানা হযরতের কাছে গিয়ে জানালেন," হুজুর আমি তো আপনার শিখানো কথাটি তাঁকে বলেছিলাম, কিন্তু আজও সে একই কথা বললো।" হযরত তাকে বললেন, "এবার যদি মন্দিরী ফকিরের সঙ্গে দেখা হয় তবে সে কিছু বলার আগেই তাকে বলবি 'চাটগাঁও বদলি'।" পরদিন মাওলানা সেরাজ আহমদ আসার পথে দেখলেন মন্দিরী ফকির যথারীতি সতরঞ্জ খেলছে। কাছাকাছি আসতেই মন্দিরী ফকির তাঁর দিকে তাকালো। কিছু বলার আগেই মাওলানা সাহেব তাঁকে বললেন, "চাটগাঁও বদলি।" কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরী ফকিরের চেহারা মলিন হয়ে গেল। তিনি মাথা ঝুকিয়ে সতরঞ্জ এর দিকে তাকিয়ে রইলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই জানা গেল মন্দিরী ফকির ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।) তেলিকোনার উত্তরে বখ্শীয়া দরবারের মসজিদের পশ্চিম পাশে মন্দিরী ফকিরকে সমাহিত করা হয়। মন্দিরী ফকিরের ভালো নাম ছিল শেখ মোহাম্মদ হাসান (রাঃ)। যতটুকু জানা যায় তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

আরেকজন অলীর মাধ্যমে প্রকাশ

একদিন হযরতের প্রবীণ মুরীদ জনাব মগফুর মকবুল আহমদ এবং তাঁর কয়েকজন পীরভাই সহকারে হযরত মুর্শীদ কেবলাহ্ (রাঃ) এঁর সাথে দেখা করতে দরবারে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বেশভূষায় দেখতে অনেকটা মঞ্জুব দরবেশগণের মত এক লোক তাদেরকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, " আমনেরা কই যান?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "শাহপুরের পীর সাহেবের সাথে দেখা করতে যাই।" তখন ঐ পাগল বেশের মঞ্জুব লোকটি বললেন, "তাইনে কি আর দরবারে থাহেন? তাইনে তো মক্কা-মদীনা শরীফে না সব সময় থাহেন।" একথা বলে লোকটি নিজের মতো চলে গেল। তাঁরা সবাই অবাক হয়ে গেলেন। বলে কি লোকটা! যাই হোক তাঁরা দরবারে উপস্থিত হয়ে পীর কেবলাহর সাথে সাক্ষাৎ করার পর তাঁদের একজন পথিমধ্যের ঘটনাটুকু হযরতকে বিনয়ের সাথে জানালেন। জানানোর পর একজন জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর ব্যাপারটাতো বুঝলাম না। আপনাকে তো আমরা সব সময় দেখি এই দেশে। মক্কা ও মদীনা শরীফ থাকলে আমরাতো জানতাম, এখন পাগল এটা কি বলল?" তখন মুর্শীদে বরহক একটু মুচকি হেসে বললেন, "মিয়া, পাগলে কি আর মিথ্যা কথা বলে"? এটুকু ছাড়া আর কিছুই বললেন না। তখন আরেকজন পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর লোকটাকে আগে কখনো দেখিনি, লোকটি কে হতে পারে? তাঁকে তো চিনি না।" তখন তিনি আবার মুচকি হেসে বললেন, "কে হবেন আর তিনি হিলু শাহ্ বাবা আর কি।" তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন এবং পরবর্তীকালে আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনায় তাঁরা জানতে পেরেছেন তিনি হিলু শাহ বাবাই ছিলেন অর্থাৎ- হযরত হিলাল শাহ (রাঃ)। হযরত হিলাল শাহ (রাঃ) এঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হল যে, তিনি মঞ্জুব অলী আল্লাহ্। তাঁর মাজার কুমিল্লা ময়নামতি সেনানিবাসের পূর্ব পার্শ্বে হরিসপুর গ্রামে অবস্থিত। তিনি হিলু শাহ বাবা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর অনেক কারামতের কথা প্রচলিত আছে। তাঁর ইন্তে কালের পরেও তাঁকে স্বশরীরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে বলে বর্ণিত আছে। মকবুল আহমদ তাঁর ইন্তেকালের পরেই তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা ওলী আল্লাহগণকে ইন্তেকালের পরেও দেহ ধারণ ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। এখানে উল্লেখ্য যে হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ), হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এবং হযরত শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) সম্পর্কেও ইন্তেকাল পরবর্তী স্বশরীরে সাক্ষাত প্রদানের নির্ভরযোগ্য ঘটনা বর্ণিত আছে। নিম্নে হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর একটি ঘটনা উল্লেখ করা হল-

চাঁদপুর নিবাসী মৌলভী হাজী ক্বারী বদরুদ্দীন সাহেব হোচ্ছামিয়া মাদ্রাসার অন্যান্য আলেমগণ সহ হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর

নিকট মুরীদ হন। তিনি হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর অনুমতিক্রমে হজ্বে গমন করেন। কাবা শরীফ তওয়াফ কালে তিনি গাজিপুরী (রাঃ) কেও কাবা তাওয়াফ রত অবস্থায় দেখতে পান। ভিড় ও ব্যস্ততার কারণে হযরতের সাথে কথা বলা বেয়াদবী হবে মনে করে ক্বারী বদরুদ্দীন সাহেব আনন্দিত চিত্তে হযরতকে তাঁর অবস্থান স্থলের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেন। গাজিপুরী শাহ সাহেব (রাঃ) একটি মহল্লার ঠিকানা দিলেন। ক্বারী বদরুদ্দীন সাহেব তার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করে উক্ত ঠিকানা সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু মক্কা শরীফের কেউই সে ঠিকানার সন্ধান দিতে পারল না। পরে তিনি মদিনা শরীফ যেয়েও সে ঠিকানা অনুসন্ধান করেন। সেখানেও তিনি বহু সন্ধান করেও ঠিকানা পাননি। পরে তিনি পূনরায় মক্কাতে ফিরে আসেন। একদিন কাবা শরীফের নিকটে একজন বুজুর্গ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পান এবং তিনি তাঁর পীর হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর দেয়া ঠিকানার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। ঐ বুজুর্গ ব্যক্তি তাকে বললেন যে, "আরব দেশের কোথাও এ নামে কোন স্থান নেই। এটা বেহেস্তের একটি স্থানের নাম। আপনার পীর সাহেব সম্ভবত ইন্তে কাল করেছেন।" ক্বারী বদরুদ্দীন সাহেব দেশে ফিরে জানতে পারেন যে তিনি তাঁর পীর থেকে অনুমতি নিয়ে হজ্বে গমন করার পর হজ্বের পূর্বেই ১৫ই শাওয়াল তারিখে শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) ইন্তেকাল করেছেন।

মাটির নিচে কাঁঠালের অবস্থা

শাহপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম গোলাবাড়ীর জনৈক ব্যক্তি ছাতা মেরামত করে দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহ করতেন। লোকটি দেখতে সরল প্রকৃতির। উক্ত ব্যক্তি এই গ্রন্থকারের বাড়িতে এসে ছাতা মেরামতকালে গ্রন্থকারের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে বললেন যে তাঁর বাড়িতে একটি কাঁঠাল গাছে ফল ধরতো না। একদিন সে এবং তার স্ত্রী উভয়ে মিলে নিয়ত করলো যে যদি এবার গাছে কাঁঠাল ধরে তাহলে সবচেয়ে বড় কাঁঠালটি হযরত শাহপুরী মুর্শিদ কেবলাকে নজরানা স্বরূপ দিবে। এবার গাছে কাঁঠাল ধরলো। তার স্ত্রীর পীড়াপীড়ি ও আত্মদ্বন্দ্বের কারণে সবচেয়ে বড় কাঁঠালটি না দিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট কাঁঠালটি হুজুরের নিকট পেশ করে তার নিয়তের কথা বললে মুর্শীদ কেবলাহ তাকে একটি কোদাল আনতে বললেন। তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখিয়ে কোদাল দিয়ে গর্ত করতে বললেন এবং সে গর্তে কাঁঠালটি রেখে তাঁর উপর মাটি চাপা দিতে বললেন। মুর্শীদের নির্দেশ মতো সে কাজ করে বাড়ি চলে গেলো। গাছের বড় কাঁঠালটি পরিবার পরিজন নিয়ে নিজেরাই খেল। কিন্তু পরবর্তীতে দুই বছর গাছে কোন কাঁঠাল ধরলো না। তারা বুঝতে পারলো নিয়ত অনুযায়ী কাজ না করার ফলেই এমনটি হয়েছে। তারা

পুনরায় নিয়ত করল যে এবার গাছে ফল আসলে বড় কাঁঠালটি অবশ্যই মুর্শীদ কেবলাহকে নজরানা দিব। তৃতীয় বছর গাছে ফলন হলে সবচেয়ে বড় কাঁঠালটি এবার মুর্শীদ কেবলাহকে নজরানার জন্য রেখে দিল এবং কাঁঠাল পাকলে পর কাঁঠালটি মুর্শীদ কেবলাহর দরবারে হাজির হয়ে কাঁঠালটি মুর্শীদ কেবলাহ কে পেশ করল। হযরত কেবলাহ তখন তাকে কোদাল দিয়ে পূর্বের ঐ নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে মাটি চাপা দেওয়া কাঁঠালটি তুলতে বললেন। সে গর্ত করে দেখলো তিন বছর আগে কাঁঠালটি যেমনটি নিয়ে এসেছিল ঠিক তেমনই আছে, একটুও বিকৃত হয়নি, লোকটি এ ঘটনায় তার ভুলের কথা স্মরণ করে অধিক অনুতপ্ত হলো এবং মুর্শীদ কেবলাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে নিল।

বড় মাছ নজরানা

কুমিল্লা শহরের পূর্বাংশে অবস্থিত কাঁটাবিল গ্রামের মুন্সী বাড়ীর মরহুম মগফুর মকবুল আহমদ বর্ণনা করেন-

"আমার বাড়ীর পুকুরে একদিন জাল বেড় দিয়ে মাছ ধরা হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় রুই মাছটা আমি আমার পীর হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর দরবারে নজরানা স্বরূপ নিয়ে যাই। আমি মনে মনে ধারণা করি যে- এতবড় রুইমাছটা দেখে হুজুর খুশী হয়ে আমাকে বাহবা দিবেন। এ সুবাদে আমার মনের গোপনে একটি আত্মগর্বও ছিলো। মাছ নিয়ে যখন হুজুর কেবলাহর (রাঃ) সম্মুখে ঢেলে দিই এবং বলি, 'হুজুর এই বড় মাছটি আপনার জন্য এনেছি।' হুজুর কেবলাহ (রাঃ) মাছটি দেখে এবং আমার কথা শুনে বললেন,- 'মকবুল মিয়া, আমার আল্লাহ্ আমার কিসমতে এ মাছটি রেখেছেন, তুমিতো শুধু কুলির কাজটি করেছ।' তখন আমি উত্তর দিলাম, 'হুজুর, কূলি যদি কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে কোন বোঝা বহন করে নিয়ে যায় তবে সে তো তার বখশিশ পায়।' হযরত কেবলাহ (রাঃ) তা শ্রবণে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর অনন্ত নূরী চেহারা মোবারক বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে তাঁর উজ্জল শশ্রু মোবারক সিক্ত করে ফেলল। তিনি বললেন, 'মিয়া, আল্লাহ্র দরবারে দোয়াকর যেন আল্লাহ্ আমাকে ভদ্রলোক বানায় আর আমি যেন তোমাদেরকে বখশিশ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারি।"

অদৃশ্য থেকে আঘাত প্রতিহত করা

কচুয়া থানার রহিমানগর এলাকার নাওপুরা গ্রামে শাহপুর দরবারের সর্বপ্রথম খানেকা শরীফ প্রতিষ্ঠা করা হয়। খানেকা শরীফের ঘরটি টিন দ্বারা নির্মিত ছিল। নাওপুরা খানেকা শরীফ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর হযরত শাহ্ সুফি

আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বিশেষ কারনে খানেকা ঘরের টিনগুলি খুলে শাহপুরে নিয়ে আসার জন্য তাঁর ঘনিষ্ট মুরীদ হযরত আব্দুল মান্নান (রাঃ)কে নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল হযরত মান্নান সাহেব গড়িমসি করে আজ আনি কাল আনি করতে করতে অনেক দেরী করে ফেললেন। হযরত মুর্শীদ কেবলাহ ইন্তে কালের কিছুদিন আগে মোহতারেমা আম্মা সাহেবার নিকট বললেন, "মান্নান মিয়া নাওপুরা থেকে এখনো খানেকা ঘরটি ভেঙ্গে আনলো না। আমার অনুপস্থিতে সে খুব বিপদে পড়বে।" হযরত মুর্শীদ কেবলাহর ইন্তেকালের পর হুজুরের নির্দেশের কথা মনে পড়লে মান্নান সাহেব (রাঃ) নাওপুরা গিয়ে গ্রামের গণ্যমান্য লোকদের একত্র করলেন। তাদেরকে হযরত মুর্শীদ কেবলাহর নির্দেশটি জানালেন। এরপর আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে সেখানকার গণ্যমান্য প্রভাবশালী কয়েকজন ব্যক্তি ঘরটি ভাঙ্গতে দিবেন না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। মান্নান সাহেব বিব্রতকর অবস্থায় পড়লেন। তিনি ফিরে এসে শাহপুর দরগাহ কমিটির সদস্যদেরকে নিয়ে এক সভায় বসলেন এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হলো মোহ্তারেমা আম্মা সাহেবার অনুমতি নিয়ে কমিটির সকলে নাওপুরা গিয়ে গ্রামবাসীদের বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন এবং তাদের সাথে সমঝোতা করে ঘরটি নিয়ে আসবেন।

মোহতারেমা আম্মার অনুমতি নিয়ে এগার সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সকলেই নাওপুরা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত মান্নান সাহেবের নেতৃত্বে যারা নাওপুরা গিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন, মগফুর মকবুল আহমদ, আবিদ আলী খন্দকার, জনাব সেরাজুল হক উকিল, হাবিবুর রহমান নাজির, ঝলম খানেকার আব্দুল হামিদ মাস্টার সহ আরো পাঁচজন। জনাব আব্দুল হামিদ মাস্টারের শিকারের শখ ছিলো তাই যাওয়ার সময় তার বন্দুকটি হাতে করে নিয়ে নিলেন। যদি পথে কোন হাঁস বা বক পাওয়া যায় সেই আশায়। নাওপুরায় খানেকা ঘরে সবাই যখন একত্র হলেন এবং গ্রামবাসীরাও আসলো তখন আলোচনার সূত্রপাত হলো। তাদেরকে জানানো হলো হযরত মুর্শীদ কেবলাহর নির্দেশ ছিলো খানেকাহ ঘরটি ভেঙ্গে শাহপুর নিয়ে যাওয়ার। এ বিষয়ে মোহতারেমা আম্মা সাহেবার অনুমতি নিয়েই আজ তারা এখানে এসেছে। যখন আলোচনা চলছিলো তখন গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা চরমভাবে শক্ত ভাষায় বাঁধা দিলো। কিন্তু কিছু গ্রামবাসী যখন শাহপুর দরবার কমিটির পক্ষ নিলো তখন তর্ক বিতর্ক চরম আকার ধারন করলো। একজন হামিদ মাস্টারকে দেখিয়ে বললো, "দেখো তারা বন্দুক নিয়ে এসেছে আমাদের সাথে মারামারি করার জন্য।" অবস্থা বেগতিক দেখে হামিদ মাস্টার সাহেব বন্দুকটি নিয়ে সাইকেলে ওঠে দ্রুত সরে পড়লেন। ঝগড়াঝাটির এক পর্যায়ে অবস্থা আরো চরম আকার ধারণ করলে মগফুর মকবুল

আহমদ সাহেব, যেহেতু তিনি সকলের মুরব্বী ছিলেন সেই সুবাদে ওঠে দাঁড়িয়ে সকলকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। এমতাবস্থায় পেছন থেকে জনৈক উগ্রপন্থি জনাব মকবুল আহমদ সাহেবের মাথায় লাঠির আঘাত করতে গেল। লাঠির আঘাত মাথায় পড়ার পূর্বেই তিনি দেখেন স্বয়ং মুর্শীদ কেবলাহ নিজ হাতে লাঠির আঘাত প্রতিহত করছেন। এ পর্যায়ে কমিটির সকল সদস্য সেখান থেকে ওঠে আসার চেষ্টা করলেন। এ সময় কয়েকজন লোক মান্নান সাহেবের উপর চড়াও হয়ে লাঠির আঘাত করতে লাগল। কিন্তু সেই সব লাঠির আঘাত অদৃশ্য কোন এক বাক্তি একটি লাঠি দ্বারা প্রতিহত করছিলেন এবং বলছিলেন, "খবরদার মান্নান মিয়ার মাথায় আঘাত লাগলে ভালো হবে না।" এ গায়েবী আওয়াজ শুনে এবং তাদের লাঠির আঘাত অদৃশ্য লাঠির দ্বারা প্রতিহত হচ্ছে দেখে সবাই থমকে গেল। তারা ভয় পেয়ে সরে যেতে লাগল। মৌলভি মান্নান সাহেব সহ অন্যান্য সকলে অক্ষত অবস্থায় সেখান থেকে ফিরে আসলেন। পরবর্তিতে হযরত আব্দুল মান্নান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন অদৃশ্য থেকে লাঠির আঘাত প্রতিহত এবং হুশিয়ার প্রদানকারী ব্যক্তি স্বয়ং মুর্শিদ কেবলাহ ছিলেন।

শাহপুর এসে মোহতারেমা আম্মার নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো। মোহতারেমা আম্মা সাহেবা নির্দেশ দিলেন, "নাওপুরার সঙ্গে কেউ কোন প্রকার যোগাযোগ রাখবেনা। ওরা যদি শাহপুর দরবারের জন্য কোন প্রকার হাদিয়া দিতে চায় তা গ্রহণ করবে না।" মোহতারেমা আম্মা সাহেবার নির্দেশ মান্য হতে থাকল। প্রায় দুই বৎসর পর নাওপুরা বাসীরা শাহপুর দরবার শরীফের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ বা দরবারের কোন মাহফিলে যোগদান করতে না পেরে পেরেশান হয়ে ওঠেন। এরপর গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে আলোচনার মাধ্যমে খানেকার ঘরটি ভেঙ্গে টিনগুলি শাহপুর পৌঁছে দিলেন এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাইলেন।

ঘাতকের আঘাত থেকে জীবন রক্ষা

কুমিল্লা কোতয়ালি থানার অন্তর্গত জগন্নাথপুর ইউনিয়নের কুচাইতলী গ্রাম নিবাসী জনাব মকবুল আহম্মদ সাহেব দুই যুগ ধরে জগন্নাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন। এলাকায় তাঁর প্রচন্ড প্রভাব ছিল। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক যখন ঋণ সালীশি বোর্ড গঠন করেন, তখন মকবুল আহম্মদ সাহেব চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন। ঋণ সালিশী বোর্ড থেকে দেশের সকল ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হল, তারা যেন গরীব নিষ্পেষিত ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাধ্য মতো তাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে নিয়ে বিষয়টি মিমাংসা করে দেয়। ঐ সময় হিন্দু মহাজনদের কাছে গরীব মুসলমান গণ ঋণে জর্জরিত ছিল। সময় মতো সুদ দিতে না পারলে ঋণের সুদ চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে

থাকতো। সুদ সমেত ঋণ শোধ করতে না পারলে অনেককে ভিটে মাটি ছাড়া করে রাস্তার ভিক্ষুক বানিয়েছিল। এ অবস্থা নিরসনের জন্য চেয়ারম্যানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো ঋণী ব্যক্তিদের অবস্থার উপর নির্ভর করে যতটুকু সম্ভব ঋণ পরিশোধ করিয়ে ঋণের স্বাক্ষরীত দলিল ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করা। চেয়ারম্যান মকবুল আহম্মদ সাহেব যেমনি প্রতাপশালী ছিলেন তেমনি তিনি সৎ ব্যক্তি ছিলেন। হিন্দু মহাজনরা তার কাছ থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু সফল হতে পারেনি। তিনি ঋণীদের দিকে খেয়াল রেখে যার যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করতে থাকেন। যারা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলো তাদের ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফের ব্যবস্থা করে ছিলেন। এভাবে তাদেরকে ঋণমুক্ত করে চুক্তিপত্র ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। চেয়াম্যান সাহেবকে বাগে আনতে না পেরে হিন্দু মহাজনরা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠল। তারা চেয়ারম্যান সাহেবকে খুন করার পরিকল্পনা করল। তাই তারা চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ীর পুরানো চাকর কেরামত আলীকে প্রচুর টাকা দিয়ে ঠিক করল যাতে চেয়ারম্যান সাহেবকে খুন করা হয়। একদিন রাত দুইটার দিকে কেরামত আলী আরেকজন সঙ্গী নিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের ঘরে ঢুকলো। ঘুমন্ত চেয়ারম্যান সাহেবের অবস্থান সঠিকভাবে বোঝার জন্য সঙ্গের লোকটিকে টর্চ লাইট ধরতে বললো। কেরামত আলী চেয়ারম্যানের ঘাড় লক্ষ্য করে ধারালো রামদা দিয়ে কোপ মারে। এ দিকে চেয়ারম্যান সাহেব স্বপ্নে দেখছিলেন তার মুর্শীদ কেবলাহ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাকে ধাক্কা দিয়ে শোয়া থেকে উঠিয়ে দিলেন এবং মুখে বললেন, 'ওঠ'। ঘুম ভেঙ্গে চেয়ারম্যান সাহেব দেখলেন তিনি বালিশের এক কিনারে সরে আছেন এবং রামদায়ের কোপটি বালিশ, তোষক ও চৌকি কেটে 'দা' টি চৌকিতে আটকিয়ে আছে। চেয়ারম্যান সাহেব দ্রুত পলায়নরত কেরামত আলীকে চিনে ফেললেন। তাছাড়া আগের দিন বিকালে কেরামত আলী বাড়ি থেকে একটু দূরে একটি কালভার্টে বসে রাম দায়ে ধার দিচ্ছিলো। ঐ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চেয়ারম্যান সাহেব তাকে দেখেছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন রামদা ধার দেওয়ার কারণ কি। উত্তরে সে বলেছিল যে পরদিন গ্রামে একটি গরু জবাই হবে। তাই রামদাটিও তিনি সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। ঐ দিন থেকে কেরামত আলী পলাতক। উল্লেখ্য যে চেয়ারম্যান সাহেবের ছোট ভাই আব্দুল মান্নান সাহেব সে রাত্রে শাহপুর দরবার শরীফের মসজিদে ছিলেন। রাত প্রায় দুইটার দিকে মুর্শীদ কেবলাহ মসজিদে এসে মান্নান সাহেবকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সময় কত? তিনি মসজিদের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন রাত্র ২টা। হযরত চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার এসে সময় জানতে চাইলেন। এভাবে সুবিহ সাদিক পর্যন্ত প্রায় চার পাঁচবার এসেছিলেন। বার বার হুজুর আসাতে মান্নান

সাহেব বুঝতে পারলেন হুজুর কোন একটা পেরেশানির মধ্যে আছেন তাই মান্নান সাহেব না ঘুমিয়ে বসে রইলেন। হুজুর শেষবার যখন আসলেন তখন মান্নান সাহেবকে বললেন, "সুবিহ সাদিক হয়ে গেছে তুমি ওঠে আযান দাও।" দুজনেই একসাথে নামায পড়ার পর হযরত কেবলাহ মান্নান সাহেবকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি দ্রুত বাড়ি চলে যাও।" মান্নান সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। বাড়ি পৌঁছে তিনি দূর্ঘটনার সংবাদ জানতে পারলেন। ছোট ভাইকে দেখে চেয়ারম্যান সাহেব তাকে জড়িয়ে ধরে আবেগে কেঁদে ওঠলেন এবং সবিস্তারে স্বপ্নের ঘটনাসহ কেরামত আলীর অপচেষ্টার কথা বর্ণনা করলেন। মান্নান সাহেব মুর্শীদ কেবলাহ'র রাত্রে মসজিদে প্রথম আগমনের সময়ের সাথে মিলিয়ে দেখলেন দূর্ঘটনাটি তখনই ঘটতেছিল। তিনি তখন হুজুরের পেরেশানির কথা বিস্তারিত জানালেন। কিছুক্ষণ পর দুই ভাই একসাথে মুর্শীদ কেবলাহর সাথে দেখা করার জন্য শাহপুর দরবারে আসলেন। দরবারে পৌঁছার পূর্বেই তারা দেখলেন হুজুর কেবলাহ তাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অনেক দূর এগিয়ে এসে তাদের সাথে মিলিত হলেন। চেয়ারম্যান সাহেব হুজুরকে কদমবুচি করে ওঠে দাঁড়ালেন। চেয়ারম্যান কিছু বলার আগেই হুজুর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি লোক চিনছনি?" তিনি উত্তর দিলেন "জ্বী হুজুর।" মুর্শীদ কেবলাহ তাকে বললেন, "আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করছেন। তাই তুমিও তাকে ক্ষমা করে দাও প্রতিশোধ নিও না আর বিষয়টি কারো সাথে আলাপ করো না।"

ডঃ সানাউল্লাহকে হযরতের বিচক্ষণ উত্তর প্রদান

পৃথিবী বিখ্যাত আরেফ, অলীয়ে মোকাম্মেলীন হযরত খাজা আবুল হাসান আলী খারকানী (রাঃ) বলেছেন, "অলী আল্লাহগণের কেরামতের শ্রেণী বিশ্লেষণ দুই প্রকার: কেরামতে কোবরা ও কেরামতে সোগরা। এর মধ্যে প্রজ্ঞাজনিত কারামত সুদুর প্রসারী। কারামাতে সোগরার মধ্যে প্রজ্ঞাজনিত কথা থাকে যাকে 'কালেমাতুল কারামত' বা 'কথার কারামত' বলে। তা ব্যাপক দৃষ্টি ভঙ্গি বহন করে জ্ঞানী পর্যায়ের সাধারণ লোকজনকে হেদায়াত ও চেতনার দিকে আকর্ষণ করে।" মজ্জুবে সালেক পর্যায়ে একজন অলী একজন মৃত ব্যাক্তি অথবা একটি মৃত পশুকে জীবিত করলে সাধারণ পর্যায়ের মানুষের জন্য তা চোখের দেখা সুখ ছাড়া হেদায়েতের জন্য নজির বহন করে আনে না। কারণ সেই মৃত ব্যাক্তি বা পশুকে জীবিত করার পেছনে সেই অলীর যে হাল বা মানসিক অবস্থা সহকারে যে প্রজ্ঞার দর্শনক্রিয়া করেছে তা সাধারণ পর্যায়ের লোকদের দেখে বা শুনে এমন কোন শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ নেই যদদ্বারা দর্শণকারী ও শ্রবণকারীর এলেম বা আমলের কোন উপকারে আসে। পক্ষান্তরে কোন কোন 'কারামতে কওল' বা 'কথার কারামত' যা 'জামেউল কওল'

সম্পর্কিত। সাধারণ পর্যায়ের গাফেল মানুষ এহেন কারামত দ্বারা হেদায়েতের শিক্ষা পেয়ে থাকে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় যে, যদি কেহ পানির উপর দিয়ে হেঁটে যায়, এই হেঁটে যাওয়াকে অবলম্বন করলে জীবনের সামনের দিকে চলার পথ উন্মুক্ত করার কোন উপকরণ বা শিক্ষা পাওয়া যাবে না। অথচ একজন প্রাজ্ঞ সত্যদ্রষ্টার (মা'রূফ) আত্মদর্শণমূলক ছোট একটি উপদেশ বাণী যা বহুবিধ (জামেউল কওল) অর্থ বহন করে, সেটি সাধারণ বা জ্ঞানী সমাজের মস্তিস্কে ধারণ করতে পারলে তা দ্বারা তার জীবনের চলার পথের দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এজন্য 'কারামতে ছোগরা' বললেও উহার আলোক রশ্মি সুদূর প্রসারী। উপরোক্ত বিষয়ের সমর্থনে এখানে একটি বাস্তব ঘটনার উল্লেখ করছি: পাক ভারত স্বাধীনতা উত্তর কালে ভারতের তদানীন্তন কংগ্রেস পার্টির জাঁদরেল নেতা ড. সানাউল্লাহ সাহেব তৎকালীন সময়ে একজন বিজ্ঞ ও উচ্চ শিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সু-পরিচিত ছিলেন। তিনি একদা শাহপুর দরবার শরীফে মুর্শীদ কেবলাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে তবলীগের ভাবধারা ও আদর্শে দিক্ষিত করার অভিপ্রায়ে আসেন। বাহিরবাটি হতে তিনি একটি ছোট বালকের মাধ্যামে অন্দর বাড়িতে হযরত মুর্শীদ কেবলাহর নিকট সংবাদ পাঠান যে ড. সানাউল্লাহ নামক এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। বালকটি যথারীতি অন্দরে গিয়ে হযরতকে জানালেন। হযরত বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন সানাউল্লাহ? কংগ্রেসি সানাউল্লাহ নাকি?" বালকটি দৌড়ে এসে আগন্তক ভদ্রলোককে হযরতের উক্তিটি হুবহু বলে দিলো। পর মুহুর্তে হুজুর ক্বেবলাহ তাকে সাক্ষাৎদানের জন্য ডেকে আনলেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ড. সানাউল্লাহ বললেন, "তবলীগের দাওয়াত দিতে এসেছি।" হযরত কেবলাহ উত্তর শুনে বললেন, "তবলীগের দাওয়াত দেওয়া ভালো। তবে আপনি নমঃশুদ্রপাড়া, চারালপাড়া, সাহাপাড়া গিয়েছিলেন কি? শ্রী ভূধর বাবু ও শ্রী কামিনীবাবু এদের কাছে গিয়েছিলেন কি?" এ কথা শুনে অহংপরস্থ সানাউল্লাহ সাহেব ভিতরে ভিতরে জ্বলে ওঠলেন। হযরত আরো বললেন, "এখানে একটি মসজিদ আছে, একটি মাদ্রাসা আছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায হচ্ছে, কালাম পাক তিলাওয়াত করা হচ্ছে। এখানকার লোকজন ইসলামে দাখিল হয়ে আছে। আপনি মুসলমানের নিকট কোন তবলীগ করতে এসেছেন অমুসলমানের নিকট না গিয়ে? আপনি কি তবলীগের অর্থ বোঝেন?" এতদশ্রবণে সানাউল্লাহ সাহেব কোন উত্তর দিতে না পেরে ভিতরে লালিত গোস্বার কারণে বলে ওঠলেন, "হুজুর আপনার নিকট কে বলেছে আমি কংগ্রস করি?" হুজুর বললেন, "লোকে বলে"। সানাউল্লাহ সাহেব বললেন, "আপনার নিকট যারা আসে তারা তো মিথ্যা কথা বলে।" হুজুর বললেন,"আমার নিকট যারা আসে তারা যদি মিথ্যা কথা বলে তাহলে আপনিও

তো আমার কাছে এসেছেন, আপনিওতো মিথ্যা কথা বলছেন।" এ বলে হুজুর তাকে হুজুরের সামনে থেকে বের হয়ে যেতে বললেন।

এ যুক্তি সম্পন্ন উক্তিটিকে সত্য দর্শন বলা হয়। এ সত্য দর্শন এক ধরনের প্রজ্ঞাময় মনীষীদের কথার কারামত যা সংরক্ষিত স্মৃতিফলক (লাওহে মাওফুজ) থেকে নাজিল হয়, তা পাপিতাপিদের জন্য হেদায়াতের দিক নিদের্শনা হিসেবে কার্যকর হয়। সুতরাং এ ধরনের 'জামেউল কওল'বা কথার কারামত মৃতকে জীবিত করার চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রসূ তাৎপর্য বহন করে।

ইয়ে তো স্রেফ তাসবিহ ওয়ালা ফকির নেহীঁ

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খান আই সি এস পরীক্ষায় যোগ্যতা লাভ করার পর তিনি কুমিল্লায় কাজের দায়িত্ব পেলেন। তিনি যখন আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করতেন তখন তার সাথে মোহাম্মদ ইউনুছ নামে ছাওয়ালপুর নিবাসী একজন ছাত্র পড়াশোনা করতেন। তারা একে অপরের বন্ধু হয়ে ওঠলেন। জনাব ইউনুছ সাহেবের নিকট হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) সম্বন্ধে খান সাহেব অনেক কিছু শুনেছেন। লেখাপড়া শেষ করে খান সাহেব আল্লামা এনায়েত উল্লাহ মাশরীকি সাহেবের 'খাকসার' নামক এক ধর্মীয় সংগঠনে যোগদান করেন। কুমিল্লায় আসার পর হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর কথা খান সাহেবের মনে পড়ে। তিনি ভাবলেন এই হযরতকে 'খাকসার' সংগঠনে আনা গেলে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এই ভেবে তিনি একদিন ইউনুছ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে হযরতের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। হযরতের সঙ্গে পরিচয় প্রদানের পর তিনি তার আসল উদ্দেশ্য নিয়ে কথা তুললেন, 'খাকসার' সংগঠনের কার্যক্রম সম্মন্ধে অনেক কিছু জানালেন এবং এই সংগঠনে যোগদানের জন্য হযরতের নিকট প্রস্তাব রাখলেন। হযরত তার নিকট এই সংগঠনের বিশিষ্ট দিকটি জানতে চাইলে খান সাহেব বললেন এই সংগঠনের লোকজন নিজেদেরকে বিনয় ও নম্রতায় এমনভাবে তৈরী করে যেন তারা সর্বদা মাটির সাথে মিশে আছে। হযরত জবাব দিলেন, "মুসলমান নিজেদেরকে এত দুর্বল ভাববে কেন? তাদের চিন্তা থাকবে যেন তারা 'পলকপারওয়াজ' অর্থাৎ- আকাশে উড়ার ক্ষমতা রাখে।" খান সাহেব একটু চমকিয়ে গেলেন। এর পর অন্যান্য কথার মাঝে তিনি বললেন, "হুজুর আমি কয়েকদিন আগে একটি ভালো কাজ করেছি।" কি কাজ জানতে চাইলে খান সাহেব বললেন, "আমি একদিন লাকড়ি চিড়ার কাজ করেছি। সে কাজের পারিশ্রমিক দিয়ে মসজিদে মোমবাতি কিনে দিয়েছি।" হযরত বললেন, "আপনি দুটি অন্যায় কাজ করেছেন। প্রথমত: একজন মজুরের কাজ নষ্ট করেছেন। একজন মজুর ঐ কাজ করে সেই পারিশ্রমিক

দিয়ে তার পরিবারের খাবার যোগার করতে পারত। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে বিদ্যা শিখিয়েছেন, কলম ব্যবহার শিখিয়েছেন। আপনি লাকড়ি চিড়ার সময়টি লেখাপড়ার কাজে না লাগিয়ে সময়টি নষ্ট করেছেন।" খান সাহেব নির্বাক হয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন এখানে তার উদ্দেশ্য সফল হবে না। তাই হযরতের কাছ থেকে দোয়া চেয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তার বন্ধু ইউনুছ সাহেব তাকে কিছু দূর এগিয়ে দিতে গেলেন। তখন খান সাহেব বললেন, "ভাই ইউনুছ, ইয়ে তো স্রেফ তাসবিহ ওয়ালা ফকির নেহিঁ।"

অন্তর দর্শণে মিথ্যা সনাক্ত

চরম সত্যের সাক্ষী সাইয়্যেদেনা রাসূল পূরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর প্রতি খোদাওন্দ করিমের মহাবাণী আল কোরআনের সূরা 'মুনাফেকুন' সে সময় চরম ঘৃনিত কতিপয় মুনাফেককে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তবে তা সকল কালের মুনাফেকদের জন্য প্রযোজ্য। সে সময় মুনাফেকরা যেমন চরম প্রজ্ঞাবান সত্যদ্রষ্টা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কে ধোঁকা দিতে পারে নি, তেমনি পরবর্তীতেও তাঁর অনন্ত নূরের ওয়ারীস, প্রজ্ঞাবান অলী আল্লাহগণকেও কখনও ধোঁকা দিতে পারেনি। আমার সত্যদ্রষ্টা মহিমাময় মুর্শীদ পাক হযরত শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর একাধিক ঘটনাবলীর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করছি যা থেকে দেখা যাবে যে, সত্যিই একজন সত্যদ্রষ্টার প্রতিটি কর্মেই থাকে প্রজ্ঞার দ্যুতি, সঠিক পথের দিক নির্দেশনা, অনন্ত সৌভাগ্যের সুর ও সত্যের মোহনীয় সৌরভ। শাহপুর দরবারে ছাওয়ালপুরের একজন লোক থাকতেন এবং দরবারে কাজকর্ম করতেন (নাম প্রকাশ করা হলো না) দরবারের অন্যান্য মুরীদ ও ভক্তদের সাথে চলা ফেরা ও উঠা বসা করতেন। মুর্শীদ কেবলাহর নিকট মুরীদ হতে চাইলেও অজানা কারনে তাকে মুরীদ করা হচ্ছিল না। একদিন অন্যান্য মুরীদদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার সময় উক্ত লোকটি নিজকে অনেক কিছু বলে জাহের করছিল। মুরীদদের একজন বলে উঠলো, "থামো থামো তোমার বাহাদুরী দেখা আছে, তুমিতো হুজুরের কাছে মুরীদই হইতে পারো নাই, এত বড়াই কিসের?" লোকটি তখন বললো, "ঠিক আছে দেখে নিও আমি কালকেই হুজুরের নিকট মুরীদ হবো।" পরদিন ফজরের আযানের আগে লোকটি হুজুরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে হুজুরকে ডাকতে লাগলো। হযরত কেবলাহ ঘরের দরজা খুলে লোকটিকে দেখে বললেন, "কিরে তোর কি হয়েছে? এভাবে হাউমাউ করে কাঁদছিস কেন?" সে জবাব দিলো, "হুজুর গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম বড় আম্মা {হযরত মা ফাতিমা (রাঃ)} আমাকে হুকুম করেছেন আপনার নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য"। আমার মুর্শীদ একজন সত্যদ্রষ্টার অপরিহার্য গুণ সত্যদর্শণের

দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তৎক্ষণিক বুঝতে পারলেন যে সে মিথ্যা কথা বলছে। তার মতো ব্যক্তিকে সাইয়্যেদাতুন্নেসা খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমা (রাঃ) কোন অবস্থাতেই দেখা দিতে পারেন না। হযরত সঙ্গে সঙ্গে বললেন,"বড় আম্মা যদি আমাকে হুকুম দেন তবে আমি নিজেই তোর বাড়ী গিয়ে তোকে মুরীদ করে আসবো। এখন এখান থেকে বের হ।" ব্যক্তিটি লজ্জায় তাঁর সঙ্গীদের সাথে আর দেখা না করে দূরে দূরে থাকতে আরম্ভ করল।

তোরা কি আমাকে ভিক্ষুক মনে করেছিস?

আস্তানায়ে আকদাস হযরত শাহ নুরুদ্দিন আল ক্বাদেরী (রাঃ) ও খানেকায়ে সোবহানীয়া শাহপুর দরবার শরীফে মুরীদ ও ভক্তরা এবাদত বন্দেগী জেয়ারত ইত্যাদি কাজে আসত এবং হুজুরের নিকট দোয়া নিত। এখানে নিয়মিত ১১ দিনের চিল্লাহ ও ইতেকাফ হত যা পূর্বে আলোচনা হয়েছে। হুজুর চিল্লাহ ইতেকাফের সময় মুরীদগণকে বিশেষ তালিম দিতেন। চিল্লাহ চলাকালীন সময় চিল্লাহ কারীদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হুজুরের বাড়ী থেকে করা হতো। দরবারের মসজিদ থেকে হুজুরের বাড়ী প্রায় ৩০০ গজ দূরে। একবার আশিজন লোক এক সাথে চিল্লাহ করছিলেন। একদিন সকাল বেলা হুজুর মসজিদে এসে চিল্লাহকারীদেরকে বললেন, "আজ দুপুরে তোমাদের খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। আমি তোমাদেরকে একটি অযীফার কথা বলতেছি, তোমরা সবাই মিলে এই অযীফাটি পড়তে থাক।" এই বলে হুজুর তাদেরকে অযিফাটি শিখিয়ে দিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

চিল্লাহ কারীদের মধ্য হতে একজন সবাইকে ডেকে বললেন, "ভাই আমরা সবাই মিলে যদি চার আনা করে একত্র করি তাহলে এ দিয়ে তিন চার মন চাউল কিনা যাবে। তাহলে দু এক দিনের খাবারের সমস্যা মিটে যাবে। এই প্রস্তাবে সকলে সাড়া দিয়ে চার আনা করে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ঠিক এই সময় হুজুর ফিরে এসে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত শক্তভাবে চিল্লাহকারীদের বললেন, "তোরা কি আমাকে ভিক্ষুক মনে করেছিস? তোদেরকে কে বলেছে চাঁদা ওঠাতে? এসব বন্ধ কর। আমি তোদেরকে যে অযিফা দিয়েছি তা পড়তে থাক।" এ বলে হুজুর বাড়ির দিকে চলে গেলেন।

দুপুরে খাবারের কোন ব্যবস্থা হলো না। আসরের সময় দেখা গেল একজন লোক কয়েকটি খাসি, বড় বড় কয়েকটি মাছ ও কিছু চাউল হুজুরের বাড়িতে নিয়ে আসেন। হুজুর চিল্লাহ কারীদের মধ্যে পাকের দায়িত্বে যারা ছিলেন তাদেরকে ডেকে এনে বললেন, "তোরা দুপুরে যে খাবার খাইতি তা তোদের বেয়াদবীর জন্য দেরী হয়েছে। এখন তোদের খাবার এসেছে তোরা পাক করে খাবার ব্যবস্থা কর।"

সাইয়্যেদ বংশ সমাচার

হযরত সাইয়্যেদেনা শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর দর্শনের শাখা প্রশাখা ও শিরা উপশিরায় এত স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ ছিল যে, তার দৈনন্দিন জীবনের কওল, ফেল এবং রচনা বলিতে তা স্পষ্ট হয়ে প্রতিভাত। দার্শনিক বিদ্যায় যে সমস্ত অলী আল্লাহগণ পারদর্শী হন, তারা কিতাবী ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানের পরিসীমা ছাড়িয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা উপমা সহকারে এমনভাবে ঘটনা, প্রশ্ন ও সম্যাসার সমাধান দেন যে, তাকে যুক্তি তর্কের বেড়িতে আবদ্ধ করা যায় না। প্রসঙ্গত লেছানুল কওম হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) এঁর একটি ঘটনা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি কোন একদিন হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রাঃ) কে একজন লোক এসে বলল, "হুজুর আপনি যে মারফত তত্ত্বে এত জ্ঞান রাখেন, আপনি এগুলো জন সমক্ষে প্রচার করেন না কেন? তা হলে তারা উপকৃত হতে পারতো।" হযরত লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি তাদের দলের?" লোকটি বলল, জ্বি হুজুর"। তখন হযরত বললেন, "তাহলে তুমি বল, কোন পিপাসার্ত লোক জলাধারের নিকট ছুটে যায়, না জলাধার পিপাসার্ত ব্যক্তির নিকট ছুটে আসে?"লোকটি বললো, "জলাধারের নিকটই ছুটে যায় পিপাসার্ত ব্যক্তি।" তখন হযরত বললেন, "তাহলে যাদের প্রয়োজন আছে এ জ্ঞান অর্জন করার, তারাই আমার কাছে এসে প্রয়োজন মিটিয়ে যাবে।" একথার মাধ্যমে তিনি বাস্তব ও প্রজ্ঞা মিশ্রিত উপমার দ্বারা ঐ ব্যক্তির উত্তর এবং সমালোচকদেরও যথার্থ উত্তর দিয়ে দিলেন। তাঁর এ দর্শনের কাছে লোকটিও আর মাথা উঠাতে পারলো না। এখানে হযরত কেবলাহ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর দর্শন ভিত্তিক বহু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা তুলে ধরা হল-

একদিন হযরতের নিকট একজন লোক এল। লোকটি আলা হযরতের একজন নিকটাত্মিয় ব্যক্তি সম্পর্কে (যিনি সাইয়্যেদ বংশীয়) নিজের ক্ষোভ সহকারে কোন একটি বিষয়ে নালিশ জানাতে লাগল। লোকটির নালিশ তিনি স্থিরতার সাথে শুনছিলেন। এক পর্যায়ে লোকটি বলে উঠল, "হুজুর সৈয়দ বংশের লোক হয়ে তিনি যদি এ রকম করেন তাহলে কেমন হয়?" হযরত সে মুহূর্তে তাকে বললেন, "থাম, তুমি তার সম্পর্কে আমার কাছে বিচার দিতে এসেছ বিচার দাও কিন্তু তার বংশ নিয়ে কথা বললে কেন?" লোকটি নিরুত্তর রইলো। হযরত পুণরায় বললেন, "ও মিয়া, তোমার বাড়ির পাশে কোন ময়লা ডোবা আছে কি?" লোকটি বলল, "জ্বি আছে"। হযরত বললেন, "তার পানি কি মানুষ খাওয়া, অজু, গোসল অথবা অন্য কোন কাজে লাগায় ?" লোকটি বলল, "জ্বি-না।" কারণ তার ধারণা ময়লা পানি মানুষের কোন কাজে লাগে না। কিন্তু হযরত বললেন, "না সেই ময়লা পানিও মানব জীবন রক্ষার্থে কাজে লাগে। তোমার বাড়ীতে আগুন লাগলে আগুন

নিভানোর জন্য কি তুমি পরিষ্কার পানির খোঁজে দূরে যাবে ? না ঐ ময়লা ডোবার পানিই এক বালতি মেরে দিয়ে আগুন নিভাবে ?" লোকটি বলল, "ঐ ময়লা পানি দিয়েই আগুন নিভাবো ।" হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, "পানিটা কি পাক না নাপাক ঐ বিপদের সময় সেটা বিচার করবা কিনা?" লোকটি বলল, "জ্বি-না" । হযরত বললেন, "তুমি যার সম্পর্কে বিচার দিতে এসেছো তার সম্বন্ধে তোমার অভিযোগ বলে যাও । কিন্তু তুমি তার বংশটা নিয়ে কথা বললে কেন? এ বংশটাই তো একদিন তোমার বিপদে উদ্ধারকারী হবে । সে যদি অন্যায় করেই থাকে জাতে তো সে পানির মত । সুতরাং তার জাতকে তুমি এংকার করলে কেন?" লোকটি তখন খামোশ হয়ে গেল । হযরত তখন বললেন, "তুমি যাও সে আসলে আমি তাকে জিজ্ঞেস করবো এবং তার উপযুক্ত বিচার করবো" । লোকটিকে তিনি আশ্বস্ত করে বিদায় দিলেন । যার সম্পর্কে লোকটি বিচার দিয়ে গেল তিনি পরবর্তিতে হযরতের সামনে এলে হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন, "কিরে তোর নামে আমার কাছে বিচার আসে কেন? তুই জায়গায় জায়গায় অন্যায় করবি আর আমার কাছে বিচার আসবে, আর আমি তার বিচার করবো, এটা কতদিন চলবে? তুই ঠিকভাবে চলছ না কেন, তোর কাজকর্মের জন্য লোকে সৈয়দ বংশের লোকের উপর তোহমত দিবে এটা কি ঠিক? দেখরে, ভাত পঁচলে বা বাঁসি হলে পান্তা করে লবণ মরিচ দিয়ে খাওয়া যায় কিন্তু পোলাউ পঁচলে বা বাঁসি হলে তা ফেলে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না ।" সে ব্যক্তি বললো, "জ্বি হুজুর" । হযরত বললেন, "তুই তো জাতে পোলাউ । তুই ঠিক মতো না চললে বাঁসি পোলাউ এর মতো কোন কাজে লাগবি কি?" লোকটি উত্তর দেওয়ার মতো কিছু পেলনা, মাথা নিচু করে রাখল । হযরত তাকে উপদেশ সহকারে বিদায় করে দিলেন ।

উপরোক্ত বিষয়টিতে হযরত কেবলাহ সৈয়দ বংশের পবিত্রতা এবং সম্মান অক্ষুন্ন রেখে স্থিরতার সাথে বিভিন্ন মুখি ব্যাখ্যাবোধক উক্তি দ্বারা সমগ্র বিষয়টিকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে সমাধান করলেন । যার ফলে তাদের প্রতি কঠোর আচরণ বা কথা ছাড়াই উভয়েরই ভুল সংশোধন ও বিচার সম্পন্ন করলেন ।

পীরের দরবারে কাজের শিক্ষা

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর পীর হযরত শাহ হাফেজ আব্দুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর ওরস মাহফিলে উপস্থিত হতেন এবং বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করতেন । একবার দাড়োগাবাড়ীর নিকটবর্তী অধিবাসী জনাব খান বাহাদুর সিদ্দীকুর রহমান সাহেব (সম্পর্কে হযরত কেবলাহর ভায়রা) দেখলেন যে হযরত শাহ সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) দাড়োগাবাড়ী মসজিদের পুকুরের ঘাটে বসে ওরসে আগত ভক্তবৃন্দের তাবারুক খাওয়ার পর রেখে দেওয়া এঁটো

পাত্রগুলি ধুয়ে পরিষ্কার করছেন। খান বাহাদুর সিদ্দীকুর রহমান সাহেব হুজুরকে এঁটো বাসন ধুইতে দেখে ডাক দিয়ে বললেন, "ভাই সাহেব আপনি এ কি করছেন! আপনি উঠুন এগুলো ধোয়ার জন্য আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি"। হযরত কেবলাহ কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন।

উল্লেখ্য সিদ্দীকুর রহমান সাহেব হয়তবা তখন পীরের দরবারের খেদমতের গুরুত্ব ও পীরে কামেল মহান সুফি প্রবর শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর মানসিক হালটুকু বুঝতে পারেননি। আমরা হযরতের এ ঘটনাটি থেকে পীরের দরবারে খেদমতের গুরুত্বের শিক্ষা লাভ করতে পারি।

বাছুর মরে নাই

শাহপুর গ্রামবাসী জনাব ইউসুফ আলী গাভী পালন করতেন। তিনি প্রতিদিন একটু দুধ হযরত মুর্শেদ কেবলাহর জন্য দরবারে নিয়ে আসতেন। একদিন তিনি দুধ দোহন করতে গিয়ে দেখলেন বাছুরটি মরার মত শুয়ে আছে। তিনি গাভি দোহনের উদ্দেশ্যে বাছুরটিকে উঠাতে গেলেন কিন্তু বাছুরটি উঠছিলনা। তিনি বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করার পরও বাছুরটিকে উঠাতে পারলেননা। পরে তিনি নিশ্চিত হলেন বাছুরটি মারা গিয়েছে। তিনি বাছুরের সাহায্য ছাড়াই গাভীটি কোন ভাবে দোহন করলেন। তিনি কিছু দুধ নিয়ে মোর্শেদ কেবলাহর কাছে আসলেন। হুজুরকে তিনি বললেন, "হুজুর আমি ত আপনাকে আর দুখ দিতে পারব না। কারণ আমার গাভীর বাছুরটি আজ মারা গেছে।" হুজুর বললেন, "ইউসুফ মিয়া তুমি বুঝতে পারো নাই, বাছুরটি মরে নাই, এটা ঘুমিয়ে আছে তুমি গিয়ে এটাকে জাগিয়ে দিও।" জনাব ইউসুফ আলী দোদুল্যমান মন নিয়ে বাড়ি ফিরল বাছুরটি তখনও গাভীর পাশেই মৃত অবস্থায় তেমনি পড়ে ছিল। ইউসুফ আলী হযরত কেবলার নির্দেশ অনুযায়ী বাছুরটিকে ধাক্কা দিলে বাছুরটি লাফ দিয়ে উঠে গাভীর দুধ খেতে লাগল। ঘটনাটি ইউসুফ আলী অনেকের নিকট বলেছেন।

হযরতের কামালত পরীক্ষা

শাহপুর দরগাহ শরীফ এর পোস্ট মাস্টার জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ ভূঞার নিকট থেকে জানা যায় যে যখন তার মুরিদ হওয়ার মত বুঝ হয়েছিল তখন সে তার পিতা জনাব মোহাম্মদ হাকিম আলী ভূঞাকে জানাল যে সে শাহপুরের পীর সাহেব হযরত শাহ সুফি আব্দুস সোবহান (রাঃ) এঁর নিকট মুরিদ হতে চায়। জনাব হাকিম আলী ভূঞা ও তার অন্যান্য ভাই আত্মীয় স্বজন সবাই ভিন্ন এক দরবারের মুরিদ ছিল। তাই তিনি তাকে বললেন যে আমরা জ্ঞাতি-গোষ্ঠি সবাই যেখানে মুরিদ

হয়েছি তুমিও সেই দরবারের মুরিদ হও। কিন্তু ফিরোজ ভূঞা তার বাবার কথায় খুশি হতে না পেরে বলল, "বাবা আমার মন এখানেই মুরিদ হতে চায়। তা ছাড়া দুর দুরান্তের অন্য এক দরবারের মুরিদ হয়ে আমি সেই দরবারের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারব না। আমার শাহপুর দরবারই ভাল লাগে।" জনাব হাকিম আলী ভূঞা বিচক্ষন লোক ছিলেন। পীরি-মুরিদিতে জোরাজোরি করে কিছু করা উচিত হবে না ভেবে তিনি চিন্তা করলেন যে শাহপুরের পীর সাহেব কেমন পীর তা একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। তাই তিনি ভাবলেন হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর পরবর্তী ওরসে যাবেন। সকালবেলা তাবারুক দেওয়ার সময় তিনি এমন এক জায়গায় দাঁড়াবেন যেখান থেকে তাবারুক দেওয়া শুরু হয় না। সাধারণত দরবারের দক্ষিণ পূর্ব কোন থেকে অথবা উত্তর পূর্ব কোন থেকে তাবারুক বিতরণ করা হত। ভূঞা সাহেব পীর সাহেবকে পরীক্ষা করার জন্য ভাবলেন তাকে যদি তাবারুকের প্রথম প্লেটটি দেওয়া হয় তাহলে বুঝব এই পীর সাহেব একজন কামেল লোক। তাই ভূঞা সাহেব দরবারের উত্তর দিকের মাঝামাঝি স্থানে যেখানে বর্তমান গেইট টি আছে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকে কখনোই তাবারুক দেওয়া শুরু হয় না। হযরত মোরশেদ কেবলাহ ঐ স্থান থেকে ১০/১২ গজ দক্ষিণে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে দরবারের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে তাবারুক দেওয়া শুরু হোক। তখন তাবারুক বাড়া হত মসজিদের দেওয়াল সংলগ্ন পশ্চিম দিকে ছোট একটি খালি জায়গায় যার পাশে ওযুর স্থান ছিল বর্তমানে যা ভরাট করে ফেলা হয়েছে। তাবারুক নিয়ে খাদিমদার আসার অপেক্ষায় হযরত কেবলাহ দাঁড়িয়ে ছিলেন। খাদিমদারগণ তাবারুক নিয়ে হযরতের কাছাকাছি পৌঁছলে তিনি প্রথম খাদিমদারকে ডাক দিয়ে ভূঞা সাহেবকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, "ঐ যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে প্রথম বাসনটি তাকে দাও। তারপর পূর্ব দিকের সাড়ির উত্তর মাথা থেকে তাবারুক বিতরণ শুরু কর।" ভূঞা সাহেব হতবাক হয়ে গেলেন। এই ঘটনার পর জনাব ভূঞা সাহেব দ্রুত বাড়িতে ফিরলেন। তার ছেলেকে খোঁজ করে ডেকে এনে তাবারুকের পূর্ণ ঘটনা তাকে জানিয়ে বললেন, "বাবা তুমি এখানেই মুরীদ হও, শাহপুরের এই পীর সাহেব একজন কামেল অলী আল্লাহ।"

ঘোড়ার চিকিৎসা

শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর মুরীদ নাওপুরা নিবাসি মৌলভি তাজউদ্দীন সাহেব ময়মনসিংহে থাকার সময় এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলেন যে উক্ত ব্যক্তির রেসের ঘোড়াটির পিঠে কেউই চড়তে পারছেনা। কেউ চড়তে গেলেই ঘোড়াটি পাগলামি শুরু করে এবং এক পর্যায়ে বসে পড়ে, সেটাকে আর কোন

ক্রমেই দাঁড় করানো যাচ্ছেনা। অথচ ঘোড়াটি রেসে ব্যবহারের জন্য তার জরুরী প্রয়োজন। মৌলভি তাজউদ্দীন সাহেব যেহেতু গাছ-গাছরা দিয়ে কবিরাজি চিকিৎসা জানতেন তাই তিনি ঘোড়াটির চিকিৎসা করতে পারবেন কিনা? মৌলভি তাজউদ্দীন সাহেব ঐ ব্যক্তির সাথে ঘোড়াটি দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন, ঐ মূহুর্তে ঘোড়াটিকে কবিরাজি চিকিৎসা দেয়ার মত কিছু নেই। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে এবং উপায়ান্তর না দেখে তিনি ঘোড়াটির কাছে গিয়ে ঘোড়াটির কাঁধে হাত রেখে অনুচ্চ স্বরে বললেন, "তোকে আমার পীর শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর দোহাই দিয়ে বলছি তুই ভাল হয়ে যা।" দেখা গেল ঘোড়াটি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো এবং তার পিঠে মানুষ উঠলেও আর পাগলামি করছে না।

তাজউদ্দীন সাহেব পীরের দোহাই দেয়ার বিষয়টি নিজের মধ্যেই রেখে দিলেন কারো কাছে প্রকাশ করলেন না। পরবর্তীতে হযরত বন্দীশাহ্ (রাঃ) এঁর ওরস শরীফ উপলক্ষে তিনি শাহপুর দরবার শরীফে আসলে শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাজউদ্দীন সাহেব কে দেখেই মুচকি হাসি দিয়ে বলে উঠলেন, "আজকাল কোন কোন মৌলভি সাহেব পীরের নাম ভাঙ্গাইয়া ঘোড়ার চিকিৎসা করে।"

এক ধাক্কায় আজমীর

কচুয়ার নাওপুরা নিবাসি হাফেজ বদরুল হুদা যিনি বদু মামু নামে সমধিক পরিচিত। তিনি তরুণ বয়সেই তাঁর পীর শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট কোরআন ও ক্বেরাত শিক্ষায় দীক্ষা গ্রহন করেন। দীক্ষা গ্রহনের পর শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁকে উদ্দেশ্য করে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "বদু, ইনশাআল্লাহ্ কোরআন তেলাওয়াতে কোথাও তুই হারবিনা।"

তরুণ বদু মামুর মনে আজমীর শরীফ যাওয়ার প্রবল বাসনা জাগ্রত হয়। একদিন মুর্শীদ শাহ্ আবদুস সোবহান (রাঃ) নিজেই জিজ্ঞেস করলেন," বদু মিয়া তোর কি আজমীর যেতে মন চায়?" তিনি বললেন," হুজুর, মনতো চায় কিন্তু টাকা পয়সাতো নাই যামু কেমনে?" তখন শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) বদু মামু কে দরবারের মসজিদের উত্তর দিকে অবস্থিত বিশাল পুকুরটির পাড়ে নিয়ে আসেন। পুকুর পাড়ে দাঁড় করিয়ে বললেন," তুই চোখ বন্ধ কর যখন খুলতে বলব তখন খুলবি।" এরপর তিনি বদু মামুর পিঠে হাত দিয়ে পুকুরের দিকে ধাক্কা দিলেন। একটু ক্ষণ পরই বদু মামু শুনতে পেলেন তাঁকে চোখ খুলতে বলা হল। তিনি চোখ খুলে অবাক হয়ে দেখতে পেলেন তিনি অপরিচিত একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। লোক জনকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন জায়গাটি আজমীর শরীফ। সেখানে তিনি সুলতানুল হিন্দ খাজায়ে খাজেগান খাজা মুঈনদ্দীন চিশতি (রাঃ) এঁর দরবারে অবস্থান করতে থাকেন।

কিছুদিন পর বদু মামু জানতে পারেন আজমীর আন্দরকোট জামে মসজিদে ইমাম নিয়োগ দেয়া হবে। তিনি সেখানে ইন্টারভিউ দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ যখন জানল তিনি বাঙ্গালী, তখন একজন বললেন," বাঙ্গালী তো কোরআন গলদ পড়তা হ্যাঁয়।" অর্থাৎ- "বাঙ্গালী তো কোরআন ভুল পড়ে।" তরুণ বদু মামুর মনটি একটু খারাপ হয়ে গেল। তখন তাঁর খেয়াল হয়ে গেল তাঁর পীরের কথা। তিনি তো বলেছেন যে তেলাওয়াতে কখনো হারবিনা। তিনি পীরের খেয়াল করে কর্তৃপক্ষকে বললেন," যারা মেরা তেলাওয়াত তো সুনো।" অর্থাৎ-"আমার তেলাওয়াত তো একটু শুনুন।" তারা রাজি হলে তিনি সুরা এখলাস অত্যন্ত এখলাসের সাথে সুন্দর করে তেলাওয়াত করলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর তেলাওয়াত শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো যে অল্প বয়সি এই তরুণ বাঙ্গালী এত সুন্দর শুদ্ধ তেলাওয়াত কি ভাবে শিখল? তারা তাঁকে প্রশ্ন করল," তুমি এই ক্বেরাত কোথায় শিখেছ? তোমার শায়খ কে?" তিনি উত্তরে বললেন," আমি আমার দেশেই ক্বেরাত শিখেছি। আমার শায়খ হলেন আমার পীর শায়খুল কোররাহ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ)। কর্তৃপক্ষ তাঁকেই ইমাম হিসেবে নিয়োগ দিল এবং এই আন্দরকোট জামে মসজিদে বদু মামু চার (৪) বৎসর ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দেশে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তিনি দীর্ঘ সাতাশ (২৭) বৎসর কুমিল্লায় তাঁর দাদা পীর বিখ্যাত বুযুর্গ শায়খ হাফেজ শাহ্ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজিপুরী (রাঃ) এঁর দরবারে দাড়োগা বাড়ী মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন।

মেহমানদারী

হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কচুয়ার লক্ষীপুর নিবাসি হাফেজ সেরাজুল ইসলাম সাহেব কে কোন এক উদ্দেশ্যে সিলেটে সুলতানুল বাংলা হযরত মাওলানা শাহ্জালাল মুজার্রাদ ইয়েমেনী (রাঃ) এঁর দরগাহ্ শরীফে পাঠান। সময়টি ছিল শীত কাল। হাফেজ সাহেব কুমিল্লা থেকে সকালে ট্রেনে যাত্রা করে রাত ১১টায় সিলেট রেল স্টেশনে পৌঁছেন। সেখান থেকে দরগাহ শরীফে যাওয়ার পথে হাড় কাঁপানো শীতের গভীর রাতে খাবার কেনার মত কোন দোকান-পাট খোলা পেলেন না। দরগাহ্ শরীফে পৌঁছতে রাত আরো গভীর হয়ে যায়। এই শীতের রাতে সেখানেও কোন লোকজন পেলেন না। অগত্যা সিড়ি দিয়ে উঠে বড় গম্বুজ মসজিদের মধ্যে ক্ষুধার জ্বালা নিয়েই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন এবং ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর কারো ডাক শুনে সজাগ হয়ে দেখতে পান, অপরিচিত এক লোক তাঁকে বলছেন," ওবা উঠ, কিছু খাইছনি?" তিনি না সূচক জবাব দিলে লোকটি হাফেজ সাহেবের দিকে একটি প্লেট বাড়িয়ে দিয়ে খেয়ে নিতে বলে আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। প্লেটে ভাত, গরম সিদ্ধ ডিম ভুনা এবং

গরম মসুর ডাল দেয়া আছে। হাফেজ সেরাজুল ইসলাম সাহেব বর্ণনা করেছেন যে সিদ্ধ ডিম ভুনা এবং মসুর ডাল দিয়ে ভাত তাঁর অত্যন্ত পছন্দের খাবার। তিনি তৃপ্তি সহকারে খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন।

হাফেজ সাহেব সিলেট দরবারে তাঁর উদ্দিষ্ট কাজ শেষ করে যখন শাহপুরে তাঁর পীর কেবলাহ শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসেন. তখন শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) হাফেজ সাহেব সালাম দেয়ার পর কোন কিছু বলার আগেই হাসি দিয়ে বলে উঠলেন, " কিও মিয়া! বাবা তো তোমার মেহমানদারী করেছেন।" হাফেজ সেরাজুল ইসলাম স্তম্ভিত হয়ে বুঝে নিলেন সফরের ইতিবৃত্ত তাঁর পীর কেবলাহর নখদর্পণে রয়েছে।

গোস্ত খাওয়া

মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার কার্তিক মাস হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে চিল্লা হয়েছিল। একদল চিল্লা শেষ করে বিদায় হলে অপর দল ভর্তি হত। এভাবে সব সময়ই নতুন পুরানো মিলিয়ে চিল্লাকারীদের সংখ্যা শতাধিক হত। পানাহারের ব্যবস্থা কাচারি ঘরে হত। একদিন আমি ও বালুতুপার মাওলানা সেরাজ আহম্মদ খাদ্য বন্টন করে খাওয়ালাম। খাওয়ার পর চিল্লাকারী সবাই মসজিদে চলে গেল। এরপর আমি ও মাওলানা সেরাজ সাহেব খেতে আরম্ভ করলাম। এমন সময় কসবার মৌলভি মোহাম্মদ ফয়েজ সাহেব মসজিদ থেকে পূনরায় আমাদের নিকট আসলেন এবং ঠাট্টা করে বললেন," বেশতো নিরালায় ডেগ সামনে নিয়ে খাচ্ছেন।" মাওলানা সাহেব উত্তরে বললেন," তোমার যদি আরও খেতে ইচ্ছে হয় আসনা।" ফয়েজ সাহেবও খুশী হয়ে পুনরায় আমাদের সাথে খেতে বসে গেলেন। খাওয়া শেষ হওয়ার পর আমরা তিন জনই মসজিদে গেলাম। তখন বাড়ি থেকে কোনাকুনি পথ দিয়ে একটি মেয়ে দৌড়ে এসে বলল," বাবা (হুজুর কেবলাহ) মসজিদের সবাইকে বাড়িতে যেতে বলেছেন।" আমি তাকিয়ে দেখলাম আমরা তিনজন ছাড়া বাকি সব পরিশ্রান্ত লোক গুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। এদেরকে কি ভাবে জাগাবো ভেবে মেয়েটিকে বললাম," বাড়ি যেয়ে বল মসজিদের সব লোক ঘুমিয়ে আছে।" একটু পর হুজুর মেয়েটিকে দিয়ে আবার বলে পাঠালেন," যারা সজাগ আছে তাদেরকে আসতে বল।" আমরা তিন জনই বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বসার পরপরই হুজুর কেবলাহ বললেন," পীরের বাড়িতে এসে যদি গোস্ত তালাশ কর তাহলে আল্লাহ্ তালাশ করবা কোথায়?" আমরা অবাক হয়ে চুপ করে রইলাম। তখন হুজুর আমাদেরকে এ বিষয়ে কিছু নসিহত করলেন। পরবর্তীতে বাড়ি থেকে বের হবার পর বালুতুপার মাওলানা সাহেব বললেন," কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন।" আমি বললাম," বেশক"।

সুরমা নদীর ব্রিজ

ঘটনাটি ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়ের। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একবার মোরশেদ শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) সিলেটে সুলতানুল বাংলা হযরত শাহ্ জালাল ইয়েমনি (রাঃ) এঁর মাযার জিয়ারত করতে যান। ফিরে আসার পর তিনি বললেন," এবার সুরমা নদীটা পার হতে খুব কষ্ট ভোগ করেছি। আসার সময় বাবার নিকট (শাহ্ জালাল বাবা) আরজি করেছি যে বাবা সুরমা নদীর উপর একটা পুল হলে ভাল হত, যাতায়াত করা খুব কষ্টকর।" প্রায় তিন বৎসর পর মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ) সিলেট জেয়ারতে যেয়ে দেখেন যে নদীর উপর বৃহৎ মজবুত লোহার ব্রিজ তৈরী হয়ে গিয়েছে। যা আজ ঐতিহাসিক 'কিন ব্রিজ' নামে পরিচিত।

বেতের শাস্তি

মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন," চিল্লার সময় চিল্লাকারী ব্যতিত অন্য কোন লোকের চিল্লা ওয়ালাদের সাথে মসজিদে থাকা মোর্শেদ কেবলার নিষেধ ছিল। একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল মোহতারেমা আম্মা সাহেবানীর ভাই আমাদের মামু সৈয়দ মুহিব্বুল হক (নওয়াব মিয়া) সাহেব তখন মসজিদে ছিলেন। বৃষ্টির মধ্যেই রাত গভীর হয়ে যায়। মামু বাড়ী ফিরতে না পেরে বললেন,' এত বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যে কোথায় যাবো, আমি আপনাদের সাথে থাকতে পারি কিনা?' বালুতুপার মাওলানা সিরাজ সাহেব ইতস্তত: করে বললেন,' আপনি থাকতে পারেন।' ভোর বেলা মোরশেদ কেবলাহ বাড়ি হতে জানতে চেয়ে লোক পাঠালেন যে মসজিদে চিল্লা ওয়ালাদের সাথে চিল্লা ছাড়া কেউ ছিলেন কিনা? জানানো হলো মামু ছিলেন। পরে সকাল বেলা হুজুর মসজিদে উপস্থিত হয়ে সবাইকে ডেকে প্রথমে মাওলানা সিরাজ সাহেব কে জিজ্ঞাসা করলেন,' নওয়াব মিয়াকে মসজিদে থাকার জন্য কে বলেছে?' মাওলানা সাহেব উত্তর দিলেন,' মামু বৃষ্টির কারনে যেতে না পেরে আমাদের কে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি আমাদের সাথে থাকতে পারবেন কিনা। আমি বলেছি,আপনি থাকতে পারেন।' মোরশেদ কেবলাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,' তুমি কি বলেছ?' আমি বললাম,' হুজুর, আমি হ্যাঁ বা না কিছুই বলিনি।' তখন তিনি সবাইকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন,' বল দেখি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেনাপতি নিজ কর্তব্যে অবহেলা করলে যুদ্ধজয় করা কি সম্ভব হয়?' সবাই উত্তর দিল,' না হুজুর।' হুজুর জিজ্ঞসা করলেন,' এমন সেনাপতির শাস্তি হওয়া উচিৎ কিনা?' সবাই বলল,' জ্বি হুজুর।' হুজুর বললেন,' সেরাজের কুড়ি বেত কেননা সে থাকার অনুমতি দিয়েছে। আবদুল করিমের দশ বেত কেননা তার নিষেধ করা উচিত ছিল কিন্তু সে

তা করে নাই ।' জোহরের পর বরাগ বাঁশের জিংলা আনিয়ে হুজুর নিজ হাতে শাস্তি কার্যকর করেন ।"

উল্লেখ্য যে ঐ চিল্লায় কুচাইতলির মাওলানা আবদুল মান্নান, নাওপুরার মাওলানা সুফি আলিমুদ্দীন, মাওলানা আবদুল গফুর সাহেবগণও ছিলেন । মামু মাওলানা সেরাজ এবং মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবের মাঝখানে শুয়ে রাত কাটিয়ে ছিলেন । মাওলানা আবদুল মান্নান, মাওলানা আবদুল গফুর, মাওলানা সুফি আলিমুদ্দীন সাহেবগণের জন্যও বেত নির্ধারণ করা হয়েছিল । সুফি আলিমুদ্দীন সাহেব আলেম এবং সকলের মুরুব্বি বিধায় তাঁর দায়িত্বও বেশী ছিল । তাই তাঁর জন্য ৫০ বেত নির্ধারণ করা হয়েছিল । কিন্তু তাঁর বার্ধক্য ও অন্যান্য কারনে বেত্রাঘাত মওকুফ করা হয়েছিল ।

এখানে একটি বিষয় প্রণিধান যোগ্য যে নিজকে পরিশুদ্ধ করার কঠোর পরিশ্রম বা জেহাদে আকবরের ক্ষেত্রে তরিকতের সালেকগণের জন্য চিল্লাহ একটি অন্যতম অনুষঙ্গ । তাই জেহাদে বা যুদ্ধে জয় লাভের জন্য যেমন শৃংখলা মানা আবশ্যক তেমনই আত্মশুদ্ধির পরিশ্রমের ক্ষেত্রে তরিকতের সালেকদের জন্য তরিকতের কর্মকান্ডে শৃংখলা মানা আবশ্যক । তা না হলে নিজকে পরিশুদ্ধ করা সুদুর পরাহত । এ কারনেই মুর্শিদে বরহক শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) উপরোক্ত বিষয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেনাপতির উপমাটি দিয়েছেন বলে মনে হয় ।

পানি পড়া

একদা হযরত মুর্শীদ কেবলাহ শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) শাহপুরে নিজবাড়ীতে বসে কতিপয় মুরীদগণকে নিয়ে তিনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় রত ছিলেন । এমন সময়ে গ্রামীণ একজন লোক এক গ্লাস পানি পড়া নেয়ার জন্য আসল । কারণ, তার এক নিকট আত্মিয়ার প্রচন্ড পেটে ব্যথা । মুরীদগণের ভীড়ের কারণে উক্ত লোকটি মজলিসের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলো । হুজুর কেবলাহ (রাঃ) চৌকির উপর থেকে লোকটিকে কি জন্য এসেছে এ কথা জিজ্ঞেস করলে লোকটি পানি পড়ার কথা বললো । হুজুর কেবলাহ দুরের অবস্থান থেকেই লোকটিকে লক্ষ্য করে দম করলেন । লোকটি দুর থেকে ফুঁক দেয়াতে গ্লাসে ফুঁক লাগেনি বিধায় তা কার্যকর হবেনা মনে করে গোমতি নদীর খেয়া পারাপারের সময় তার হাতের গ্লাসটির পানি গোমতি নদীতে ফেলে দিল । একি আশ্চর্য! যেখানে সে পানি ফেলেছে সেই নির্দিষ্ট জায়গার নদীর পানি গরম পানির ন্যায় টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করলো । তা দেখে লোকটি ভয় পেয়ে গেল এবং হুজুর কেবলাহ (রাঃ) এঁর নিকট ফেরত এসে ঘটনা বর্ণনা করে ক্ষমা চাইতে লাগলো । হুজুর

কেবলাহ (রাঃ) তাকে বললেন যে নদীর ঐ ফুটন্ত পানি থেকে কিছু পানি নিয়ে যেন রোগীনিকে পান করিয়ে দেয়। লোকটি তাই করলো এবং পান করানোর পর রোগীনি আরোগ্য লাভ করলো।

আমার আর চিন্তা কি?

কচুয়ার নাওপুরা নিবাসি সুফি আলীমুদ্দীন (রাঃ) একবার অসুস্থ্য হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং তাঁর কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় সুফী আলীমুদ্দীন (রাঃ) এঁর পীর শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) নাওপুরা খানেকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি উপস্থিত কয়েকজন মুরিদকে বললেন, "চল আলীমুদ্দীন মিয়ারে দেখে আসি।" লোকজন সহ অসুস্থ্য নির্বাক সুফী আলীমুদ্দীন সাহেবের ঘরে যেয়ে দেখেন সুফী সাহেব ঘুমাচ্ছেন। শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) নিরবে রোগীর পাশে কিছুক্ষন বসে রইলেন। হঠাৎ সুফি আলীমুদ্দীন (রাঃ) চোখ মেলে পীরের দিকে চেয়ে হাসি দিয়ে অশ্রু সজল চোখে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন "হুজুর, এইমাত্র রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইছিলেন। আমি হযরত শাহ মোরাদে আলম (রাঃ) এঁর কাসিদার-

হোঁ মরিজে এস্কে ভি বালি পাঁ মেরে আ রাসুল
দরদে পাহলু সে হায় উঠতা উসকো দেবমান কিজিয়ে।

এই দুইটা লাইন মনে মনে পড়তে পড়তে ঘুমাইয়া পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইসা আমারে একটু ধমকের সুরে বললেন, "আলীমুদ্দীন তোমার দায়িত্ব আমি নিয়েছি তুমি এত পেরেশান হচ্ছ কেন?" এর পরই আমার ঘুম ভাইংগা যায়। তখন শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) হাসি মুখে বললেন, "মিয়া, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমার দায়-দায়িত্ব নিছেন আমার আর চিন্তা কী?" এর ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই সুফী আলীমুদ্দীন (রাঃ) সুস্থ্য হয়ে যান।

পীর প্রাপ্তি

হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর মুরীদ এডভোকেট সেরাজুল হক সাহেবের একজন সহকর্মী পেশকারী পেশায় কর্মরত ছিলেন। এ পেশার পূর্বে তিনি ব্রিটিশ আর্মিতে চাকুরী করেছিলেন। আর্মিতে থাকা কালিন ভারতবর্ষের বহু জায়গায় সফর করেছেন এবং বহু পীর-আউলিয়ার দরবারে গমন করেছেন একজন কামেল পীরের তালাশে। কিন্তু তার মন মত কামেল পীরের

সন্ধান পাননি। বিষয়টি তিনি লোকজনের নিকট প্রকাশও করেননি। পেশকার সাহেবের সাথে পেশাগত সূত্রে সেরাজুল হক উকিল সাহেবের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। উকিল সাহেব প্রতি শনিবার শাহপুরে পীরের দরবারে গমন করতেন। পেশকার সাহেব একদিন উকিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন," ভাই প্রতি শনিবার আপনি কোথায় যান?"। উকিল সাহেব বললেন, "শাহপুর আমার পীরের দরবারে"। পেশকার সাহেব বললেন, "আমাকে কি একদিন আপনার সঙ্গে আপনার পীরের দরবারে নিয়ে যাবেন?" উকিল সাহেব তখন 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দিয়ে পেশকার সাহেবের সঙ্গে আলোচনাক্রমে শাহপুর যাওয়ার তারিখ ঠিক করলেন। নির্দিষ্ট দিনে দু'জন রিক্সায় চড়ে কথা বলতে বলতে পথ চলছিলেন। যখন বিবির বাজার খেয়া ঘাটে পৌঁছলেন পেশকার সাহেব হঠাৎ নিরব হয়ে গেলেন এবং চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। নদী পার হওয়ার পর পেশকার সাহেব উকিল সাহেবকে পেছনে রেখে সে সময়ের গ্রাম্য পথ দিয়ে দ্রুত শাহ্পুর অভিমুখে পথ চলতে লাগলেন। যতই দরবারের নিকটবর্তী হতে লাগলেন কোন এক অমোঘ আকর্ষনে তার চলার গতিও বাড়তে লাগলো। এক পর্যায়ে পেশকার সাহেব দরবার অভিমুখে দৌড়াতে লাগলেন। শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) তখন বহির্বাটিস্থ হুজরা খানায় অবস্থান করছিলেন। পেশকার সাহেব দৌড়ে সোজা হযরত কেবলার কদমে নিজেকে সপেঁ দিয়ে তখনই শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট মুরীদ হবার আবেদন করলেন এবং হযরত কেবলাহ পেশকার সাহেবকে মুরীদ করে নিলেন। ইত্যবসরে উকিল সাহেব দরবারে পৌছলেন এবং অন্যান্য সময়ের মত পীর কেবলাহর সাথে সাক্ষাৎ করলেন দোয়া নিলেন। দরবার থেকে ফেরার সময় উকিল সাহেব যখন পেশকার সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, "ভাই ব্যাপার কী? আপনি খেয়া ঘাটে আসতেই চুপ হয়ে গেলেন, এরপর নদী পার হয়েই কিছু না বলে আমাকে পেছনে ফেলেই অচেনা পথে দ্রুত চলতে লাগলেন? এমনকি একপর্যায়ে দরবারের দিকে দৌড়াতে লাগলেন, আমিত কিছুই বুঝলাম না।" পেশকার সাহেব উত্তরে বললেন, "ভাই আমি বহুদিন যাবৎ একজন কামেল পীরের তালাশে বহু জায়গায় গিয়েছি। কিন্তু মনের মত পীর পাইনি। আমি যথেষ্ট চিন্তাগ্রস্থ ছিলাম। একদিন হযরত গাউসে আযম বড় পীর (রাঃ) আমাকে স্বপ্নে একজন ব্যক্তিকে দেখিয়ে তাঁর নিকট মুরীদ হতে বলেন এবং তাঁর নিকট যাওয়ার রাস্তা কিছুটা দেখিয়ে দেন। খেয়া ঘাটে আসতেই আমার দেখা সেই রাস্তার সাথে মিল পাই। তখন আমার অন্য কোন কিছুর প্রতি খেয়াল ছিলনা। তাই আমি দ্রুত চলতে থাকি। যতই যেতে থাকি রাস্তা তত বেশী পরিচিত মনে হতে থাকে। এক পর্যায়ে শাহ্পুর দরবারে পৌঁছে

বহির্বাটিস্থ হুজরা খানায় একজনকে দেখতে পাই। গাউছে আযম বড়পীর (রাঃ) যে ব্যক্তিকে যেভাবে দেখিয়ে ছিলেন তাঁকে সে ভাবেই পেয়েছি। তিনিই হলেন হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ)। তখন আমার অবস্থা বলে বুঝাতে পারবোনা। আমি দেরী না করে সংগে সংগে নিজেকে হুজুরের কদমে সোপর্দ করে তাঁর নিকট মুরীদ হতে চাইলাম। হযরত শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) আমাকে মুরীদ করে নিলেন এবং আমার বহু দিনের অতৃপ্ত মন প্রশান্তি লাভ করে।" পেশকার সাহেবের মুখে নিজের পীর সম্পর্কে এ বর্ণনা শুনে উকিল সাহেব খুব আপ্লুত হয়ে গেলেন।

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতে চাচ্ছেন

কচুয়ায় নাওপুরা গ্রামের সুফি আলীমুদ্দীন (রাঃ) এঁর ছোট ভাই জনাব ফজলুর রহমান সাহেব যাকে সবাই ফজলু বলে ডাকতেন। তিনি শিশু কাল থেকেই শায়খ শাহ্ আব্দুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) কে অত্যন্ত ভালবাসতেন। শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) একদিন ফজলু সাহেবকে কথাচ্ছলে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কি আমারে মায়া করিস ?" ফজলু সাহেব বললেন, "জি হুজুর, আমি আমনেরে মায়া করি।" হজরত কেবলাহ জিজ্ঞেস করলেন, "কী রকম মায়া করস?" ফজলু সাহেব উত্তর দিলেন, "অনেক মায়া করি।" শাহ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) একটি জ্বলন্ত কয়লা দেখিয়ে বললেন, "আমারে যে মায়া করস তাহলে আমি বললে তুই কি এই জ্বলন্ত কয়লাটা হাতে নিতে পারবি?" ফজলু সাহেব জ্বলন্ত কয়লাটি সংগে সংগে হাতে নিয়ে নিলেন। এটা দেখে শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) দ্রুত কয়লাটি হাত থেকে ফেলে দেন। কিন্তু এর মধ্যেই হাতের তালু কিছুটা পুড়ে যায়। এই ফজলু সাহেব ছোট বয়সেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ্য ছিলেন। সে সময় শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) নাওপুরা খানেকায় তাশরিফ নেন। অসুস্থ্য ফজলু সাহেব তখন তাঁর বাড়ির লোক দিয়ে হযরতের নিকট একটি চিরকুট পাঠান। চিরকুটের মধ্যে লিখা রয়েছে, "হুজুর, রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিতে চাচ্ছেন আমি কি করব?" শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) চিরকুটটি পাঠ করে উত্তরে বললেন, "রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিতে চাচ্ছেন, এটাতো অত্যন্ত খুশীর ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কদমে আমি তোমাকে সঁপে দিলাম।" উত্তর পাবার অল্প সময় পরেই শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর একনিষ্ঠ প্রেমিক বালক ফজলু সাহেব ইন্তেকাল করেন।

স্বর্ণ তৈরী

কচুয়ার নাওপুরা গ্রামের সুফি আলীমুদ্দীন (রাঃ) একদিন কথা প্রসঙ্গে শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) কে বললেন, "হুজুর শুনেছি অলি আল্লাহ্গণ মাটিকে স্বর্ণ বানাতে পারেন।" তখন শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) নাওপুরা খানেকার আশপাশ থেকে নির্দিষ্ট কিছু গাছের পাতা আনতে বললেন এবং কিছু পরিমান মাটি একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ঐ পাতা গুলির রস দিয়ে জ্বাল দিতে বললেন। সুফি সাহেব একটি পাত্রে কিছু পরিমান মাটি নিয়ে তাতে পীরের নির্দেশ মত পাতার রস দিলেন এরপর তা জ্বাল দিলেন। একটু পরই দেখতে পান যে ঐ মাটি একটি স্বর্ণ পিন্ডে পরিণত হয়ে গেছে। সুফি আলীমুদ্দীন সাহেব হাতের তালুতে স্বর্ণ খন্ডটি নিয়ে আগ্রহ ভরে তাকিয়ে রইলেন। তখন শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) সুফি সাহেবকে বললেন, "এই স্বর্ণের টুকরাটি ঢিল দিয়ে পুকরের মধ্যখানে ফেলে দাও এবং এটি আর কখনো তালাশ করবা না।" সুফি সাহেব তাই করলেন।

আমার আগে কই যাস

শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এর সর্ব প্রথম মুরীদ হলেন কুমিল্লা শহরের পার্শ্ববর্তী চান্দপুর গ্রাম নিবাসি জনাব লাল মিয়া ওস্তাগর। তাঁর ছেলে নুরু মিয়া জানান যে, একবার জংগলাকীর্ণ স্থানে কাজ করার সময় লাল মিয়া ওস্তাগর সাহেবকে বিষধর পানক সাপ দংশন করে। প্রচন্ড বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি মৃতবৎ পড়ে রইলেন। স্বজনগণ সে সময়কার নামকরা কবিরাজ ও ওঝা দ্বারা তাঁর চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক করাতে থাকেন এবং তাঁর সুস্থ্যতার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এক পর্যায়ে সবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে কবিরাজ এবং ওঝাগণ তাঁকে একদিন পর মৃত ঘোষনা করেন। পরিবারের লোকজন লাল মিয়া ওস্তাগরের নিথর দেহ দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এক পর্যায়ে নিথর শায়িত ওস্তাগর সাহেব হঠাৎ 'বাজান' 'বাজান' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে বসেন। এ ঘটনায় লোকজন অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে যায় এবং ওস্তাগর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, তিনি দেখলেন যে তিনি শায়িত আছেন 'বাজান' এসে অর্থাৎ তাঁর পীর শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এসে তাঁর হাতের লাঠিটি দিয়ে ওস্তাগর সাহেবকে আঘাত করে বলছেন, "তুই আমার আগে কই যাস?" তখনই আমি শোয়া থেকে লাফ দিয়ে ওঠে বসি। লাল মিয়া ওস্তাগর সে সময়ই সুস্থ্য হয়ে যান এবং আরো অনেকদিন বেঁচে ছিলেন এবং ঠিকই তিনি শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর ইন্তেকালের পরেই ইন্তেকাল করেন।

তিনি বাক সিদ্ধ মহাপুরুষ

একদিন হযরত শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর শাহপুর দরবার শরীফ থেকে কোথাও যাওয়ার কর্মসূচী ছিল। বিবির বাজার খেয়া ঘাট পার হয়ে তারপর সেই অনুষ্ঠান স্থলের দিকে যাবেন এবং সে জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করা ছিল। সেই অনুষ্ঠানের দিন রওয়ানা হওয়ার ঐ নির্দিষ্ট সময়ে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল আবহাওয়াও ছিল বেশ ঠান্ডা। হযরত কেবলাহর সফর সঙ্গী যারা হওয়ার কথা তারা বৃষ্টি ও ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে হুজুর রওয়ানা হবেন কি হবেননা এই দ্বিধা-দ্বন্ধের মধ্যে মসজিদে আরামসে শুয়ে পড়েন। কিন্তু হযরত কেবলাহ নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টির মধ্যেই মসজিদে উপস্থিত হন। সবাই হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। এই বৃষ্টির মধ্যে মাঝি খেয়া ঘাটে আছে কিনা দেখার জন্য একজন আগে ভাগে খেয়া ঘাটে পৌঁছে গেলেন। সেখানে যেয়ে দেখলেন নিতাই নামে একজন হিন্দু মাঝি মাথায় ছাতা ধরে এই বৃষ্টি ও বাতাসের মাঝে জবু থবু হয়ে খেয়া ঘাটে বসে আছে। সেই লোক মাঝিকে খেয়া ঘাটে এভাবে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ," তুমি এই বৃষ্টি ও ঠান্ডার মধ্যে নদীর পাড়ে এভাবে বসে আছো কেন? হুজুর আসবেন কি আসবেন না এর কি ঠিক আছে?" নিতাই মাঝি তখন উত্তরে বলল," উনারা বাক সিদ্ধ মহাপুরুষ কথার খেলাফ করেন না।"

হযরত কেবলার কানে এ কথা গেলে তিনি তার সফর সংগী মুরিদ গণকে বললেন," দেখ, সে একজন হিন্দু হয়েও আমার কথার উপর কি রকম বিশ্বাস যে আমার কথা আমি ঠিক রাখব এবং এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষা করছিল আর তোরা মুরিদ হয়েও মসজিদে শুয়ে ছিলি।"

দুধ খাওয়ালেন বন্দীশাহ (রাঃ)

নাওপুরার সুফি আলীমুদ্দীন (রাঃ) শাহপুর অবস্থান কালে একদিন মোর্শেদ হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) কে বললেন যে তাঁর বেশ ক্ষুধা লেগেছে। সেটা এমন একটি সময় ছিল যখন দরবারে খাবারের নির্দিষ্ট সময় নয়। তখন হযরত কেবলাহ তাঁকে বললেন," তুমি বাবার (বন্দীশাহ বাবা) কাছে গিয়ে বলো।" সুফি আলীমুদ্দীন সাহেব পীরের নির্দেশ মত হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযারের পাদদেশে গিয়ে বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মোরাকাবায় বসলেন। একপর্যায়ে মোরাকাবার হালে তিনি মুখে নল জাতীয় কিছু একটা অনুভব করলেন। টান দিয়ে দুধের স্বাদ পেলেন ফলে মোরাকাবার মধ্যেই তিনি পান করতে করতে এক সময় পরিপুর্ণ ভাবে তৃপ্তি অনুভব করলেন। তখন তাঁর মোরাকাবার হালও ছুটে গেল।

তিনি তাঁর সামনে কিছু দেখলেন না। তিনি তাঁর পীর কেবলাহকে তখন এ বিষয়টি জানালে হযরত কেবলাহ বললেন," মিয়া বাবাতো তোমাকে দুধ খাওয়াইয়া তোমার ক্ষুধা দুর করে দিলেন।

মুরীদকে চেনা

একদিন হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর কাছে একজন মুরীদ এসে সালাম দেয়ার পর হযরত কেবলাহ উত্তর দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," তুমি কে?" লোকটি তখন দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে হযরত কেবলাহকে বললো," হুজুর! আমনে আমারে চিনলেন না? দুনিয়াতেই যদি না চিনেন আখেরাতে আমারে কেমনে চিনবেন? আমার কি উপায় হইব?" হযরত কেবলাহ তখন হাসি দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," মিয়া তোমার বাড়ি কোথায়? তুমি কি কর?" লোকটি উত্তর দিল," হুজুর, আমার বাড়ি উদয়পুরের পাহাড়ি এলাকায় (বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে)। আমার গরুর খামার আছে।" হযরত কেবলাহ জিজ্ঞাসা করলেন," তোমার গরু কয়টি?" লোকটি বলল," হুজুর, গরু প্রায় ৭০ টি।" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন," কি ভাবে পালন কর?" লোকটি উত্তর দিল," হুজুর সকাল বেলা পাহাড়ের নীচে ছেড়ে দেই, সারা দিন খাওয়ার পর বিকালে খামারে ফিরে আসে।" হযরত জিজ্ঞাসা করলেন," গরু গুলি কিভাবে ফিরে আসে?" লোকটি বলল," বিকাল বেলা পাহাড়ে গিয়ে গরু গুলিকে ডাক দেই তখন সে গুলি ডাক শুনে চারিদিক থেকে আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমার সাথে বাড়ি ফিরে আসে।" হযরত তাকে জিজ্ঞাসা করলেন," কেন আসে?" লোকটি বলল," হুজুর, যেহেতু তারা আমাকে চিনে তাই আমার সাথে চলে আসে।" হুজুর জিজ্ঞাসা করলেন," তুমি কি তোমার সব গরু চিন?" লোকটি বলল," জ্বিনা হুজুর।" হযরত বললেন," তুমি না চিনলেও তারা তোমাকে চিনে যে কারনে তুমি ও তোমার চেনা গরুর সাথে দলবদ্ধ ভাবে গরু গুলি বাড়িতে ফিরে আসে।" লোকটি বলল," জ্বি হুজুর।" হযরত জিজ্ঞাসা করলেন," আর যদি কোন দলছুট হয়ে পাহাড়ে থেকে যায় বা অন্য পথে যায় তখন কি হয়?" লোকটি বলল," হুজুর, সেইটা হয়ত বাঘের পেটে যায় বা অন্য কোন বিপদে পড়ে যায়।" হযরত তখন বললেন," মিয়া, এখান থেকে এই বিষয়টা বুঝে নাও যে মুরীদ যদি হক্কানী কামেল পীরের প্রতি ভালবাসা রেখে আদেশ-নিষেধ পালনে যত্নবান না হয়ে নিজের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি বা নফসের পায়রবি দ্বারা বিপথে চলে বা দল ছুট হয়, সেও দুনিয়া ও আখেরাতে বিপদে পড়ে যায়। আর মুরীদ যদি হক্কানী কামেল পীরের প্রতি ভালবাসা রাখে ও আদেশ-নিষেধ পালনে যত্নবান হয়ে হক্কানী কামেল পীরকে চিনে নেয়, তাহলে কোন কারনে

যদি আখেরাতে পীর মুরীদকে চিনতে নাও পারে কিন্তু মুরীদ ঐ হক্কানী কামেল পীরকে চিনার কারনে সেখানে উপকৃত হতে পারবে। তুমি মন খারাপ করার কোন কারন নাই।" লোকটি পরে প্রশান্ত মনে হযরত কেবলাহর দোয়া নিয়ে বাড়ির পথ ধরল।

উপরোক্ত বিষয়ে শায়খুল মাশায়েখ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) পীর মুরীদ পরস্পরকে চিনা এবং মুরীদের উপকৃত হওয়ার বিষয়ে সহজ উপমার দ্বারা লোকটিকে যে বিষয়টি বুঝিয়ে দিলেন প্রাসঙ্গিক হিসেবে নিম্নোক্ত হাদিস শরীফ খানা প্রণিধান যোগ্য-

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামিদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর জান্নাতবাসীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে। জাহান্নামিদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাকে বলবে, 'হে ব্যক্তি! আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ঐ ব্যক্তি, যে (পিপাসার সময়) আপনাকে পানি পান করিয়েছিলাম।' তাদের মধ্য থেকে অন্য এক ব্যক্তি বলবে, ' আমি ঐ ব্যক্তি যে অজুর জন্য আপনাকে পানির পাত্র দিয়েছিলাম।' ফলে তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে। অতঃপর তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। (ইবনে মাজাহ, মেশকাত শরীফ- ৫৩৬৪)।

খাদ্য দ্রব্যের প্রতি সম্মানের নসিহত

জীবন ধারনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ নেয়ামত হলো খাদ্য দ্রব্য। হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) মুরীদগণকে খাদ্য দ্রব্যের ব্যপারে দরবার, খানেকা কিংবা নিজ বাড়িতে যত্নবান হওয়ার জন্য জোর তাকিদ দিতেন। এ ব্যপারে হযরত কেবলাহ এরশাদ করেছেন," খাবার ও খাবারের জিনিস পত্র আল্লাহর খাস নেয়ামত। খবরদার! এই সবের প্রতি যেন অযত্ন অবহেলা করা না হয়। যেমন, পাতিলে কিছু ভাত নষ্ট হয়ে থাকা, গান্দা পচাঁ ডাল-তরকারি যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া, হলুদ-মরিচ মসলাপাতি কিছু ভাঁড়ে আর কিছু আশে পাশে মাটিতে পড়ে থাকা। পানগুলি শুকাইয়া যাওয়া , চুনগুলি মরিয়া যাওয়া, খাওয়ার সময় ভাতগুলি পড়ে যাওয়া আবার সেগুলি পা দিয়ে মাড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারনে খাবার ও ঘরের বরকত কমে যায় ও রহমত বন্ধ হয়ে যায়।" এ বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে হযরত কেবলাহ মুরীদগণকে আরো বলেছেন," কেউ যদি একটি ভাতে পাড়া দেয় সে যেন আমার মাথায় পাড়া দিল।"

হুক্কার ঘটনা

লাল মিয়া ওস্তাগর সাহেবের আরেকটি ঘটনা হল এই যে তিনি প্রথম জীবনে হুক্কা পান করতেন। শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট মুরীদ হওয়ার পর হযরত কেবলাহ ওস্তাগর সাহেবকে হুক্কা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেন।

একদিন ওস্তাগর সাহেব কুমিল্লার রাজগঞ্জে ছাদ পেটানোর কাজ করাচ্ছিলেন এমন সময় তার হুক্কা খাওয়ার খুব ইচ্ছা হয়। কর্মিদের জন্য রক্ষিত একটি হুক্কা নিয়ে ছাদের পাশে বসে যেই হুক্কাতে টান দিতে যাবেন তখনই দেখতে পান যে তাঁর পীর শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চমকে উঠে হুক্কা ফেলে বাজান বাজান, বলতে বলতে পেছাতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি উঁচু ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান। নীচে পড়ে গেলেও তিনি কোন প্রকার আহত হননি। উল্লেখ্য সে সময় লাল মিয়া ওস্তাগর ব্যতিত আর কেউ হযরত কেবলাহকে দেখতে পায়নি। বস্তুত: এটা ছিল শাহ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর কারামত। এ ঘটনার পর ওস্তাগর সাহেব আর কখনও হুক্কা পান করেননি।

ট্রেন ধরা

চাঁদপুর জেলার দামোদরদী গ্রামের জনাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেব কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে তাঁর পীর শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর ইন্তেকালের পর শাহ্পুর দরবার শরীফে চিল্লা করতে আসেন। ১১ দিনের চিল্লা শেষ করার পর ঐদিন রাতে ট্রেনে চাঁদপুর যেয়ে সেখান থেকে কর্মস্থল খুলনা যাবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি কুমিল্লা শহরে শশুর বাড়িতে সময়টুকু না কাটিয়ে দরবারেই অবস্থান করে এশার নামাজ পড়ে রওয়ানা হওয়ার মনস্থ করেন। যেহেতু রাত বারটার পরে ট্রেন তাই তিনি চিন্তা করলেন মসজিদে একটু বিশ্রাম নিয়ে তার পর রওয়ানা হবেন। বিশ্রাম নিতে যেয়ে তিনি গভরি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তিনি বর্ণনা করেন, "অনাকাঙ্খিত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি হঠাৎ শুনতে পেলাম মোর্শেদ কেবলাহ্ আমাকে ডেকে বলছেন, 'মোহাম্মদ আলী মিয়া তোমার ট্রেনের সময় তো চলে যাচ্ছে।' আমি হকচকিয়ে উঠে দেখলাম যে ঠিকই ট্রেনের নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছে। এখন কি করব? আমার যাওয়াটা জরুরী আর এত রাতে দরবার থেকে বিবির বাজার প্রায় দুই কিলোমিটার দুরে, মাঝখানে নৌকায় গোমতি নদী পার হতে হবে। বিবির বাজার থেকে রিকসায় প্রায় ছয় কিলোমিটার

দুরে রেল স্টেশন যেতে হবে। গভীর রাতে রিকশা পাওয়াটাও একটা বিষয়। সব মিলিয়ে স্বাভাবিক ধারনায় কোন মতেই ট্রেন ধরা সম্ভব নয়। তারপরও আমি চিন্তা করলাম মোর্শেদ কেবলাহ যখন ট্রেন ধরার জন্য আমাকে জাগিয়েছেন আমি ট্রেন পাবই। আমি হেঁটে খেয়া ঘাটে যেয়ে ঘুমন্ত মাঝিকে উঠিয়ে খেয়া পার হয়ে বিবির বাজার যাই। সেখানে দেখতে পাই যে পুরো নিরব এলাকায় একটি মাত্র রিকশা যাত্রীর অপেক্ষায় বসে আছে। আমি তার রিকশায় উঠে স্টেশনে পৌঁছলাম। ততক্ষনে অনেক সময় পার হয়ে গেছে। স্টেশনে ঢুকে দেখি ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। দেরি হওয়াতে যাত্রিগণ বিরক্ত হয়ে উঠছেন। যাত্রিদের কাছ থেকে জানলাম ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে আর চালু হচ্ছেনা এর কারণও কেউ নির্ণয় করতে পারছেনা। আমি মনে মনে ভাবলাম ইঞ্জিন চালু না হওয়ার কারণ যাত্রী বা ট্রেনের লোকজন কেউ না জানলেও আমিতো জানি। আমি ট্রেনে উঠে বসার পরপরই ট্রেনের ইঞ্জিন চালু হয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল। আলহামদুলিল্লাহ্ আমার পীরের প্রতি আমার যে বিশ্বাস কাজ করেছে সেটা বিফল হয়নি। আমি সুন্দর ভাবেই আমার গন্তব্যে পৌঁছেছি।

তসবিহ্‌র দানা একটি কম

চাঁদপুর জেলার দামোদরদী গ্রাম নিবাসী মুর্শীদ কেবলাহর প্রবীণ মুরীদ আলহাজ্ব মোজ্জাফ্‌ফর আহমদ খান চাকুরী করতেন খুলনা জেলায়। তিনি প্রায়ই তসবিহ্-তাহলীলে ব্যস্ত থাকতেন। একদা দুপুরে তিনি তন্ময়তার সাথে তসবীহ্ পাঠ করতেছিলেন। এমন সময় মুর্শীদ কেবলাহ তার সম্মুখে এসে বললেন, "মুজাফ্‌ফর মিয়া তোমার তসবির দানার সংখ্যা একটি কম, গুনে নাও।" এ কথা শুনার পর মোজ্জাফর আহম্মদ সাহেব গুনে দেখলেন যে ঠিকই তসবী দানা একটি কম অর্থাৎ ৯৯ টি। মুর্শীদ কেবলাহকে তিনি তা বলতে গিয়ে দেখেন যে সামনে মুর্শীদ কেবলাহ নেই। তখন তার মনে পড়ে গেল মুর্শীদ কেবলাহ অনেক পূর্বেই ওফাত লাভ করেছেন।

চলন্ত ট্রেনের নীচে

চাঁদপুর জেলার কচুয়া থানার অন্তগর্ত হারিচাল গ্রাম নিবাসী শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর মুরীদ জনাব মোহাম্মদ নোওয়াব আলী কোন এক প্রয়োজনে লাকসাম ষ্টেশনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি কোন এক জায়গায় যাওয়ার জন্য ট্রেনে ওঠতে ছিলেন। কিন্তু ট্রেনে ওঠার আগেই ট্রেনটি ছেড়ে দিল। তিনি পা পিছলে ট্রেনের নিচে পড়ে গেলেন। স্বভাবগতভাবে তিনি

ওঠবার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় তিনি টের পেলেন মুর্শীদ কেবলাহ তার মাথায় হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ধরে বললেন, "মাথা উঠাইওনা, এভাবেই থাকো।" ট্রেনটি চলে গেলে নওয়াব আলী মিয়া অক্ষত অবস্থায় ওঠে আসেন। ঘটনাটি তিনি পরবর্তীতে অনেকের নিকট ব্যক্ত করেন। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মুর্শীদ কেবলাহর ইন্তেকালের বহু বৎসর পর।

লেখকের প্রণতি

আল্লাহ্ তায়ালা যদি কোন বান্দার প্রতি রহমত এনায়েত করেন, তখন তিনি তার সেই বান্দাহকে একজন মোক্কামেল মুর্শীদ মিলিয়ে দেন। আর মুরীদকে সেই মুর্শীদ আল্লাহ্ তায়ালাকে মিলিয়ে দেন। তাই আমিও আজ অশেষ তৃপ্ত ও আল্লাহর নিকট শোকর গুজারক, যেহেতু এমন একজন রত্ন সাদৃশ্য উচ্চ মাকামের বুজুর্গ অলী আল্লাহকে মুর্শীদ রূপে পেয়েছি। দৌলত ও ধন পেয়ে ধনী হওয়ার আনন্দ যেমন অনেক তেমনি অসাবধনতা ও মুর্খতার কারনে তা হারাবার ভয় ও গ্লানিও অনেক। যা দুর্বিসহও বটে। আমাদেরকে যেন এমন কোন অপরাধ সমেত পরপারে যেতে না হয়, খোদা না করুক যার জন্য মুর্শীদ প্রবর এবং শাফিয়ে রোজে কিয়ামাত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর সম্মুখে লজ্জায় রক্তিমাভাব চেহারা নিম্নাভিমুখী করে দন্ডায়মান হতে হয়। এ বিষয়ে আমরা যেন সন্তর্পণে পদক্ষেপ করতে পারি এ শক্তি সামর্থ কামনা করে সবিনয়ে প্রার্থনা করি আল্লাহর দরবারে। আমাকে যেহেতু যৎকিঞ্চিত দ্বীনি জ্ঞান তিনি দান করেছেন তা অথৈ জ্ঞান সমুদ্রের কাছে একটি পরমানু মাত্র, তার কারণে আমার ন্যায় একজন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নাচিজের দ্বারা সৃষ্টির কোন বান্দাহ কে আমা হতে নিকৃষ্ট অধম, এরূপ মনোভাব আমাতে যেন সৃষ্টি না হয় এবং আমার দ্বারা যেন কোন ইবনে আদমকে চির নরকী ঘোষণা দিয়ে বাহাস মুনাজেরায় লিপ্ত হতে না হয় (যেহেতু এ কাজে আমি মোকাররার নই)। বাহারুল উলুম হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মদ হযরত ইমাম গাজ্জালি (রাঃ) ও ইমামে আজম হযরত নোমান বিন সাবেত কুনিয়াত হযরত ইমাম আবু হানিফা (রাঃ), তর্ক-বাহাস, মোনাজারা সম্পর্কে হুশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়ে আমাকে যেন আমার মধ্যে লুকায়িত অপশক্তি 'নফস' নামক দুষ্টমতি ইবলিসের (ইবলিস হিব্রু শব্দ বালাসা থেকে উৎপত্তি, বালাসা অর্থ অহংকার) হাত হতে রক্ষা করেন সে বিষয়ে মহামহিম কুদরতের অধিকারীর নিকট পানাহ ও আশ্রয় পার্থনা করছি। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালি (রাঃ) এঁর ভাষায়, আমিও কামনা করছি, "হে প্রভু আমাকে এমন ইলম দান করুন যে, সে ইলম হিসাবের দিন আমার বিরুদ্ধেই স্বাক্ষী হিসেবে দাঁড় করানো না হয়।" আমি আমার চার ইঞ্চি রসনাকে (জিহ্বা) যেন সাবধানে সঞ্চালন করতে পারি সেই

প্রণতিও জানাই, তোমার দরবারে হে প্রভু! কারণ আঁ-হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বলা আছে, "তোমরা তোমাদের জিহ্বা পরিচালানার জন্য আল্লাহর নিকট তৌফিক প্রার্থনা কর।" আল্লাহ্ মোকাদ্দেরের দরবারে এই মিনতিও জানাই তিনি যেন আমাকে এমন দৃষ্টি শক্তি দান করেন, যদ্বারা অন্যের ছিদ্র অনুসন্ধানের কাজ হতে বিরত হয়ে নিজের আমল ও আখলাককে দুরস্ত করতে পারি। যেহেতু অন্যের ছিদ্রানুসন্ধান করার জন্য আমাকে নিযুক্ত করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়নি এবং এ বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ ও করা হবে না। আমি যেন সত্য দর্শনের মাধ্যমে সঠিক পথ পেয়ে যাই। এবং সেই পথেই আমার পদযুগল যাতে সুদৃঢ় থাকে সেই সাহায্যই পরম করুণাময়ের নিকট প্রর্থনা করছি। এমন কর্মই হোক আমার দ্বারা যার ফল ভোগ করে সৃষ্টিকুলের সবাই কিছুনা কিছু উপকার লাভ করতে পারেন। বিশেষ করে ভক্ত ভাই বোনদের জন্য যেন বয়ে নিয়ে আসে স্বর্গীয় সুষমার মোহিনী সৌরভ।

আল্লাহ্ তায়ালা ও তদীয় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেমন কর্মে সন্তুষ্ট হন তেমনটিই হোক আমাদের সকলের দ্বারা। হযরত কেবলাহ (রাঃ) এঁর অফুরন্ত কোরবানীর ফলে তিনি কুমিল্লা শহরের সন্নিকটে শাহপুর গ্রামে আস্তানায়ে আকদাস হযরত বন্দীশাহ বাবা (রাঃ) এঁর দরবারে খানেকায়ে সোবহানীয়া প্রতিষ্ঠা করে মুরীদগণকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করেন। শাহপুর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে তিনি বলেছেন-

"শাহেন শাহে বাগদাদ কি দরবার এহি হ্যায়,
মিলতা হ্যাঁয় জাহা বখ্ত কা বাজার এহি হ্যায়।
হার রঞ্জ্ মেঁ আফাত মেঁ মুসিবত মেঁ বালা মেঁ,
হার হাল মেঁ ওয়াল্লাহে মদদগার এহি হ্যায়।"

আমাদের এই এলতেজা ও আরজগুজারেশ খোদাওন্দ করিমের শাহী দরবারে হযরত মুর্শীদ কেবলাহর অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বদৌলতে অর্জিত নাজ ও নেয়াজের উপরোক্ত বাণীটির মর্যাদা অক্ষরে অক্ষরে যেন আমাদের সকলের দ্বারা পূর্ণ হেফাজত হয়। এ বাণীটির ফসল আমরা ভোগ করতে পারি এ আকিঞ্চনই করছি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট।

পরিশেষে আমার হৃদয় কন্দরের গভীরতম প্রদেশ থেকে সর্ব শ্রেষ্ঠ নবী. যিনি মক্কী, মদনী, হাসেমী ও আবতায়ী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র বংশধরগণের উপর ও তাঁর আলোর (নূরী) সন্তানদের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম জানাচ্ছি। আরো সালাম জানাচ্ছি সকল গাউস-কুতুব, অলী-আবদালগণের উপর ও তাঁদের অনুগামীগণের উপর। আমার হৃদয় নিষিক্ত ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী পবিত্র প্রেমপ্রবর মুর্শীদ হযরত শায়খ্ মখদুম শাহ আবদুস

সোবহান আল-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর পবিত্র কদমে সমর্পিত এবং তাঁর উপর হক সোবহানু তায়ালা অসীম ফজল, করম ও সন্তুষ্টি বর্ষন করতে থাকেন অবিরাম ধারায়। তিনি তা বর্ধিত করে দেন তাঁর উর্ধ্বতন বংশধারার উপর এবং তাঁর আওলাদ ফরজন্দগণের উপর। আমিন। ছুম্মা আমিন, বহুরমতে সাইয়্যেদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

হযরত কেবলাহ্‌র দান

হযরত মুর্শীদ কেবলাহ শায়খ্ মখদুম মাওলানা শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) সারাজীবন কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে পরকালের সহজ সরল রাস্তার সন্ধান দিয়ে গেছেন আমাদেরকে। তিনি পবিত্র ক্বাদেরীয়া তরিকার নিয়মানুযায়ী মুরীদগণের নিয়মিত পালনের সুবিধার্থে অত্যন্ত সহজ সাধ্য সংক্ষিপ্তভাবে অযিফা-আমল ও অন্যান্য বিষয়াদি দিয়ে গেছেন। বর্তমান যুগের কর্মব্যস্ত সময়েও যা সবার জন্য সহজেই পালন করা সম্ভব। এ বিষয়ে তিনি 'শোগলে ক্বাদেরী' নামক কিতাবও রচনা করেছেন। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর শানে ও মহব্বতে যে সকল ক্বাসিদা তিনি উর্দূতে ও বাংলায় রচনা করে গেছেন তা আজও বিভিন্ন তরিকতের দরবার বা প্রতিষ্ঠানে বিরলই দেখা যায়। হযরত গাউসে আজম বড় পীর সাইয়্যেদেনা আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এঁর শানে যে 'ক্বাসিদাতুল গাউসিয়া' রচনা করেছেন তাও অন্য কোথাও এরূপ দেখা যায় না। তিনি আমাদেরকে সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থায় কি কখন করতে হবে, সামাজিক দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে অর্থাৎ দুনিয়ায় জীবিত থাকা কালে কখন, কোথায়, কোন অবস্থায়, কি করতে হবে তাও হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। এখন শাহপুর দরবার শরীফের মান-সম্মান, শান, পরিচিতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আমাদের অচল বসে থাকার সময় ফুরিয়ে গেছে। হযরত কেবলাহর উদয়ে এই শহরে দ্বীনি আকর্ষণ কতটুকু জোরদার হয়েছে তা নিয়ে যদি বলি, "শাহপুর গগনে উদিত তাপস বিদ্যারবি তবে এতটুকু বেশী বলা হবে না"। নিম্নে এ বিষয়ে একটি কবিতা উপস্থাপন করা হলো:-

শাহপুর গগনে উদীত তাপস বিদ্যারবি

চান্দপুরে তোমার উদয়াচল অস্তাচল তোমার শাহপুরে,
দ্বীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় রবি শশী তুমি, তুমিই আছ নূরে।
দেখেছিল কি কোনদিন কেহ তব সম মহান ও এলাকায়,
দেখেও তোমায় দেখে নাই তারা বুঝতে পারেনি অবহেলায়।

ফুটেছ তুমি জ্ঞান পুষ্প জ্যোতিতে অম্লান বহমান গোমতীর তীরে,
নগরবাসীরা গর্বিত হয়েও তুচ্ছভাবে নিজেরে ।
তোমায় পেয়ে শোকর করা উচিত ছিল খোদার দরবারে,
তবেই তো দয়াময় বাড়িয়ে দিতেন নেয়ামত তাঁর বেশুমারে ।
শৈশব-কৈশোর, যৌবনে সয়েছিলে কত দুঃখ-যাতনা, ব্যাথার আঘাত,
কেমনে বুঝব তোমার কদর মোদেরতো আসেনি কভু সে সায়াত । (কষ্টকর সময়)
ইবনে বতুতা হিশামের মত ভ্রমেছিলে তুমি দেশ-বিদেশ,
ঐশী কোরাণের জ্ঞান আহরণে খোদাকে পেতে সয়েছ ক্লেশ ।
ঘুরে এসেছ ইরাক, মিশর, দামেস্ক, তুরস্ক, মক্কা-মদীনা,
মূল্যায়ন তব দিতে পারিনি কভু আসলে তোমায় মোরা চিনি না ।
হৃদি পদ্মে করে এনেছ সেই সুন্দরের আঁকর মুহাম্মদ (দঃ)
মক্কাবাসীরা দেখেও কি তাদের ঘুচেছিল হৃদয়ের আপদ?
কে ছিল ঐ করণের প্রেমিক রাসূল প্রেমে ভেঙ্গে ছিল দাঁত,
খোদা প্রেমের অনল দহনে মনছুরের কেন হল প্রাণ নিপাত?
বিশ্বকে তাক লাগিয়ে জিলান শহরে এলেন এ কোন মহান সত্বা,
গাউসুল আজমের পরিচয় ও শান নিয়ে ছিল কি মোদের অভিজ্ঞতা?
গরীবের লাগি দরদ ভরা মন, আজমীরের খাজায়ে খাজেগাঁ,
মঈনুদ্দীন 'সুলতানুল হিন্দল অলী' নামে পেয়েছেন তিনি শিরোপা ।
বুলবুলে বাগে মদীনা বাংলার সুলতানুল আউলিয়া,
শাহজালাল ইয়ামানীকে কে দেখাল হৃদয়ে পষিয়া ।
কুমিল্লায় এলেন গাজীপুরী বীর ভাগলপুরের ঐ বাঘা অলী,
চিনিতাম-জানিতাম কি এই পূণ্যাত্মাদের হয়তোবা যেতাম ভুলি ।
এই নগরের প্রথম মুর্শীদ শাহ আবদুল্লাহ গাজীপুরী,
তার পরেই হলে শুধু তুমি সোবহান মুর্শীদ শাহপুরী ।
প্রাক যুগে ঐ তোমাদের সময়ে শহরে কেউ ছিল না তরিকার,
পীরি-মুরীদি ও রেসালতের সবক মোদের দেয়নি কেউতো আর ।
ইতিহাস সবার জানা দরকার ভবিষ্যতের তরে,
মিথ্যা যেন সত্যের আসনে অধিষ্ঠিতে না পারে ।
মদীনার ঐ মিরাজের দুলাকে পষিয়া তোমার হৃদি পদ্মে আনি,
চিনিয়ে দিয়েছ কহিয়া মোদেরে তিনি হক জাত খান্দানী ।
ক্বাদেরীয়া-চিশ্তিয়াকে কি চমৎকার আত্মীকরণ করেছ তুমি,
তোমাকে ঘিরে গর্বে মাতুক স্বদেশ জন্মভূমি ।
ছড়াক সুবাস কাটুক হিংসার অমানিশা এই দিগন্ত ব্যাপি,
কছম ইহাতে নাই মোদের মনে এতটুকু কঞ্জুসী ।

জ্ঞানে-দ্বীনে, সোহাগে-শাসনে মোদের দিয়েছ যা আপন বিভায়,
হক যদিও শোধিতে না পারি অভিশাপ কভু দিওনা আমায় ।
সুললিত উর্দুতে রচেছ তুমি চরম প্রশংসিত সেই পুতনাম,
গাউসিয়া গজলে রচেছ যা ভুবনে দেখি নাই তব সমান ।
তব রচিত নাত গাউসিয়ার মিলাদ নিয়ে চারিদিকে ধুমধাম,
ইহাতেই তুমি ধন্য আজি স্বার্থক তুমি সফলকাম ।
মোদের দ্বারা হয়নি কভু কারো মুর্শীদকে তাজিম দেখানো কম,
মোর মুর্শীদের বেলায় কেন যে হয়না বিনিময় তত সম ।
চায় কি কেহ অনাদরে যাক শুকিয়ে জুঁই-চামেলী গোলাপের পুষ্পমালা,
তোমাকে নিয়ে নিভৃতে মোর হৃদয়ের দুয়ারে দিয়েছি তালা ।
পুলকে আমার হৃদয় নাচিছে তোমার জ্যোতিতে তুমি যে কাবা,
হৃদয় বীণার তারে বাজে, স্বার্থক তুমি, ধন্য শাহপুর, মারহাবা ।
মহাপবিত্র আল্লাহ সোবহান, সাহসী সাঁতারু অন্য অর্থে তুমি সোবহান,
বজ্র নিনাদে ঘোষিত হোক আজিকে তোমারই মান-সম্মান ।

হযরত কেবলাহর রচনাবলী

নিম্নে হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:-

১ । **ক্বেরাত শিক্ষা:** কোরআনুল কারীম তিলাওয়াত শিখার জন্য সহজ ভাবে গদ্য ও কবিতার মাধ্যমে রচিত সহায়ক গ্রন্থ ।

২ । **ক্বাসিদায়ে সোবহান:** উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় হযরত ক্বেবলাহর রচিত হামদ, নাত, গাউসিয়া ও অন্যান্য ক্বাসিদার সংকলন ।

৩ । **দরদে দিল:** বাংলা ভাষায় রচিত হামদ, নাত, গাউসিয়া ও অন্যান্য বিষয়ে রচিত কাব্য সমষ্টি ।

৪ । **শোগলে ক্বাদেরী:** ক্বাদেরীয়া তরিকার নিয়ম অনুযায়ী অযিফা, যিকির-আযকার, মোরাকাবা-মোশাহাদা, মিলাদ এবং ওরস, মাযার ও অন্যান্য বিষয়ের নিয়ম ও মাসালা সংক্রান্ত গ্রন্থ ।

৫ । **ঈদুল মৌলুদ বা ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ):** ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উদযাপনের মাসালা সংক্রান্ত পুস্তিকা ।

৬ । **ব্যবসায়ে আম্বিয়া:** নবীগণের পেশা, বিভিন্ন পেশার ফযিলত, মুসলমানগণকে বিভিন্ন ধরনের পেশা অবলম্বনের জন্য উদ্বুদ্ধ করণ, বিভেদ বৈষম্য দুরিকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কাব্যে রচিত অনবদ্য গ্রন্থ ।

৭। **বাংলা কাব্যে শিজরাঃ** হযরত ক্বেবলাহর ক্বাদেরীয়া তরিকার শিজরা এবং ইমাম আবু হানিফা (রা:) এঁর ফিকহি শিজরার বাংলা কাব্যে রচনা।

৮। **মহাসমরঃ** জিহাদে আকবর বা রিপুর বিরুদ্ধে কঠিন যুদ্ধ অর্থাৎ মানবের আত্ম সংশোধনের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ দ্বান্দিক অবস্থা ও তার সমাধান সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বাংলা কাব্যে রচিত অনন্য গ্রন্থ।

হযরতের ওফাত

দুনিয়াকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক এবং দুনিয়ার মোহমায়াকে চির বিদায় দেওয়ার পর যে সকল মানুষ, মহাপুরুষ, মনীষী 'অলী আল্লাহ' উপাধিতে বিধাতা কর্তৃক ভূষিত হয়েছেন তাঁদের এই জগত থেকে প্রস্থানের পর মানব জাতির জন্য রয়ে যায় তাঁদের উৎকৃষ্ট কর্ম, আদর্শ ও আদেশাবলী। যা পালনে সাধারণ মানব হেদায়েত তথা আলোর পথ পেয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা'র প্রেরিত প্রতিনিধি 'অলী আল্লাহ গণ' অর্পিত দায়িত্ব পালন শেষে উদগ্রীব থাকেন, বস্তু জগৎ থেকে প্রস্থানের জন্য। আমার মুর্শীদ কেবলাহ (রা:) তাঁর দায়িত্ব পালন শেষে যখন যাবার পালা আসে তখন তাকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত দেখা গেছে তিনি একটি কাসিদায় বলেছেন-

"শাহে দো জাহাঁ মেরে লও খবর
হুয়া কাম মেরা তামাম হায়।"

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন তার পরম প্রিয় সুন্দরের কাছ হতে পরম সান্নিধ্যের ডাক আসে। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মহাসিন্ধুর ওপারের পরম সুন্দর হতে যখন তার যাবার চির শান্তির ডাক আসে তখন তিনি চরম উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। উপরের দিকে অতীত হয়ে যাওয়া বড় বড় প্রখ্যাত স্মরণীয় মহাত্মাগণ যেভাবে পর্দার ওপারে চলে গেছেন, তিনিও তাই হলেন। শাহপুর দরবার শরীফে রজব মাসের ৭ তারিখ ১৩৭৪ হিজরী সন, ফাল্গুন মাসের ১৯ তারিখ ১৩৬১ বাংলা সন, মার্চ মাসের ৩ তারিখ ১৯৫৫ খ্রি: রোজ: বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্র ৯ ঘটিকার সময় তাঁর সেই পরম সান্নিধ্যের ডাক আসে। এই সময় তিনি অদৃশ্য থেকে 'সোবহান' ডাকটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে 'লাব্বাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ্' সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলে শোয়া থেকে উঠে বসলেন। এ সময়ে তাঁর কাশি আরম্ভ হল। কাছেই মোহতারেমা আম্মা সাহেবা ছিলেন। তিনি দ্রুত হযরতকে জড়িয়ে ধরলেন যেন কাশির কষ্ট কম হয়। হযরতের আরেক পাশে মোহতারেমা আম্মা সাহেবার আপন মামা মীর কেরামত আলী সাহেবও এসে বসলেন এবং তিনিও হুজুরকে ধরে রাখলেন যাতে হুজুরের কাশির কষ্ট কম হয়। এমন সময় হুজুর পানি খেতে চাইলেন। মোহতারেমা আম্মা সাহেবা হুজুরকে মামার কোলে শুইয়ে দিয়ে পানি আনতে গেলেন। মামার কোলে শোয়ার সময় তিনি 'আল্লাহ্' বলে শুয়ে পড়লেন। পানি নিয়ে আসার সময় দূর থেকে মোহতারেমা আম্মা সাহেবা

দেখলেন তার মামা হযরতের মুখ কপাল ইত্যাদিতে দ্রুত হাত বুলিয়ে নিজের মুখে মুছছিলেন। পানি এনে মোহতারেমা আম্মার সাহেবা কাছে এসে দেখলেন হযরত অনন্ত প্রেমময় আল্লাহ তায়ালার পরম সান্নিধ্যে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মোহতারেমা আম্মা সাহেবা পরে যখন তাঁর মামাকে জিজ্ঞাসা করলেন," আপনি হুজুরের ইন্তেকালের সময় হুজুরের মুখে আপনার হাত বার বার মুছে নিজের মুখে মুছতে ছিলেন কেন?" মামা তখন উত্তর দিলেন, "মা আপনি হুজুরকে আমার কোলে শুইয়ে দিয়ে যাওয়ার পর পরই দেখলাম হুজুরের মুখ মন্ডল থেকে এক প্রকার 'নূর' গড়ায়ে পড়ছে। আমি এই 'নূর'আমার হাত দিয়ে মুছে নিজের মুখে মুছতেছিলাম। যদিও আমার হাতে কিছু লাগতে দেখিনি।" মোহতারেমা আম্মা সাহেবা বুঝতে পারলেন দূর থেকে তিনি হুজুরের মুখমন্ডল থেকে যে নূর গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলেন তা তাঁর মামাও দেখেছিলেন।

হযরত ইন্তেকালের সময় চার পুত্র, ছয় কন্যা ও স্ত্রীকে রেখে যান। ছেলেদেরকে উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করেন এবং মেয়েদেরকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করে উচ্চ শিক্ষিত সৎপাত্রের নিকট বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

সময় তো এখনো চলছে বয়ে
এখনো তো শাহপুরে চলছে গেয়ে
মদিনার রাসূলের সেই পূত নাম,
প্রভাত সমীরণ এসে খোঁজ করে যায়
কোথায় সেই আরেফ শাহ সোবহান?

শায়খ-উল-ক্বোররা, গাউসে যামান, মোজাদ্দেদে যামান সুফি
হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর মাযার এর ছবি।

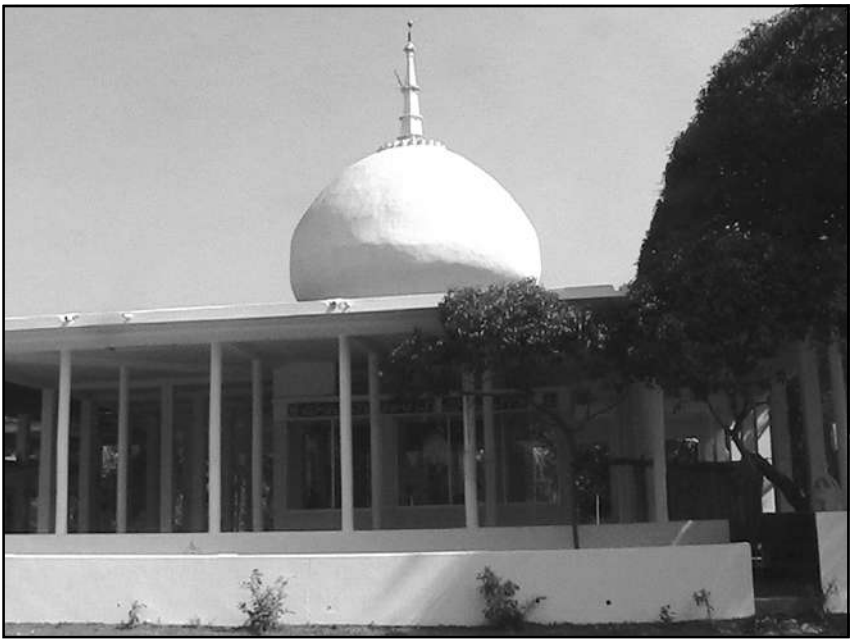

শাহপুর দরবার শরীফের ছবি। হযরত বন্দীশাহ (রাঃ) এঁর মাযারের পাদদেশে বকুল গাছটিও দেখা যাচ্ছে।

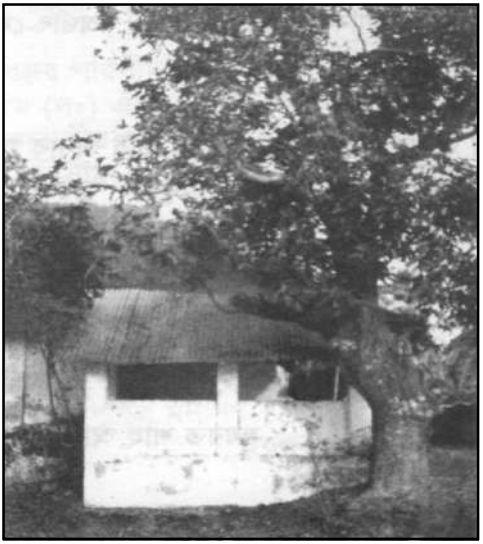

শাহপুর দরবার শরীফে হযরত ক্বেবলাহর বহির্বাটিস্থ আমগাছের নিচে অবস্থিত হুজরাখানাটি।

অমীয় বানী

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলেহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম ।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মাদিন সাইয়্যেদিল মাহবুবে ওয়ালা আশরাফে আওলাদিহি হযরত শায়খুশ শুয়ুখ সাইয়্যেদেনা মাহবুবে সোবহানী সুলতানুল আউলিয়া হযরত মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জিলানী ওয়া আউলিয়ায়ে কামেলিন ।

★ মিথ্যা সকল পাপের মা - আল হাদিস ।

★ বিধিলিপি অবতরণকালে বিধাতার উপর প্রশ্ন তোলাই মৃত্যু । এ মৃত্যু ঈমানের, এ মৃত্যু তাওহিদের, এ মৃত্যু তাওয়াক্কুল ও ইখলাসের । ঈমানদার অন্তর 'কেন' ও 'কিরূপে' ইত্যাকার প্রশ্ন তুলতে জানেনা । সে অন্তর 'বরং' বলতেও জানেনা । সে এক কথাই জানে- হাঁ মেনেছি । - গাউসে আযম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) ।

★ নফসের স্বভাবই হচ্ছে অমান্য করা ও তর্ক করা । তাই যে ব্যক্তি তার পরিশুদ্ধি চায়, তার কাজ হচ্ছে এরূপ সাধনা করা, যাতে নফসের ক্ষতি থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে । নফস তো সকল অকল্যাণের মূল । তবে যখন সাধনার দ্বারা তাকে বশ করা যায়, তখন তার থেকে শুধু কল্যাণই আসে । তখন সে আনুগত্য পালন ও নাফরমানি বর্জনে সহায়ক হয়ে যায় । - গাউসে আযম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) ।

★ এলম যাকে পাপ ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে নাই, তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই । - ইমামে আযম ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) ।

★ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর পরিবারবর্গ ও বংশধরগণের সহিত মহব্বত রাখা যদি শিয়া হওয়ার কারণ হয় তবে জ্বীন ও ইনসান জাতি সাক্ষী থাকুক যে আমিও একজন শিয়া । .....হযরত ইমাম শাফেঈ (রাঃ)

★ মানুষ পূণ্যেতে উন্নতি করে, হাজারো ধর্মানুষ্ঠানে নয় । - গরীব নওয়াজ খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি আজমিরী (রাঃ) ।

★ তরীকতের ইমাম হওয়ার যোগ্য সেই ব্যক্তি যিনি তরীকতের সকল রাস্তা অতিক্রম করিয়াছেন ।

.....হযরত আবুল হাসান আলী খার্কানী (রাঃ)

★ লোভী আলেম, বে-এলেম দরবেশ ও ওয়ায়েজিন দ্বারা ধর্মের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে শয়তান দ্বারা তত ক্ষতি হয় নাই।

.....হযরত আবুল হাসান আলী খার্কানী (রাঃ)

★ যে দরবেশ দুনিয়ার জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছেন সে যদিও কোন বিশেষ আমল না করুক তবুও তাঁহার সামান্য নেকী বহু আবেদ ও মোজাহিদের এবাদতের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

.....হযরত আবদুল্লাহ মাগরেবী (রাঃ)

★ যখন তুমি অন্তর পাক রাখিতে চাও তখন আল্লাহ্ পাকের নিকট তোমার জিহবাকে শাসনে রাখার তওফিক প্রার্থনা কর।

.....হযরত আহমদ ইবনে আছেম এনতাকী (রাঃ)

★ **জিকির তিন প্রকারঃ**

ক) যে জিকির জিহবায় উচ্চারিত হয় অথচ অন্তর থাকে গাফেল তাহাকে ফাছেকী জিকির বলে।

খ) যে জিকির জিহবায় উচ্চারিত হয় সাথে অন্তরও হাজির থাকে তাহাকে নেকী জিকির বলে।

গ) যে জিকির অন্তর ও মস্তিষ্কে চলিতে থাকে ও জিহবা নির্বাক থাকে তাহাকে হাকিকী জিকির বলে। উহার মর্যাদা আল্লাহ ছাড়া আর কেহই জানেন না।

.....হযরত আবু হামজা খোরসানী (রাঃ)

★ আমি তিনটি বস্তুর পরিসীমা জানিতে পারিলাম না-

ক) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর মর্যাদার পরিসীমা।

খ) নফসের ধোঁকাবাজীর পরিসীমা।

গ) মারেফাতের পরিসীমা।

.....হযরত আবুল হাসান আলী খার্কানী (রাঃ)

★ যে ব্যক্তি পীরের খেদমত ছাড়িয়া দেয় সে মিথ্যার দাবীতে জড়াইয়া পরে এবং ইহার জন্য লাঞ্ছিত হয়।.....হযরত আবু ইসহাক ইব্রাহীম শায়বানী (রাঃ)

★ মোমেন লোকের পশ্চাতে নিন্দা সকলেই করিয়া থাকে। শুধু তিনজন ব্যতীত- ১) আল্লাহ ২) রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ৩) পবিত্র মনাগণ।

.....হযরত আবুল হাসান আলী খার্কানী (রাঃ)

★ ইবলিস হইতে নিশ্চিন্ত হইওনা কারণ সে মারেফতের সাত শত স্তর হইতে কথা বলিয়া থাকে। .....হযরত আবুল হাসান আলী খার্কানী (রাঃ)

★ একদা কাঁটাবিলের জনাব মকবুল আহমদের ভাই জনাব মকসুদ আহমদ পারিবারিক কারনে বিমর্ষ মন নিয়ে হযরত শাহ হাফেজ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ) এঁর সাথে সাক্ষাত করতে যান। গাজীপুরী বাবা (রাঃ) তার বিমর্ষ ভাবের কারণ জানতে চাইলে উত্তরে তিনি বলেন যে যথার্থ কারন ছাড়াই একজন নিকট ব্যক্তির কটু কথায় তার মন ভরাক্রান্ত। তখন গাজীপুরী বাবা (রাঃ) বললেন, "তুমি সেই ব্যক্তির কথাগুলি গ্রহণ করিলে কেন ? তাহার বলা সে বলিয়াছে, তুমি যেহেতু মন্দ শুনিবার মত কাজ কর নাই সুতরাং তাহার কথাগুলি মনে না নিলেইতো আর মন খারাপ হয় না।"

.....হযরত শাহ আবদুল্লাহ ক্বাদেরী গাজীপুরী (রাঃ)

হযরত শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এরশাদ করেন–

★ শতবার মিথ্যা কথা বলিয়া তওবা করার চাইতে একবারেই তওবা করিয়া জীবনের মিথ্যা পরিহার করা অনেক উত্তম।

★ মহাপবিত্র গেয়ারভী শরীফের বরকত ওরস শরীফ হইতেও অনেক বেশী।

★ রাজার ছেলে রাজা হয় কিন্তু পীরের ছেলে কখনো পীর হয় না যদি না সে পীর হওয়ার সব কয়টি গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করে।

★ মানের গোড়ায় ছাই দিলে মান বাড়ে। [এখানে উল্লেখ্য যে মান শব্দের দুইটি অর্থ আছে, একটি কচুগাছ, আঞ্চলিক ভাষায় মান কচু অপরটি হল সম্মান-ইজ্জত।]

★ মুর্খ সারাদিন পানি সেচ করে, কিন্তু মাছ ধরিবার সময় সে অনুপস্থিত থাকে। বুদ্ধিমান লোক শেষে আসিয়া মাছ ধরিয়া লইয়া যায়।

★ আমার মুরীদগণ যেন অলী আল্লাহ হওয়ার নিয়তে কোন সাধনায় রত না হয়। আল্লাহর তরফ হইতে হুকুম হইয়া গেলে কোন কথা নাই।

★ হিম্মত করিয়া কোন কাজে নামিলে আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় এবং ইহাতে কাজে বরকত আসে।

★ ধর্ম দেশের জন্য নয় দেশ ধর্মের জন্য এবং ধর্ম আল্লাহর জন্য।

★ লাগিত থাকিস লাগিত থাকিলে ভাগিত হয়। [অর্থাৎ-যে কোন ভাল কাজে ধৈর্য্য সহকারে লেগে থাকলে ভাগ্য খুলে যায়]

★ পীরের বাড়িতে এসে যদি গোস্ত তালাশ কর (ভাল খাওয়ার প্রতি লোভ করা) আল্লাহ তালাশ করবা কোথায় গিয়ে?

★ একদিন একজন লোক মোরশেদ কেবলাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন," হুজুর আপনার এতবড় দরবার চলে কিভাবে?" হুজুর কেবলাহ উত্তর দিলেন," মিয়া! আমি আল্লাহর কাজ গুলি করি আল্লাহ্ আমার কাজ গুলি করাইয়া দেন।"

★ মোরশেদ কেবলাহর খেলাফত প্রাপ্ত একজন পীর (নাম প্রকাশ করা হলো না) হুজুর কেবলাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন এবং আলাপ আলোচনার এক তাঁকে বললেন," হুজুর, মুরীদতো হয় কিন্তু তারা হাদিয়া তেমন দেয়না।" হুজুর কেবলাহ তখন বললেন," শোন মিয়া, মুরীদদেরকে নিজের দিকে টানিয়ো না আল্লাহর দিকে পাঠিয়ো।"

★ হযরত শায়খ শাহ আবদুস সোবহান (রাঃ) এঁর মুরীদ ঝলমের লনাই এলাকার খ্যাতিমান বক্তা মাওলানা আবদুল হক সাহেব বিভিন্ন ওয়াজের মাহফিলে ওয়াহাবিদেরকে গালি গালাজ করতেন। এ ব্যপারে লোকজন তার পীর শায়খ শাহ আবদুস সোবহান আল ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর নিকট অভিযোগ পেশ করল। হযরত মোরশেদ কেবলাহর সাথে মাওলানা আবদুল হক সাহেব সাক্ষাৎ করতে আসলে মোরশেদ কেবলাহ তাকে বললেন," মিয়া তুমি ওয়াজ মাহফিলে ওয়াহাবিদেরকে গালা গালি কইরো না। বরং যত বেশী পার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এঁর শান-মান বেশী বেশী করে বর্ণনা কর। এতে তোমার পূণ্য হবে সমাজেও ফেতনা সৃষ্টি হবেনা তাদেরও গাত্র দাহ হবে।"

★ "তোমরা ক্ষুধা নিবারনের জন্য যতটুকু খাবার দরকার ততটুকু খাবে, লজ্জতপরস্থি হয়ে খেয়ো না।" একজন হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর লজ্জতপরস্তি কি?" জবাবে হুজুর বললেন, "লবণ ছাড়া যতটুকু খাওয়া যায় তটুকুই জীবনধারনের জন্য প্রয়োজন। লোভ জনিত কারনে স্বাদ ও তৃপ্তির সাথে খাওয়াকেই লজ্জতপরস্তি বলে।"

সূত্র সমূহ

★ তাফসীরুল কোরআন- প্রিন্সিপাল আলী হায়দার চৌধুরী ।

★ বোখারী শরীফ- হযরত ইমাম বোখারী (রাঃ) ।

★ মুসলীম শরীফ- হযরত ইমাম মুসলীম (রাঃ) ।

★ বিশ্বনবী- গোলাম মোস্তফা মগফুর

★ আল ফাতহুর রাব্বানী- গাউসে আযম শায়খ আবদুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) ।

★ আল-মুনকীয, মিনাজ্জালাল- হযরত আবু হামেদ মুহাম্মদ ইমাম গাজ্জালী (রাঃ), অনুবাদ: আনিস চৌধুরী

★ এহইয়াউল উলুমিদ্দীন- হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গাজ্জালী (রাঃ), অনুবাদ: মাওলানা নুরুর রহমান ।

★ মাবদা ওয়া মাআদ- হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রাঃ), অনুবাদ : ডঃ আ, ফ, ম, আবু বকর সিদ্দিক ।

★ তাজকেরাতুল আউলিয়া, - হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রাঃ), অনুবাদ ঃ মাওলানা নুরুর রহমান

★ চারি ইমামের জীবনী- হযরত মাওলানা মোজাফ্ফর আহম্মদ

★ শেখ শাহজাদা মুহাম্মদ পিয়ারা আল ক্বাদেরী (রাঃ)

★ হযরতের জীবনীর পান্ডুলিপি-

ক) হযরত মাওলানা মকবুল আহমদ (রাঃ)

খ) হযরত মাওলানা আবদুল করিম (রাঃ)

গ) হযরত মাওলানা জুলফিকার আহমদ (রাঃ)

★ জীবনী সংক্রান্ত সাক্ষাতকারের সম্প্রতি ক্যাসেট রেকর্ড করা ক্যাসেট সমূহ ঃ-

★ জনাব হযরত মাওলানা আবদুল মান্নান (রাঃ) (পূর্বে করানো ক্যাসেট হইতে) ।

★ হযরত মাওলানা সেরাজ আহমদ (রাঃ)

★ প্রফেসর খায়রুল আনাম আল ক্বাদেরী (রাঃ)

★ জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আলী খান (রাঃ)

★ হযরত গোলাম মহিউদ্দিন

পুস্তক পরিচিতি

প্রিয় পাঠক শিরোনামেই বুঝা যায় বইটি শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) কে পরিচিতির উদ্দেশ্যেই প্রণীত। শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) ইবনে মীর কাসেম আলী (রাঃ) যুগের একজন পুরুষোত্তম মহামানব। সৌভাগ্যের পরশ মানিক এই সব্যসাচি সুফি ব্যক্তিত্ব একাধারে ছিলেন একজন সুফি পরিব্রাজক, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, সংস্কারক, দরদি সমাজ সেবক, রণ কুশলী সাহসী যোদ্ধা, বহুমুখি জ্ঞানে প্রাজ্ঞ আলেম, শিক্ষক, অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী অতি উচ্চাঙ্গের সূফী সাধক কামেলে মোকাম্মেল পীর।

কু-প্রবৃত্তির ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তিনি যেন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে যুগের এক প্রশান্ত মানবীয় দ্বীপ। যেখানে আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রেমিকগণ আকণ্ঠ পান করতে পারতেন প্রেমের অকৃত্রিম সুধা, আলেমগণ অবগাহন করতে পারতেন জ্ঞানের ঝর্ণা ধারায়, ক্লান্ত-শ্রান্ত, দুঃখ ভারাক্রান্ত তাপিত ব্যক্তি লাভ করতেন ঐশী শান্তির পরশ, পথহারা বিভ্রান্ত ব্যক্তি পেতেন হেদায়েতের পথের দিশা, তরিকতের সালেকগণ পেতেন আল কোরআন ও সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রসাদি প্রেরনা, নাফসানী কিংবা রূহানী ব্যধি গ্রস্থ ব্যক্তি লাভ করতেন অব্যর্থ চিকিৎসা, তাত্ত্বিকগণ লাভ করতেন মারেফতের মূর্ত দলীল। আর আল্লাহর একজন প্রিয় বন্ধু উপরোল্লিখিত গুণ সমূহে গুণান্বিত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

শায়খ শাহ্ আবদুস সোবহান আল্-ক্বাদেরী (রাঃ) এঁর জন্ম এবং ইন্তেকালের মাঝে সমুদ্র তুল্য জীবনের এক বিন্দু পরিচয় দেয়ার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। এখানে জ্ঞান ও সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার মাঝেও আমরা চেষ্টা করেছি আল্লাহ্ তায়ালার এই মাহবুব বান্দার জীবনের কর্ম, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার কিছুটা পরিচিতি তুলে ধরার। যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি তৃপ্তি পেতে পারেন। আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করুন (আমিন)। মুখলিস পাঠকগণকে এ ভূবনে স্বাগতম।

বিনীত-
প্রকাশক